Owner : BASANTI DEVI COLLEGE
Printer and Publisher : Dr. Indrila Guha
Printed at : Monalisa Printer, D/26, Katjunagar, Jadavpur, Kolkata 700032
Published at : Basanti Devi College, 147/B, Rashbehari Avenue, Kolkata 700029
Editor : Sumana Chatterjee

VOLUME: 2, ISSUE 2, Reg. No. WBBIL/2017/75458
ISSN. : 2581-8902

ACADEMIA : BASANTI DEVI COLLEGE-2019

ISSN 2581-8902

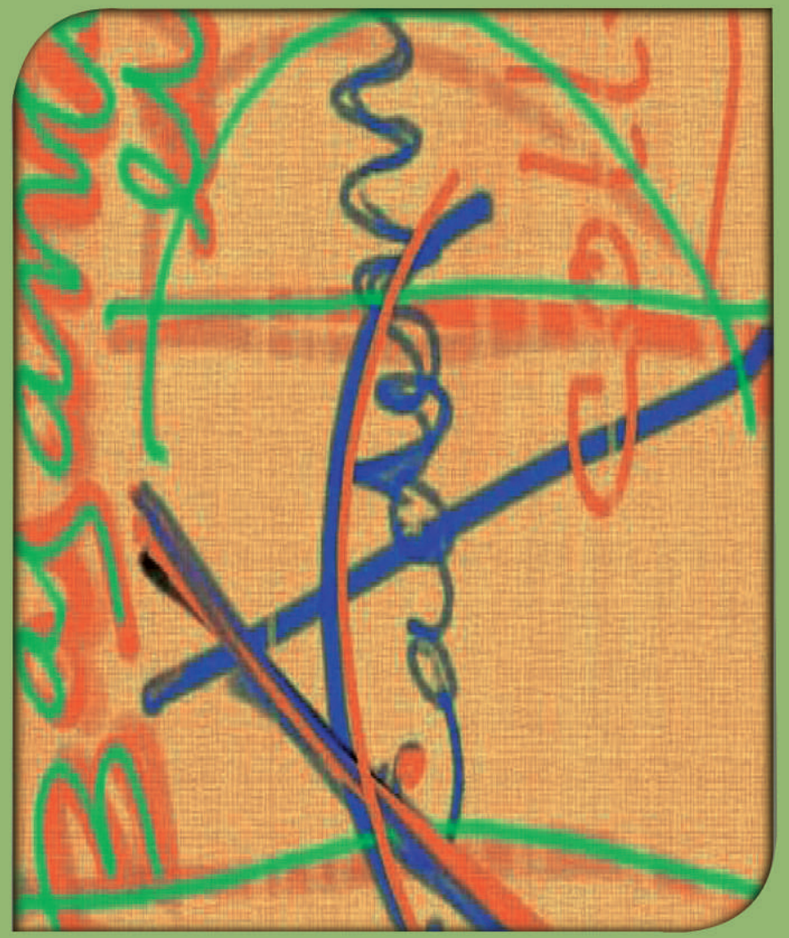

VOLUME: 2, ISSUE 2, Reg. No. WBBIL/2017/75458

ACADEMIA : BASANTI DEVI COLLEGE

(Bilingual Biennial Multi-disciplinary Peer Reviewed Research Journal)

Published by
Dr. Indrila Guha, Principal, BASANTI DEVI COLLEGE
147B Rash Behari Avenue, Kolkata- 700029
(principal@ basantidevicollege.edu.in)

Editorial Board

NAME	ADDRESS	EMAIL-ID
Dr Sumana Chatterjee (EDITOR)	147B Rash Behari Avenue, Kolkata- 700029	sumana.chatterjee@basantidevicollege.edu.in
Dr. SimaGuptaroy	147B Rash Behari Avenue, Kolkata- 700029	sima.g.roy@basantidevicollege.edu.in
Dr.Chilka Ghosh,	147B Rash Behari Avenue, Kolkata- 700029	chilka.ghosh@basantidevicollege.edu.in
Dr. Upasona Ghosh,	147B Rash Behari Avenue, Kolkata- 700029	upasana.ghosh@basantidevicollege.edu.in
Dr. Anindita Banerjee,	147B Rash Behari Avenue, Kolkata- 700029	anindita.banerjee@basantidevicollege.edu.in
Dr Ralla Guha Niyogi	147B Rash Behari Avenue, Kolkata- 700029	ralla.g.niyogi@basantidevicollege.edu.in

Cover designed by Dr .Chilka Ghosh
Printed by
Monalisa Printers
© Basanti Devi College

" A defeated argument which refuses to be obliterated is very much alive." **Amartya Sen**

Table of Contents

Literature Section

1. বাউল সঙ্গীত : ধর্ম ও তত্ত্বের মেলবন্ধনে — ড. অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় — 13

2. ঠাকুরমার ঝুলি ও আজকের শৈশব : একটি পর্যালোচনা — ডঃ ইন্দ্রাণী দত্তশতপথী — 24

3. গল্পগুচ্ছের কয়েকটি চরিত্র : মেঘ ও রৌদ্রের মাঝখানে — উপাসনা ঘোষ — 32

4. হিত-অহিতের রাজনীতি এবং *হিতোপদেশ*—এর গল্প : একটি বিশ্লেষণ — সৌম্যদীপ বসু — 49

5. Glo(b/c)alization of English : a**বঙ্গ**-Indian perspective..... **Arup Kumar Bag** — 65

6. *Ramanir Kartavya:* Exploring 19th Century 'Women's Question' through Conduct Books **.....** **Nibedita Paul** — 71

7. Rakta karabi -tota kahini: the paradox of the disciplinary **power....** **Pallama Ghosh** — 80

8. Narrative, gender and marginalisations in the *Mahabharata:* Colonial and postcolonial perspectives..... **Dr Ralla Guha Niyogi** — 89

Social Science Section

1. সমসাময়িককালের সদ্‌গুণসংক্রান্ত দার্শনিক মতবাদ — ডঃ অপর্ণা সাধু — 109

2. 'Use of natural colours in traditional art (patachitra paintings) in West Bengal **....** **Dr. Amrita Mondal** — 115

3. Ill effects of internet on the child and role of parents to ensure their online protection:. **.....** **Debopriya Mukherjee** — 126

4. Changing pattern of livelihood: evidences from the Indian Sundarbans and the" district of Purulia, West Bengal**.....** **Dr. Indrila Guha and Dr. Atrayee Banerjee** — 140

5. Role of Empathy in preventing suicidal tendency among youth **.....** **Mousumi Roy** — 153

6. Mindfulness: A new approach towards wellness..... **Neerajana Ghosh** — 160

7. Women in the 21st century: Indian context..... **Priyanka Malakar** — 170

8. Girl Children's multidimensional experience in Sports in India: Inequality cascading into Crisis ..... **Dr Saheli Chowdhury** — 177

9. Human Development Index - Indian States Compared..... **Dr. Srabani Jha** — 185

বাউল সঙ্গীত : ধর্ম ও তত্ত্বের মেলবন্ধনে

ড. অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়,
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
নহাটা যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল স্মৃতি মহাবিদ্যালয়
scamnesia@gmail.com

সারসংক্ষেপ

বাংলার লোকসঙ্গীত ধারার অন্যতম সমৃদ্ধ শাখা বাউলগান। এক বিশেষ সম্প্রদায়ের সাধনসঙ্গীত হলেও বিভিন্ন ধর্ম, দার্শনিক মত এবং সাধন পদ্ধতির মিশ্র ভাবনাই এর সম্পদ। এই বাউল সাধনার মূল সাধনপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বৌদ্ধসঙ্গীত ও দোহাকেন্দ্রিক প্রাচীন বাংলার তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের উপর। যদিও ধর্মসঙ্গীত হিসেবেই দেশের আপামর মানুষের মন জয় করেছে বাউলগান। বাউলের গূহ্য সাধনার গভীর তত্ত্বকথা প্রকাশ পেয়েছে মৃত্তিকাসংলগ্ন জীবনের সহজ ভঙ্গিতে। বাউলগানের এই জীবনমুখিতাই আকর্ষণ করেছে গ্রামীণ জীবনের স্বল্পশিক্ষিত মানুষ থেকে অতি শিক্ষিত, বিমিশ্র সংস্কৃতির নাগরিক বৈদগ্ধ্যের মানুষজনকেও। পালনীয় আচার কৃত্য ছাড়িয়ে বাউলের 'মনের মানুষ'-এর সন্ধানে গভীর আত্মানুসন্ধানের সারূপ্য খুঁজে পাওয়া যাবে বাংলার অপরাপর লোকসঙ্গীতে; আধুনিক কবি রবীন্দ্রনাথের গানে। বাংলার সমৃদ্ধ ধর্মসঙ্গীত তথা লোকসঙ্গীতের এই শাখাটির আন্তরচরিত্র সন্ধানের চেষ্টা করা হলো প্রবন্ধটিতে।

সূচক শব্দ : বাউল সঙ্গীত, ধর্ম, তত্ত্ব

কীর্তনে আর বাউলের গানে আমরা দিয়েছি খুলি
মনের গোপনে নিভৃতভুবনে দ্বার ছিল যতগুলি।

('আমরা', সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)

বাংলার লোকসঙ্গীত ধারায় বাউল-সঙ্গীত এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে আছে। অন্যান্য লোকসঙ্গীতের ন্যায় মূলতঃ কোনো জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায় কিম্বা গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে নয় বরং এক সমন্বয়ী ধর্মের উপর ভিত্তি করে বাউল সঙ্গীতের জন্ম। সেদিক থেকে বিচার করে বলা যায়, যতটা না সম্প্রদায়ের তার থেকে অনেক বেশি ধর্মীয় ভাব ও তত্ত্বের কাছাকাছি অবস্থান করে বাউল গান। আবার এই ধর্মীয় ভাবনাটিও এমন একটি মিশ্র ভাবনা যেখান থেকে কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের পৃথকীকরণ সম্ভব নয়। অর্থাৎ, তা সকল কালের সব ধর্মেরই পৃষ্ঠপোষকতাকারী এক ভাব-সম্মিলন। অথচ তাত্ত্বিক ভাবে এর জড় বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাবো যে, এর মূল সাধন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বৌদ্ধ সঙ্গীত ও দোহা কেন্দ্রিক প্রাচীন বাংলার তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের উপর। কিন্তু ভাবের মেলবন্ধনে বাউল হলো এমন এক বিশেষ ধর্ম যা তথাকথিত বহুধা বিস্তৃত ধর্মের শাখাপ্রশাখায়

কালক্রমিক ভাবে জারিত হতে হতে নানা তত্ত্ব ও ভাবের সংমিশ্রণে সর্বধর্মের এক মিশ্র আরকে পরিণত হয়েছে। বাউল যেমন আজ আর শুধুমাত্র লোকমাত্রিক কিম্বা লোককেন্দ্রিক সঙ্গীতরূপে আলোচনার বিষয় বলেই গণ্য নয়, তা বাংলা তথা ভারতের শিষ্ট সংস্কৃতির এক অন্যতম চলিষ্ণু মাধ্যম, তেমনই তার মধ্যে থেকে সূর্যের সপ্তবর্ণের মতো বিচ্ছুরিত হয়ে চলেছে বৈষ্ণব সহজিয়া সাধন তত্ত্ব, সুফী দর্শন, রাধা-কৃষ্ণ লীলাবাদ, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম, শিবশক্তি তত্ত্ব প্রভৃতি। সব থেকে বড়ো কথা, শুধু ধর্ম নয়, বরং বাউলের আজ সব থেকে বড়ো পরিচয় সংস্কৃতি রূপে। আর ধর্মসঙ্গীত বলে আধুনিক কালে যদি কিছু সৃষ্টি হয়ে থাকে তার অন্যতম দাবীদার হলো বাউল। সঙ্গীত ছাড়া বাউলের কোনো ধর্মপ্রাণতাই সর্বজনীন নয়, যদিও অনেক সমালোচকই ধর্মসঙ্গীতকে লোকসঙ্গীত রূপে গ্রহণ করার পক্ষপাতী নন।[১]

বাউলের সঙ্গে অন্যান্য ধর্মতত্ত্বের মেলবন্ধনের প্রসঙ্গটিতে প্রথমেই আসা যেতে পারে সহজিয়া ধর্ম প্রসঙ্গে। এই সহজিয়া ধর্মের দুটি ধারার কথা বলা যেতে পারে যার একটি হলো বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্ম, বাউল ধর্মকে যার প্রকাশ-মুখ বলা যেতে পারে এবং দ্বিতীয়টি হলো বৈষ্ণব সহজিয়া ধর্ম—যার আধ্যাত্মিক ভাবনাকে বাউল পরে আত্মস্থ করেছে। বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মে বলা হয়ঃ 'অপণে রচি রচি ভবনির্বাণা।/মিছেঁ লোঅ বন্ধাবও অপনা।।/অন্তে না জানহু অচিন্ত জোই।/জাম মরণ ভব কোইসণ হোই।'[২] অর্থাৎ মানুষ তার পুনর্জন্ম ও নির্বাণের কথা মনে মনে পরিকল্পনা করে তার দেহের মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে পড়ে। অচিন্ত্য যোগী আমরা জানি না, জন্ম, মৃত্যু এবং পুনর্জন্ম কিভাবে হয়? জন্মও যেরূপ, মৃত্যুও তদ্রূপ। জীয়ন্তে ও মরণে কোনোই বিশেষ নেই। বাউলরাও জীবন-মৃত্যুর এই খেলায় জীবনকে নৌকো এবং দুনিয়াকে দরিয়া হিসাবে ভাবতে বিশেষভাবে অভ্যস্ত। বাউল সঙ্গীতে উপরোক্ত বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মের কথাগুলিকেই আত্মতত্ত্বের প্রকাশরূপে দেখানো হয় অনেকটা এই ভাবে যা হলো ঃ ''জনম-ভর যত্ন করে একদিনও আমি দেখলাম নারে/আমি এই দেখবার আশায় ফাঁদ পাতিলাম/তবু পাখি পড়ে না ফাঁদে, পুড়ুত করে উড়ে যায়।' চর্যাপদের মধ্য দিয়ে বাঙালির প্রাচীন ও পরম্পরাগত অধ্যাত্মের পরিচয় পাওয়া যায়, আর বাউলের মধ্যে দিয়ে পাওয়া যায় তার ভাবজগতের অখণ্ডতার পরিচয়। আবার বৈষ্ণবীর সহজিয়া পদে যেভাবে চণ্ডীদাস বলেনঃ 'শুন হ মানুষ ভাই/সবার উপরে মানুষ সত্য/তাহার উপরে নাই।' বাউল সাধকের ধর্মও সেই সহজ মানুষকেই মরমীয়া মনের মানুষ বলে জেনে এসেছে। সে মানুষের মনে স্বর্গ-নরক, জন্ম-মৃত্যু, পরজন্ম-পুনর্জন্ম ও কালচক্র থেকেও এই আত্মসত্যের ও আত্মবিশ্বাসের উত্তীর্ণতা বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে। সর্বোপরি ঈশ্বর নামক অলৌকিক ও অমর আশ্রয় নয় বরং মরমানবের পৃথিবী ও তার লৌকিক শক্তির উপরই বাউলের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যা অনেকাংশে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমৃদ্ধও বটে। তবে একদিক থেকে বাউল বাংলার লোকধর্মের একটি মূল ধারাকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। বাংলার লোকধর্ম কখনই শাস্ত্র নির্দেশিত পথে চলেনি। উপরন্তু বাংলার লোকধর্মে ধর্ম ও জীবন প্রায়শই একে অপরের পরিপূরক হয়ে উঠেছে। সেদিক থেকে বাউলের সাঙ্গীতিক ভাবনায় যে জীবনের প্রকাশ দেখা যায় তা অন্যান্য লোকধর্মের ন্যায় সহজ ও মুক্ত, অর্থাৎ এ ধর্মসঙ্গীত হলো সহজ জীবনাশ্রিত।

বাংলা সাহিত্যে জয়দেবের গীতগোবিন্দ থেকে শুরু করে বড়ু চণ্ডীদাসের

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন তথা বৈষ্ণব পদাবলী কাব্য পর্যন্ত যে আধ্যাত্মিক ঢেউ লক্ষ্য করি তার মধ্যে স্পষ্ট একটি বিভাজন রেখা রয়েছে যার ওপারে অবস্থান করছেন ঐশী ও ঐশ্বর্যময় শক্তির আধার ভগবান স্বয়ং আর এপারে তারই আরাধনাকারী দীন-হীন ভক্ত। দুশ্চর সাধনা ও দুর্বার ভক্তি ভিন্ন সে বিভাজন রেখাটি অতিক্রম করে ভক্তের পক্ষে ভগবানের কাছে পৌঁছোনো মোটেও সম্ভব নয়। শ্রীচৈতন্য জীবনীসাহিত্য ও চৈতন্য ভাবাশ্রিত অন্যান্য সাহিত্যধারায় অলৌকিক ভাবার স্থলে মানব মহিমার প্রকাশ ঘটেছে অনেক বেশী, ঠিক যেমন ভাবে সপ্তদশ শতাব্দীর আরাকানি রাজসভা সাহিত্যের প্রণয় গাথার মধ্যে দিয়ে মানব স্বীকৃতির প্রকাশ ঘটেছে। এভাবেই অধ্যাত্ম ক্রমে লৌকিক হয়ে ওঠে। বাউলের ক্ষেত্রেও এমনটি দেখা যায়। তবে বাউল তার লৌকিক জীবনধারায় কোনোদিনই কোনো শাস্ত্রের অনুশাসনকে স্বীকার করে আসে নি বরং তা ধর্মের সহজ পরিচয় স্বরূপ মানব ধর্ম ও মানব সত্যকেই শ্রেষ্ঠ বলে জেনে এসেছে। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের বৈষ্ণব সহজিয়া সম্প্রদায়ের রচিত পদাবলীও মানবিক অনুভূতিতে ভরপুর। সেখানে শ্রীকৃষ্ণ অথবা রাধিকা সাধারণ জনসমাজেরই প্রতিনিধি। আউল-বাউলের মনের মানুষও আসলে তাই। পদাবলীর নায়ক শ্রীকৃষ্ণ যেমন বিষ্ণুপুরাণ অথবা শ্রীমদভগবৎগীতার অন্ধ অনুসরণ নয়, বাউলের মনের মানুষও তেমনি সহজ দিশায় দেহভাণ্ডে ব্রহ্মের সন্ধানে রত মানবিক প্রেম-সঙ্গীতের কাণ্ডারী মাত্র। প্রকৃত অর্থে প্রতিটি ধর্মতত্ত্বের অন্তরালে একটি স্বজাতীয় লৌকিক ধর্মবোধ ক্রিয়াশীল থাকে। এই লৌকিক ধর্মবোধটিই ধর্মের গঠনতন্ত্রকে এক মানসিক ও মানবিক দৃঢ়তা প্রদান করে, সাহিত্য-লক্ষণে যা কখনো হয়ে ওঠে সাহিত্য পদবাচ্য। আবার দৈশিক লক্ষ্যে সিঞ্চিত এই ধর্মসঙ্গীতগুলিই কখনো কখনো হয়ে ওঠে জাতীয় চেতনার ধারক ও বাহক। বাউল সঙ্গীতে বাঙালী তথা মানব ঐক্যের যে সরল বন্ধন ও সর্বজনীন ঐক্যবোধের কথা নিহিত রয়েছে তা প্রকৃতপক্ষে ভারতের আধ্যাত্মিক অস্তিত্ব এবং আত্মারই মূল নির্যাস, সারাৎসার।

বাংলার অন্যান্য লৌকিক ধর্মসঙ্গীতের ন্যায় বাউলের ক্ষেত্রেও আচারমূলক ধর্মসঙ্গীত অর্থাৎ গুরু-শিষ্য পরম্পরা এবং লৌকিক ধর্মসঙ্গীত অর্থাৎ নিরপেক্ষ তথা স্বাধীন ধর্মসঙ্গীত সাধনা—উভয় রীতিরই সাক্ষাৎ মেলে। তৎসহ হিন্দু ধর্মের বেদ আদি শাস্ত্রের বহির্ভূত ভাবনায় বিশ্বাস, মুসলিম ধর্মের ফকির, দরবেশী সাধনা ও সুফী মতবাদের সাঙ্গীকরণ, গৌড়ীয় মতবাদ ও সহজিয়া বৈষ্ণব মতবাদের ভাবমিশ্রণ প্রাক্ চৈতন্য পরবর্তীযুগে বাউল সাধনা ও সঙ্গীতকে পুষ্ট করেছে। বৌদ্ধধর্মের বজ্রযান ও কালচক্রযানে নিগূঢ় তান্ত্রিকতার প্রাধান্য আছে। কিন্তু সহজযানে তা ছিল না। তাই তা পুরাকালের (আনুমানিক দশম শতাব্দী, পাল সাম্রাজ্য) ধারা থেকে বিবর্তনের পথ ধরে যে যোগসাধনার (মিথুনাত্মক) সৃষ্টি করেছিল সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর বাউল সঙ্গীত তারই শাখায়িত ফল রূপে গণ্য।[৩] বলাবাহুল্য ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের মৃত্যুর পর (১৮৬০) বাংলার লোকসঙ্গীতের ধারায় যে জোয়ার উঠেছিল বাউল তার পালে হাওয়া যুগিয়েছিল। ঊনবিংশ শতকের বাউল সঙ্গীতে ইসলামী সুফী এবং বৈষ্ণব সহজিয়া ভাবনার যে অন্তরঙ্গ মিশ্রণ ঘটেছিল লালনের গানগুলিই তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

লালন ফকির তাঁর গানে বলেছেন 'মুরশিদ বিনে কি ধন আর আছে রে জগতে।' অর্থাৎ গুরুর অনুগ্রহ ও কৃপা ছাড়া এবং গুরুর প্রতি অবিচল ভক্তি ও নিষ্ঠা ছাড়া জগৎ অচল। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর

মতে বৌদ্ধ সহজিয়া সদগুরুর বাহ্যিক বেশ-বাস ছিল এখনকার আউলের (গুরু আউলচাঁদ) ন্যায়।[৪] হিন্দু তান্ত্রিক ধর্ম যথা শাক্ত, প্রকৃতি বর্জিত বৌদ্ধ যোগসাধনা যথা তান্ত্রিক সহজযান (যা থেকে পরবর্তীতে নাথধর্ম ও শৈবধর্মের উদ্ভব) এবং বৈষ্ণব ধর্ম যথা সহজিয়া—প্রতিটি ক্ষেত্রেই সাধক অথবা তান্ত্রিক গুরুর স্থানকে সর্বোচ্চ মানা হয়। তন্ত্রশাস্ত্রে বলা হয়ঃ 'ধর্ম্মবিদ্ধর্ম্মকর্তা চ গুরুগুপ্রীষণে রতঃ।' সহজ যানের মূল কথাও সদগুরুর উপদেশ। সহজযানের ভাষায় 'ন বিনা বজ্রগুরুণা সর্বক্লেশপ্রহাণকম্।/নির্বাপঞ্চ পদং শান্ত মবৈর্বত্তিকমাপ্নুয়াৎ।।' অর্থাৎ বজ্রগুরু ব্যতিরেকে নির্বাণ পদ পাওয়া যায় না। যে নির্বাণে সকল ক্লেশের নাশ হয়, শান্তি যে নির্বাণের চরম ফল, সে নির্বাণে আর বিবর্ত থাকে না, অর্থাৎ কোনোরূপ পরিবর্তন হয় না, সে পদ গুরুর কৃপা ভিন্ন পাওয়া যায় না।[৫] আর বাউল গীতির কোথাও কোথাও এ গুরু স্বয়ং ঈশ্বর। লালনও তাঁর ঘরের কাছে দেখেছেন এক আরশিনগর আর সেখানে যে পড়শি বসত করে তিনিই তাঁর গুরু বা সাঁই। বাউল সাধক ঈশ্বররূপী সেই গুরুকে ডেকে বলেন ঃ 'আমি ডাকি তোমায় বারংবার/এসে আমায় দেও গো দিদার/তুমি বিনে কেউ নাই আমার/ওগো মুরশিদ খোদা'। আবার বাউল মতে কখনো মানব-গুরুর মাধ্যমেই ঈশ্বর নামক পরম-গুরুর সন্ধান লাভ করা যায়। স্থূল মানব দেহের গৌরব তখনই হয় যখন সে দেহভাণ্ডে ব্রাহ্মাণ্ডের খোঁজ মেলে। বাউল সাধনা স্থূল দেহভাণ্ডে পরম ব্রহ্মাণ্ডেরই আত্মানুসন্ধান। গুরুকে বাউলগণ ভবসংসারের কাণ্ডারী রূপে কল্পনা করেছেন। জগৎ সংসার মাঝে গুরুই তাদের কাছে ঈশ্বরের একমাত্র প্রতিনিধি। শাক্তপদেও গুরুকে অন্যতম স্থান দেওয়া হয়েছে। কৃষ্ণানন্দ তন্ত্রসারে লিখেছেনঃ 'বৈষ্ণবে গ্রাহ: শৈবে শৈবশ শক্তিকে। শৈবঃ শক্তোপি সর্ব্বত্র দীক্ষা স্বামী ন সংশয়ঃ।।' অর্থাৎ বৈষ্ণবের বৈষ্ণব, শৈবের শৈব ও শাক্ত গ্রাহ্য। শৈব ও শাক্ত সর্ব্বত্রই দীক্ষাগুরু হতে পারে। গুরুকে আশ্রয় করে বাউল ধর্মসঙ্গীতে আচার মূলক ব্রহ্মসাধনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। বাউল গানে আছে ঃ 'আত্মরূপে কৃষ্ণ তিনি, পরতত্ত্বে রাধারাণী, গুরুতত্ত্বে প্রেম বাখানি, কৃষ্ণ অধর বলে, মনোহর, নে যত্ন ক'রে, দিলাম তোরে তত্ত্ব ব'লে, সাধনের এই নির্ণয়।।' (গান নং ৩৪৯) যদিও লৌকিক ধর্মসঙ্গীতে এই গুরু-শিষ্য পরম্পরাটি সর্বদা প্রচলিত নয়। বাউলের ক্ষেত্রেও এটি গণ্য। বাউল সাধনায় যেখানে গুরু-শিষ্য পরম্পরাটি প্রচলিত নয় সেখানে নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে তা বিকাশ লাভ করে। উপরন্তু বাউল সঙ্গীতে যেহেতু বেদের আচার ও আনুষ্ঠানিকতা এবং শরীয়তি নিয়ম-কানুন মানা হয় না সেহেতু উক্ত স্বাধীনতাটিও সুদূরপ্রসারী হয়। সেখানে মানব-মন, সহজ-মানুষ মনের-মানুষ, রূপের-মানুষ, ভাবের-মানুষ, সোনার-মানুষ, রসের-মানুষ, অধরা-মানুষ, সাঁই ইত্যাদি নামে অধ্যাত্ম-ভাবনাটির দেখা মেলে। লালন তাঁর গানে বলেন ঃ 'এই মানুষে সেই মানুষ আছে/কত মুনি-ঋষি চারযুগ ধরে বেড়াচ্ছে খুঁজে।' 'এই মানুষ' বলতে আত্ম বা ব্রহ্মাণ্ডের কথা বলা হয়েছে যার অবস্থান পঞ্চভূতে। লালন তাই বলেনঃ 'যাহা আছে ভাণ্ডে তাহা আছে ব্রহ্মাণ্ডে।' অর্থাৎ স্থূল দেহ হলো আত্মোপলব্ধির সোপান। আর স্থূল চরাচর অর্থাৎ আকাশ-বাতাস, নদী-পাহাড়, সমুদ্র-অরণ্য প্রভৃতি যা কিছু প্রকৃতির আদিম ও প্রাচীন সৃষ্টি—তারই মধ্যেই ব্যাপ্ত হয়ে আছে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অসীম রহস্য। তাই সংসারত্যাগী বাউল এরই মাঝে ছুটে যেতে চায়, বিলীন হতে চায়, গান বাঁধে—ব্রহ্মের উপলব্ধির প্রয়াসে, উত্তীর্ণ হতে চায় রূপ থেকে স্বরূপে। রবীন্দ্রাদর্শের সঙ্গে বাউল জীবন-দর্শনের এখানে এক গভীর মিল খুঁজে পাওয়া যায়। বাউল সাধনা প্রাকৃত দেহাধারকে অপ্রাকৃতে পরিণত করে তারই মধ্যে পরম তত্ত্বের অনুসন্ধান করে। তাই বাউল লালন

বলেন ঃ 'রূপের ঘরে অটল রূপ বিহারে/চেয়ে দেখ না তোরা।' এই দ্বিতীয় রূপ বা 'অটল রূপ'-ই হলো আসলে অরূপ বা স্বরূপ (প্রকৃতি স্বরূপা অনন্ত ব্রহ্ম)। এ হলো সেই অসীম যাকে প্রত্যক্ষ করা যায় না, শুধু অনুভব করতে হয়। লালনের অপর এক গানে দেখি 'রূপ দেখিলাম রে নয়নে/আপনার রূপ দেখিলাম রে নয়নে/আমার মাঝত বাহির হইয়া দেখা দিল আমারে।' আপনার আত্মাকে জানার এই অনুভূতিকে প্রাচীন শাস্ত্রে বলা হয় 'আত্মানং বিদ্ধি'[৬]। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনদর্শনে এই রূপ (সীমা)-কে অরূপ (অসীম)-এর সঙ্গে মেলানোর প্রয়াস করে গেছেন আর তাই তিনি তাঁর 'রূপ ও স্বরূপ' প্রবন্ধে বলেছেন ঃ 'আধ্যাত্মিক সাধনা কখনোই রূপের সাধনা হইতে পারে না। তাহা সমস্ত রূপের ভিতর দিয়া চঞ্চল রূপের বন্ধন অতিক্রম করিয়া ধ্রুব সত্যের দিকে চলিতে চেষ্টা করে। ইন্দ্রিয়গোচর যে কোনো বস্তু আপনাকেই চরম বলিয়া, স্বতন্ত্র বলিয়া ভান করিতেছে, সাধক তাহার সেই ভানের আবরণ ভেদ করিয়া পরম পদার্থকে দেখিতে চায়।'[৭] কবির ভাষায় ঃ 'সীমার মাঝে, অসীম, তুমি বাজাও আপন সুর।/আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।।' রবীন্দ্রনাথের সীমা-অসীমের ভাবসূত্রটুকু বাউল সাধনার সঙ্গে তাই অন্তরের মেলবন্ধনে জুড়ে যায়।

বাউল সাধক লালন তাঁর গানে বলেছেন ঃ 'বেদে কি তার মর্ম জানে/যে রূপ সাঁইর লীলাখেলা/আছে যে এই দেহ-ভুবনে।।/পঞ্চতন্ত্র বেদের বিচার/পণ্ডিতেরা করেন প্রচার,/মানব-তত্ত্ব ভজনের সার,/বেদ ছাড়া বৈরাগ্যের মানে।।' যান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি বিরূপ বাউল সাধক আরো বলেন ঃ 'তন্ত্র মন্ত্র বেদ পুরাণে, ঘুরায় কেবল নানা টানে,/যোগে যোগে তীর্থ স্নানে, সহজ মানুষ ধরে হারাই।' অনুরূপভাবে শাক্ত সাধকও অন্তরাত্মাকে বলেন ঃ 'মন কোরো না দ্বেষাদ্বেষি/যদি হবিরে বৈকুণ্ঠবাসী।/আমি বেদাগম পুরাণেতে করলাম কত খোঁজ তল্লাসী/ওই যে কালী কৃষ্ণ শিব রাম সকল আমার এলোকেশী।' (রামপ্রসাদ সেন)। অন্যদিকে তন্ত্র সাধকদের ন্যায় উপলব্ধি আছে ফকির নাসেরের গলায়। ফকির নাসের বলে ঃ 'দেহের বিচে দেখ আছে আজব কারখানা/তিনশত ষাট দিয়ে জোড়া করেছে দেহ খাড়া/দুই খুঁটি, একটি আড়া—বেড়া চারখানা/দশ দরজা, আট কুঠুরি—চার কুতুব, ষোলো প্রহরী/বায়ান্ন গলি, তিপান্ন বাজার, তের নদী, সাত সমুদ্দর/তাহার মধ্যে চোদ্দটা ঘর, কেউ করে না তাহার খবর—/তিন উজির, তিন বাদশা তার, এক মনিব, দুই খরিদ্দার/দালাল তাহার দুই জনা।/দেহের খবর বড় খবর/তিন তারেতে হচ্ছে সব খবর।/বারো বুরুজ, সাত সিতারা/দেহের ভিতর আছে পোরা।' শক্তি সাধক কমলাকান্ত কিম্বা রামপ্রসাদ সেন তন্ত্র নয় বরং ভক্তিচিত্ত মন নিয়েই জগজ্জননীকে কামনা করেছেন। শাক্তপদাবলীকার আপন আপন চিত্ত মাঝারে চেয়ে বলেন ঃ 'আপনারে আপনি দেখ/যেওনা মন কারু ঘরে।/যা চাবে এইখানে পাবে/খোঁজ নিও অন্তঃপুরে।' (কমলাকান্ত) কিম্বা ঃ 'আয় মন বেড়াতে যাবি/কালী কল্পতরু মূলে চারি ফল কুড়ায়ে খাবি।' (রামপ্রসাদ সেন) আর বাউল সাধকেরাও আগম, পুরাণ, বেদ কিম্বা তন্ত্রাচার নয়, মনেরই কাণ্ডারী। নব্বই-এর দশকে প্রায় বাউলের সুরেই গাওয়া দিলরুবা খানের 'পাগল মন মনরে, মন কেন এত কথা বলে' গানের কথাতেও উঠে এসেছে সেই অন্তঃহীন মনেরই খোঁজ।

বলাইবাহুল্য, বাউল যেহেতু বেদ অথবা কোরান নির্ভর নয়, দেহভাণ্ডই তার আত্মোপলব্ধির বাগান অথবা সোপান তাই বাউলদের বেদ বা কোরানের ন্যায় কোনো ধর্মগ্রন্থও নেই। তা মৌখিকভাবে রচিত ও মুখে

মুখেই তা শতাব্দীব্যাপী প্রচার লাভ করেছে। প্রবহমানতাই বাউলের প্রাণশক্তি এবং তা একপেশে আঞ্চলিকতার প্রভাব থেকেও মুক্ত। প্রবহমানতার ধর্ম কখনই কোনো কিছুতে জীর্ণতা অথবা স্থবিরত্ব আনে না। নতুন যুগের আবহে তা নতুন উপকরণ সংগ্রহ করে ও নিজের শক্তিতেই আত্মরক্ষা করে চলে। বাউলের স্বভাবধর্মও অনেকটা তাই। প্রাবন্ধিক অপূর্ব কর বলেন ঃ 'লালনের তিরোধানের (১৮৯০) প্রায় চার বছর পর ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্র 'ভারতী' পত্রিকায় লিখেছিলেন, লালনকে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে তিনি স্বপ্রণীত গানেই তার উত্তর দিতেন। লালনের জীবন কথার প্রথম লেখক রাইচরণ দাশ বা বসন্তরঞ্জন পাল সম্পাদিত ১৮৯০-এ 'হিতকরী' পত্রিকাতেও লেখা একই কথা।'[৮] বাউল তার উদার সাঙ্গীতিক সুরের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের চরণ স্পর্শ করতে চায়। সুর আর কথার বিন্যাসে মনের মানুষের কাছে সাজায় তার হৃদয়ের নৈবেদ্য। রবীন্দ্রগানেও এমনটি দেখতে পাই। কবি বলেন ঃ 'দাঁড়িয়ে আছো তুমি আমার গানের ওপারে।/আমার সুরগুলি পায় চরণ, আমি পাইনে তোমারে.' আধুনিক গীতিকবিতার মতই প্রচ্ছন্ন এক সুরেলা মিলও যেন ফুটে ওঠে বাউল গানের কোনো কোনো কথায়। যেমন লালন বলেন ঃ 'যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র যারে/পায় না যোগ ধ্যান ক'রে/সেই কৃষ্ণ গোপীর দ্বারে রয়েছে কেনা।' এরই সাথে মিলিয়ে নেওয়া যায় গীতিকবি বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল' কাব্যের সেই লাইন কটি যেখানে কবি বলেন ঃ 'কিরণ-মণ্ডলে বসি/জ্যোতির্ময়ী সুরূপসী/যোগীর ধ্যানের ধন ললাটিকা মেয়ে/নামিলেন ধীর ধীর,/দাঁড়ালেন হয়ে স্থির/মুগ্ধ নেত্রে বাল্মীকির মুখ পানে চেয়ে।'

বাউলের সব চেয়ে অবিনাশী শক্তি বলে যা আমার মনে হয় তা হলো, এর আবহমানকাল ব্যাপী ব্যাপ্তির শক্তি। উৎসে মৌখিক হলেও আজ তা লোকমান্য সাহিত্য তথা লোকসঙ্গীতের অন্যতম মুখ্য ধারা। গ্রামীণ অনুশীলনে সিদ্ধ হলেও লোকসঙ্গীতের এ ধারা আজ যেমন লেখ্য সাহিত্যে তার স্বীকৃতি ও প্রাসঙ্গিকতা আদায় করে নিতে সক্ষম হয়েছে তেমনি অনুশীলনের ব্যাপ্তিতেও তা আজ নাগরিক সমাজের বুকে এক ঐতিহ্যশালী ও সক্রিয় সঙ্গীত-মাধ্যম হয়ে উঠেছে। কিন্তু শুধুমাত্রই সাহিত্য অথবা সংস্কৃতিধর্মিতা নয়, বরং ধর্মসঙ্গীতের বিষয়বস্তু হওয়ায় বাউল ভারতীয় জীবনদর্শনেরও অঙ্গ। জীবনাশ্রয়ী লোকসঙ্গীত এবং তত্ত্বাশ্রয়ী ধর্মসঙ্গীত এই দু ধরণের স্বভাব লক্ষণই বাউলের মধ্যে বিদ্যমান। চৈতন্য-যুগ ও চৈতন্য-পরবর্তী যুগে রচিত পদাবলী সাহিত্যের ধারাতেও এমনই লৌকিক ও শাস্ত্রীয় ধর্মের সমন্বয়ী ভাবনার সম্মিলনকে বিকশিত হতে দেখা যায়। বাউল সাধনার আর এক উল্লেখযোগ্য দিক হলো এর বৈরাগ্যের দিকটি। প্রসঙ্গত বলা যায়, লোকসঙ্গীতের অন্যান্য ধারাতেও বৈরাগ্যের এ লক্ষণটিকে খুঁজে পাওয়া যায়। এ বঙ্গের বীরভূম, পুরুলিয়া, উত্তর-পশ্চিম মেদিনীপুর ও পূর্ববঙ্গের (অধুনা বাংলাদেশ) রাজশাহী ও পাবনা জেলাতে প্রচলিত ঢুয়া বা ধুয়া গানের মধ্যেও বৈরাগ্য আছে তবে তা ভাবের দিক দিয়ে বাউলের থেকে অনেকটাই আলাদা। বাউল সাধক লালন যখন সহজ মনের ধর্মে বৈষ্ণব কবিদের ন্যায় বলে ওঠেন ঃ 'যে ভাব গোপীর ভাবনা।/সামান্যের কাজ নয় সে ভাব জানা।।/বৈরাগ্য ভাব বেদের বিধি/গোপীকা ভাব প্রেমের নিধি।/ডুবে থাকে তাহে নিরবধি রসিক জনা।।' তখন মনে হয় বাউলের কাছে প্রেম ও বৈরাগ্য উভয়ে একে অপরের বিপরীত, যেখানে প্রেমই গণ্য, বৈরাগ্য পরিত্যাজ্য। কিন্তু সেই বাউল সাধকই যখন গেয়ে ওঠেন ঃ 'পিরীতের মানুষ যারা, আউলা-বাউলা হয় রে তারা।/হাসন রাজায় পিরীত কইরা, হইয়াছে

বুদ্ধিহারা।' (হাসন রাজা) তখন বাউলের বৈরাগ্য ভাবাশ্রিত মনটিকে সম্পূর্ণভাবেই সর্বপ্রকার সংসার-বাসনা মুক্ত বলেই মনে হয়। প্রথম জীবনে জমিদারি ও ভোগবিলাসে মত্ত থাকলেও হাসন রাজা শেষ দিকে বৈরাগ্য অনুভব করেন। ফলে এই সময়ে রচিত তাঁর গানে বাউলের বৈরাগী ভাবটি ফুটে উঠেছে। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণও সহজযানে বলেছেন 'বাপু হে, সবই তো শূন্য—সংসারও শূন্য, নির্বাণও শূন্য—তবে যে আমি আমি বলিয়া বেড়াই, এটা কেবল ধোঁকা মাত্র।'[৯] সংসার জালের অন্ধ কুহকী মায়ায় জর্জরিত শাক্ত সাধক কবি রামপ্রসাদ যখন বলেন ঃ 'এ সংসার ধোঁকার টাটি' তখন মনে হয় শাক্তগানও যেন সংসারচক্র ছেড়ে বৈরাগ্যের পথে চালিত। কিন্তু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় শাক্তগানে সংসার ত্যাগের বাসনা নয় বরং সংসার সমুদ্রের মাঝে দাঁড়িয়ে সকল দুঃখ জয়ের সাধনাই প্রধান হয়ে উঠেছে। পরম করুণাময়ী জগজ্জননীর কোলে আশ্রয় নেবার আকুতি নিয়ে শাক্তকবি জোর গলায় বলতে পেরেছেন ঃ 'সংসারে আনিয়ে মা গো করলে আমায় লোহা পেটা/আমি তবু কালী বলে ডাকি, শাবাশ আমার বুকের পাটা!' কখনও সাধক কবি রামপ্রসাদ বলেন ঃ 'আমি কি দুঃখেরে ডরাই।/ভবে দেও দুঃখ মা, আর কত চাই।।/আগে পাছে দুঃখ চলে মা, যদি কোনখানেতে যাই।/তখন দুঃখের বোঝা মাথায় নিয়ে দুঃখ দিয়ে মা বাজার মিলাই।।' অন্যদিকে কোনো হাহাকার কিম্বা আত্মগ্লানি ধারণ করে নয়, এক মহাপ্রেমের আকর্ষণে বাউল সাধক অনন্তের পথিক, ঘরছাড়া। মনের মানুষের খোঁজে পথের মানুষের ভিড়েই সে চিরকাল খুঁজে বেড়ায় তার চিরন্তন ঘরের আশ্রয়—তাই সে চির প্রেমিক, চির বৈরাগী। সংসার জীবনে সুজন ও কুজন হলো সেই দু'জন যারা বসত করে মানুষের মনে। শাক্ত ও বাউল দুই পদকর্তাদের পদেই এই সুজন-কুজনের পরিচয় পাওয়া যায়। লৌকিক পদকারও বলেন ঃ 'তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা, মন জান না।' সুজন হলো রসিক ও প্রেমিক। কুজন দেয় দুঃখ, কষ্ট, শোক-তাপ। ভববন্ধন খণ্ডনে মাতৃভক্তি-পরায়ণ ভক্তের ন্যায় আপন হৃদয় দ্বার উন্মুক্ত করে শাক্ত কবি মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহাতব বলতে পারেন ঃ 'নদী ও সময়, সমান উভয়,/ধীরে ধীরে নয়, লয়ে সমুদয়।/সচেষ্ট সুজন লভয়ে রতন,/জড় অভাজন, দুঃখভাগী হয়।।' আর কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত সর্বত্যাগী রসিক সুজনের মতই যেন লালন বলতে পারেন ঃ 'যে জন গোপী অনুগত/জেনেছে সেই নিগূঢ় তত্ত্ব/লালন কয় রসিক মত্ত/পেয়ে সেই রসের ঠিকানা।' বৈরাগ্যের সুর হয় উদাত্ত। বাউলের উদারতার এই গুণ আবার পূর্ববঙ্গীয় ভাটিয়ালির সুরের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। প্রচলিত ভাটিয়ালি লোকসঙ্গীতটি পূর্ববঙ্গের (অধুনা বাংলাদেশ) নদীপথে ভাঁটার টানে ক্লান্ত-মন্থর গতিতে দাঁড় টানা মাঝিমাল্লাদের গান। কালক্রমে ভাটিয়ালি গানর বিষয়বস্তু আর সুরেও বাউলের তত্ত্বকথা এবং বৈষ্ণবীয় সহজিয়া ভাবনার মিলন ঘটেছে। যেমন ঃ 'আমার কালপাখী যায় গো উড়ে/ভালোবাসার শিকল ছিঁড়ে/আহা কি করবো গো প্রাণসখী,/শূন্য পিঞ্জর যত্ন করে।' (ভাটিয়ালি, দ্বিজ মৃণাল, শ্রীহট্ট) এ সুর বাউলের ন্যায়। কালক্রমে ভাটিয়ালিতে মুর্শীদ্যা ও মারফতির তত্ত্বকথাও প্রবেশ করেছে। মানব-জীবনের দুঃখ-বেদনার অভিব্যক্তিগুলিও সেইসঙ্গে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আবার দুঃখ-বেদনার অভিব্যক্তিগুলির প্রকাশে বাউল ও শাক্তগানের মধ্যে এক আশ্চর্য মিল খুঁজে পাওয়া যায়। জীবনের আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখ এবং আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব বাউলের এক অন্যতম লক্ষণ। তা বাংলার শাক্ত পদ এবং টপ্পা গানেরও এক বিশেষ লক্ষণ। শাক্ত কবি রামপ্রসাদ লেখেন ঃ 'মা তোমারে বারে বারে জানাব আর দুঃখ কত/ভাসিতেছি দিবানিশি দুঃখ-নীরে স্রোতের শ্যাওলার মত।' কিম্বা শাক্ত কবি মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ

মহাতবের পদে দেখি ঃ 'সকলই তো গেছে যাতনা রয়েছে।/মনোসাধ মম, সব মিটে গেছে।।/পুত্র পরিবার, পিতা মাতা আর,/সকলই তো গেছে আছে, হাহাকার,/সুখ গেছে চলে, আছে তার স্থলে,/দুঃখের অনল, সতত জ্বলিছে।।' আর ত্রিতাপ জ্বালায় কাতর বাউল ফকির নাসিরউদ্দীন ঈশ্বরকে উদ্দেশ করে সকাতরভাবে বলে ওঠেন ঃ 'তুমি দয়া কর দয়াময়/দীনহীনে ডাকে যে তোমায়/তোমার আশায় চিরদিন এ যৌবন বয়ে যায়/দিনে দিনে ফুরাল দিন, আমার ভাবতে ভাবতে/তনু যে ক্ষীণ/আমায় কী ভাবেতে ভেবেছ ভিন, আমি কি তোর কেহ নয়/কত সহে জীবনে, আমি পুড়ে মলাম আশকৎ আগুনে/দেবা পার কত দিনে—দীনহীন নসরে কয়।' এর সঙ্গে আর এক লৌকিক পদকার কাঙাল হরিনাথ মজুমদারের 'হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হলো/পার করো আমারে' পদটিকেও মেলানো যায়। তবে বাউল গানের 'মনের মানুষ'-এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। এই সর্বব্যাপিতার কারণেই বোধ হয় বাউলের প্রভাবে তা টপ্পা গানেও এসেছে। টপ্পা গানেও মানুষী মনের অনুসন্ধানী কথা বলেন ঃ 'বাঁধা যার কাছে মন,—/সেই মোর প্রিয়জন,/সে জনে দরশনে, সদা প্রয়োজন।' (টপ্পা, শ্রীধর কথক)। তবে জীবনের ধোঁকা নয়, আনন্দই হলো শেষ কথা। বাউলের আদিসূত্র সহজযানেও সিদ্ধাচার্যগণ বলেন ঃ 'এই ধোকার পশরা নামাইয়া ফেলো। তখন দেখিবে কিছুই কিছু নয়। সুতরাং আনন্দ করো। আনন্দই শেষ থাকিবে। আদিতেও আনন্দ, মধ্যেও আনন্দ, শেষেও আনন্দ।'[১০] তাই সহজযানেও বলা হয় যে, দুঃখ উপস্থিত হলে মন স্থির থাকবে না, আর মন স্থির না থাকলে সিদ্ধিলাভ হবে না। আত্মার সঙ্গে আত্মার মিলনাকাঙ্খী ফকির দয়াল সাঁইও বলেন ঃ 'একবার আয় দেখিরে, তোমায় নয়ন ভরে দেখি/তোমার মতন ভক্ত পেলে, আমি হৃদমন্দিরে রাখি।/আমি নিজ শক্তি তোমায় দিয়ে/থাকব তোমার অধীন হয়ে/আত্মা আত্মায় মিশায়ে হব আমি সুখী।' বাংলার আর এক প্রচলিত লোকসঙ্গীত 'তরজা'র (কবিগানের তৃতীয় পর্যায়ের অন্যতম অংশ) কোনো কোনো হেঁয়ালিতেও চাপান-উতোর (অর্থাৎ প্রশ্নোত্তর)-এর ভঙ্গিমায় বাউল প্রসঙ্গ এসেছে। যেমন 'শ্রীচৈতন্যচরিত' কাব্যের একটি প্রাচীন তরজায় উল্লেখ আছেঃ 'বাউলকে কহিও লোক হইল আউল।/বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল।।/বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল।/বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল।।'[১১] পদটি প্রমাণ করে ষোড়শ শতাব্দীর প্রণিধানযোগ্য বাংলা সাহিত্যেও বাউল প্রসঙ্গ কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

বাউল গানের বিষয়বস্তুতে রাধা-শ্যামের প্রণয়লীলা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে লীলার পথ প্রদর্শক ও প্রত্যক্ষ সহচর রূপে লীলাকীর্তনকারী গায়কেরও পরিচয় মেলে। সাধনমার্গের তত্ত্বগুলিও সেইসঙ্গে রূপক ও সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। গঠন ভঙ্গিমার দিক থেকে এটি চর্যাপদ ও বৈষ্ণব পদাবলীর সমধর্মী। বাউল সাধক ও ভক্ত কবিগণ বৈষ্ণব পদাবলীকারদের ন্যায় প্রধানত দাস্যভাবে ভাবিত হয়ে পরম লীলাময় ও প্রেমাস্পদের কাছে নিজেকে উজাড় করে দিতে চান। এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলা যায় ঃ 'আজ পাশা খেলব রে শ্যাম'। গানটির উৎপত্তি হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর সিলেটে, সেখান থেকে সেটি ক্রমশঃ ধর্মীয় ও ভৌগোলিক সীমা পেরিয়ে পূর্ববাংলার বুকে আজ একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় গানে পরিণত হয়েছে। অন্যান্য বৈষ্ণব বাউলসঙ্গীতের মত রাধারমণ দত্ত পুরকায়স্থের লেখা গানটিও মানুষের মনে ঈশ্বরকে পাওয়ার আকাঙ্খাটুকুকে খেলার ছলে ব্যক্ত করে লেখা। গানটির পংক্তিগুলো আপাতদৃষ্টিতে সহজ ও গ্রাম্য মনে হতে

পারে, কিন্তু ভেবে দেখলে দেখা যায় কি গভীর অর্থ এতে লুকিয়ে আছে। সাধক রাধারমণ দত্ত বলেন ঃ 'ও শ্যাম রে তোমার সনে/একেলা পাইয়ারি রে শাম/এই নিঠুর বনে/আজ পাশা খেলবো রে শ্যাম/একেলা পাইয়াছি হেথা পলাইয়া যাবে কোথায়।।/চৌদিকে ঘিরিয়ারে রাখবো।। সব সখি সনে/আজ পাশা খেলবো রে শ্যাম।' 'পাশা' খেলার এই সহজ তাৎপর্যে সখারূপে ঈশ্বরকে হয়তো আমরা বাঁধতে পারি, কিন্তু পাশাখেলায় জিতে তাঁকে সত্যিই পাওয়া কি তাঁরই ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয়? লৌকিক পদাবলীতেও পাওয়া যায় ঃ 'আমি ঠেকলাম রূপের ফান্দে,—/গো সই, শ্যাম চান্দেরে।/মদনেরি পঞ্চবাণে পঞ্চশর বিন্দে,/ধইরয না মানে চিত্তে যার লাগি কান্দে,—/গো সই শ্যাম চান্দেরে।।' (ঢাকা) এ পদেও বাউলের সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব পদের ভাবসূত্রে চোখে পড়ে রাধা-কৃষ্ণের মিলনাকাঙ্খার সেই আর্তি যেখানে ভক্ত ও ভগবানের মিলনাকাঙ্খাটাই হলো মূল কথা। বৈষ্ণব পদাবলীর মতই দাসরূপী ভক্তহৃদয়ের আবদার, গোহারী ও মিনতি চমৎকারভাবে ধরা পড়ে নাসিরুদ্দীনের একটি ফকিরী পদে যেখানে নাসের বলেন ঃ 'তুমি ভক্ত হতে প্রকাশিত, ভক্ত না থাকিলে কে ডাকিত/তুমি মনিব আমি যে দাস, আমা হতে তোমার নাম প্রকাশ।' ভক্তের প্রার্থনার ভঙ্গিমাটিও এখানে চোখে পড়ে বৈষ্ণবীয় প্রার্থনা বিষয়ক পদের মতোই। এ প্রসঙ্গে মনের মানুষের সঙ্গে মিলিত হওয়ার গভীর আকাঙ্খা নিয়ে লালন ফকিরের একটি জনপ্রিয় গানের কথাও বলা যায়, যেখানে লালন বলেন ঃ 'মিলন হবে কত দিনে/আমার মনের মানুষেরও সনে।।/চাতক প্রায় অহর্নিশি/চেয়ে আছে কালো শশী/হবো বলে চরণ দাসী/ও তা হয়না কপাল গুণে।।/মেঘের বিদ্যুৎ মেঘে যেমন/লুকালে না পাই অন্বেষণ/কালারে হারায়ে তেমন/ঐ রূপ হেরিয়ে দর্পণে।।/যখন ও রূপ স্মরণ হয়/থাকে না লোক লজ্জারও ভয়/লালন ফকির ভেবে বলে সদাই/প্রেম যে করে সে জানে।' গানটি লালন খুব সম্ভবত লিখেছিলেন প্রতিটি মানুষের অন্তঃস্থলে সেই রাধাকে দেখতে পেয়ে, যে তার চিরকালের প্রেমিক কৃষ্ণের জন্য আকুল হয়ে অপেক্ষা করে থাকে। আরাধ্যজনের প্রতি গভীর প্রেম ও ভক্তি নিয়ে লেখা এই গানটি। গানটি পরবর্তীতে Dr. Carol Salomon ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। লালনের সমসাময়িক দ্বিজভূষণ রচিত আর একটি জনপ্রিয় বাউল গানেও বৈষ্ণব পদাবলীর ঢংটি লক্ষণীয়। গানটি হলো ঃ 'ভুবনো মোহনো গোরা, কোন মণিজনার মনোহরা/ওরে রাধার প্রেমে মাতোয়ারা চাঁদ গৌর/ধূলায় যাই ভাই গড়াগড়ি/যেতে চাইলে যেতে দেবো না।/তোমার হৃদয় মাঝে রাখিবো ছেড়ে দেবো না।/তোমায় হৃদ মাঝারে রাখিবো ছেড়ে দেবো না।/যাবো ব্রজের কুলের কুলে/আমরা মাখবো পায়ে রাঙ্গাধূলি/ওরে নয়নেতে নয়ন দিয়ে রাখবো তারে/চলে গেলে যেতে দেবো না/তোমায় হৃদ মাঝারে রাখিবো ছেড়ে দেবো না।/তোমায় বক্ষ মাঝে রাখিবো ছেড়ে দেবো না।' বাউল পদকর্তাদের সঙ্গে বৈষ্ণব রস সাহিত্যের সম্পর্ক যে নিগূঢ় ছিল তারও প্রমাণ মেলে অন্য আর একটি ঐতিহাসিক সূত্রেও। প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে যশোহর জেলার বাড়খাদিয়া গ্রামের মধুসূদন কিন্নর রাধামোহন বাউলের কাছে ঢপকীর্তন শিক্ষা করেন।[১২]

সাধনমার্গের পথে বৈচিত্র্যের মধ্যে একাত্মতা, তাত্ত্বিক পার্থক্যের মাঝেও একতা ও সমন্বয় সাধনই বাউলের চিরকালীন স্বভাবধর্ম। সে কারণে হিন্দু বাউলের কণ্ঠে নবীন প্রেম ও ইসলামী জীবনদর্শন যেমন স্বাভাবিক তেমনই মুসলিম ফকিরও হিন্দু জীবনদর্শন ও রাধাকৃষ্ণ লীলাতত্ত্বকে

আপন করে নেন কিম্বা চৈতন্যবিষয়ক পদ নিয়ে সঙ্গীত রচনা করেন। একই দেহের মাঝে ভগবান কিম্বা আল্লার বসতি বাউল সাধনায় ধর্মের একলীনতাকে স্পষ্ট করে। ঈশ্বরের ক্রিয়ার রহস্যকে বুঝতে গিয়ে মানুষের অসহায়তার কথা তুলে ধরতে বাউল সম্রাট লালন সাঁই বলেনঃ 'কে বোঝে মওলার আলেকবাজি।/করছে রে কোরানের মানে/যা আসে যার মনের বুঝি।।/একই কোরান পড়াশুনা/কেউ মৌলবি কেউ মওলানা/দাহেরা হয় কত জনা/সে মানে না শরার কাজি।।' কিম্বা লালনের পদে ঃ 'সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে/লালন ভাবে জাতের কীরূপ দেখলেম না এই নজরে।' আবার ফকির সাঁই বলে ঃ 'যখন গড়েছিল আদম, এক চিজ রেখেছে কম—এই ভালোবাসার কাম।/আর, জপতপ, ভজন সাধন, সে ধন বিনে সব অকারণ/আবার যদিও শুনি আলিফে লাম লুকায় যেমন, এই মানুষে সাঁই/আছে তেমন/জাতে আর সিফাতে খোদা, মিশে সদাই/এবং কুলুবেন মোমিন আরশ আল্লাতালা/কোরানেতে আছে খোলা/যেদিকে ফিরাই আঁখি, সেইদিকে তোমারে দেখি/যেখানে ফুল সেখানে বাস, থাকে মিশামিশি,/তবে কেন দেও না দেখা বলো, করি কী উপায়/সাঁই এর আজব লীলা আমার বুঝার সাধ্য নাই। আহাদে আহমদ হল মোহাম্মদে লুকাইল/আদমরূপে প্রকাশ হল, তিনে হল এক বরণ।' হিন্দু-মুসলমানের অভেদ বোঝাতে ফুলবাস উদ্দীন তাঁর ফকিরি গানে বলেন ঃ 'জাত বিজাতি যে বাছে/তার চেয়ে আর বোকা কে আছে।/আর ব্রহ্মাণ্ডময় একই খোদা/এই মানুষ ছাড়া নয়কো জুদা/এক চিজেতে সবাই পয়দা,/ধাঁধায় পড়ে ঘুরতেছে।/বামুক কায়েত হাড় মুচি/একই জলে হলেন শুচি/সেখানে নাই বাছাবাছি/সকলে শুচি হচ্ছে।/আর চন্দ্র সূর্য নক্ষত্রগণ/এই মাটির উপরে সবারি আসন/এক মনিবের সব প্রজাগণ/ফুলবাস উদ্দীন ভাবতেছে।' আবার নাসিরের একটি পদে দেখি ঃ 'আমি দুগ্ধ, তুমি মাখন, আমি পাথর, তুমি আগুন/আমি ফুল, তুমি ঘ্রাণ—রাখছি জাত সিফাতে/জাত সিফাতে সিফাতে জাত, আমি তুমি নয়কো তফাত/তুমি আছ নসরের সাথ, খেতে শুতে পথে যেতে।' পদটিতে এক সুমধুর কবিত্বের মধ্যে দিয়ে অভেদতত্ত্বের সহজ কথাটি সুন্দরভাবে পরিবেশিত হয়েছে। আউল-বাউল সাহিত্যে এমন পদের সংখ্যা অসংখ্য। তুলনামূলকভাবে বাংলায় বৈষ্ণব বাউল শাখার সংখ্যা মুসলিম ফকির শাখার থেকে বেশী হলেও ধর্মগত বা আচারগতভাবে তা কখনও বাউল সঙ্গীতকে সংকীর্ণ করতে পারে নি।

তথ্যসূত্র ঃ

১. বাংলার লোক সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গ, পৃঃ ৩৭৮
২. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৫৬
৩. বাংলার লোক সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গ, পৃঃ ৩৮২
৪. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৬৩
৫. তদেব, পৃঃ ৩৫৭
৬. লোকশিক্ষার আলোয় শ্রীরামকৃষ্ণ, পৃঃ ৪৬৩
৭. রূপ ও অরূপ, সঞ্চয়, রবীন্দ্র রচনাবলী, বৈদ্যুতিক সংস্করণ, পৃঃ ২
৮. বাঙালি আত্মার মহোজ্জ্বল প্রকাশ, ক্লেদজ কুসুম, পৃঃ ৩২
৯. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৬৪

১০. তদেব, পৃঃ ৩৬৫
১১. বাংলার লোক সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গ, পৃঃ ২৮৩
১২. তদেব, পৃঃ ৩৬৭

গ্রন্থাবলী ঃ

১. চৌধুরী, সত্যজিৎ (সম্পাদনা), হরপ্রসাদ শাস্ত্র রচনা-সংগ্রহ, তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২য় মুদ্রণ, জুলাই ২০০১
২. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, সঞ্চয়, রবীন্দ্র রচনাবলী, বৈদ্যুতিন সংস্করণ, ভাষাপ্রযুক্তি গবেষণা পরিষদ পরিবেশিত
৩. ভট্টাচার্য, ড. গৌরী, বাংলার লোক সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, মার্চ, ১৯৮৯
৪. বক্সী, ড. পি.জি. লোকশিক্ষার আলোয় শ্রীরামকৃষ্ণ, পুনশ্চ, আগস্ট ২০০৯
৫. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, লোক সঙ্গীত রত্নাকর, পশ্চিমবঙ্গ লোক-সংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, কলকাতা, ১৯৬৬
৬. দাশগুপ্ত, শশিভূষণ, শ্রী রাধার ক্রমবিকাশ : দর্শনে ও সাহিত্যে, মুখার্জি অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ৩য় সংস্করণ, ১৩৭০
৭. চক্রবর্তী, সুধীর, ব্রাত্য লোকায়ত লালন, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ডিসেম্বর ১৯৯২
৮. ঝা, শক্তিনাথ, লালন সাঁই এর গান, কবিতা প্রকাশ, কলকাতা ২০০৫
৯. চক্রবর্তী, সুধীর, গভীর নির্জন পথে, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা, জুলাই ১৯৮৯
১০. চট্টোপাধ্যায়, প্রণবকুমার (সম্পাদনা), ক্লেদজ কুসুম, বইমেলা, ১৪২২, ফেব্রুয়ারী ২০১৬
১১. সেনশাস্ত্রী, ত্রিপুরাশঙ্কর, শাক্ত পদাবলী : সাধন-তত্ত্ব ও রসবিশ্লেষণ, এস ব্যানার্জি অ্যান্ড কোং ও ঝামা পুস্তকালয়, কলকাতা, ১৯৮৮
১২. রায়, অমরেন্দ্রনাথ (সম্পাদনা), শাক্তপদাবলী (চয়ন), একাদশ সংস্করণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ২০০২

ওয়েবসাইট ঃ

১. http://lalonsain.wordpress.com
২. http://bn.wikisource.org

ঠাকুরমার ঝুলি ও আজকের শৈশব ঃ একটি পর্যালাচনা

ডঃ ইন্দ্রাণী দত্তশতপথী
অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর,
বাসন্তী দেবী কলেজ
ই-মেইল—idsatpathi@gmail.com

সারসংক্ষেপ

বিশ শতকের গোড়ার দিকে ঢাকা, ময়মনসিংহের গ্রামে গ্রামে ঘুরে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার 'ঠাকুরমার ঝুলি'র গল্পগুলি সংগ্রহ করেছিলেন। ঠাকুরমার মুখের কথাকে ছাপার অক্ষরে তুলে ধরে তিনি রূপকথার এক অপরূপ জগত সকলের কাছে মেলে ধরলেন যার ফলে সবচেয়ে উপকৃত হল শিশুরা। রূপকথা শিশুকে ভাবতে শেখায় যে সে একা নয়, সে একটা বড়ো কিছুর সঙ্গে যুক্ত। বিরাট একটা প্রাচীনকাল, একটা অবহমানতার সাথে যুক্ত সে। শিকড়ের সন্ধান দেয় রূপকথা। রচনাটির মধ্যে আজকের শিশুমন ও রূপকথার প্রাসঙ্গিকতার বিষয়টি নানা অনুষঙ্গে বলা হয়েছে। যান্ত্রিকসভ্যতায় ব্যস্ত কল্পনাবিমুখ শিশুদের মনের সুন্দর অনুভূতিগুলি বিকশিত করে তুলতে রূপকথার তুলনা নেই।।

সূচক শব্দ : রূপকথা, বর্তমানের শিশু, আনন্দের প্রাপ্তি

আজকের দিনে শিশু ও কিশোরদের কাছে 'ঠাকুরমার ঝুলি' যে কতটা প্রাসঙ্গিক, আমার এই আলোচনায় সেই দিকগুলোকেই স্পর্শ করার চেষ্টা করেছি। এই প্রসঙ্গে আমরা স্মরণ করব দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারকে, যিনি বিশ শতকের গোড়ার দিকে ঢাকা, ময়মনসিংহের গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরেছেন, গ্রামের বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের মুখ থেকে শুনেছেন লোক-আখ্যান। কখনো সেকেলে এক ফোনোগ্রাফের সাহায্যে মোমের রেকর্ডে মুদ্রিত করে নিচ্ছেন আখ্যানগুলো। বার বার শুনেছেন সেসব। চেষ্টা করেছেন বিভিন্ন রূপভেদ থেকে মূল ঐক্যসূত্রটি খুঁজে পেতে। ক্রমাগত বাছাই ঝাড়াই এর কাজে গ্রন্থনার কাজে তাঁকে যথেষ্ট সাবধানী হতে হয়েছিল। দেখতে হচ্ছিল যাতে সহজ নৈপুণ্য অনায়াস দক্ষতার পরিচয় লেখ্য পাঠে বজায় থাকে; যাতে বাকস্পন্দ, ছন্দময় সংলাপ সাবলীল ও অক্ষুণ্ণ থাকে।

'ঠাকুরমার ঝুলির' ভূমিকা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি ভূমিকায় জানালেন '''ঠাকুরমার ঝুলি'র মতো এত বড়ো স্বদেশী জিনিস আমাদের দেশে আর কি আছে? ...দক্ষিণারঞ্জনবাবুর ঠাকুরমার ঝুলি বইখানি পাইয়া তাহা খুলিতে ভয় হইতেছিল। আমার সন্দেহ ছিল, আধুনিক কলমের কড়া ইস্পাতের মুখে এ সুরটা পাছে বাদ পড়ে, এখনকার কেতাবী ভাষার এ সুরটা রাখা বড়ো শক্ত, আমি হইলে তো এ কাজে সাহসই করিতাম না। .....কিন্তু দক্ষিণারঞ্জনবাবুকে ধন্য! তিনি ঠাকুরমার মুখের কথাকে ছাপার অক্ষরে তুলিয়া পুঁতিয়াছেন তবু তাহার পাতাগুলি প্রায় তেমনি সবুজ, তেমনি তাজাই রহিয়াছে। রূপকথার সেই বিশেষ

ভাষা রীতি, তাহার সেই প্রাচীন সরলতাটুকু তিনি যে এতদূর রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার সূক্ষ্ম রসবোধ ও স্বাভাবিক কলানৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে"।[১]

আজকের দিনের সঙ্গে ঠাকুরমার ঝুলির প্রাসঙ্গিকতার আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় এর মধ্যেকার সম্পর্কের বিন্যাসের কথা। রূপকথায় যেসব চরিত্র আসে তাদের মধ্যে যে সম্পর্কের বিন্যাস, তার সঙ্গে আজকের শিশু কতটা পরিচিত? সেইসব সম্পর্কের সঙ্গে সে নিজেকে কীভাবে মিলিয়ে নিতে পারে? ঠাকুরমার ঝুলির বিভিন্ন গল্পে ভাইয়ে-ভাইয়ে, বন্ধুতে-বন্ধুতে যে সম্পর্ক দেখা যায়, আজকের শিশুদের প্রতিযোগিতামূলক সম্পর্কের টানাপোড়েনে সে সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া কঠিন।

'ঠাকুরমার ঝুলির' 'নীলকমল আর লালকমল' গল্পে এক রাজার দুই রানি, এক রানি রাক্ষসী। দুই রানির দুই ছেলে মানুষ রানির ছেলে কুসুম, আর রাক্ষসী রানির ছেলে অজিত। অজিত আর কুসুম দুই ভাই গলাগলি। রাক্ষসী সতীন পুত্রকে তিন ছত্রিশ গালি দেয়, দাদাকে নিয়ে গিয়ে অজিত নিরালায় চোখের জল মুছায়। 'দাদা আর থাক, আর আমরা মার কাছে যাব না।' একদিন মস্ত এক রাক্ষস কুসুমকে খেতে এল। রাজা চোখের জলে ভেসে গেলেন। রাক্ষসী রানি খিলখিল করে হেসে উঠল। অজিতের ঘুম ভেঙ্গে গেল।

'রাত কেন নিশে / মন বিষে / দাদা কাছে নাই কেন?'

অজিত ধড়মড় করে উঠে দেখে ঘর ছম্‌ছম্‌ করছে, রানির হাতে বালা কাঁকন ঝমঝম করছে, দাদাকে রাক্ষসে খাচ্ছে।

'গায়ের রোমে কাঁটা, চোখের পলক ভাঁটা।

অজিত ছুটিয়া গিয়া রাক্ষসের মাথায় এক চড় মারিল।' রাক্ষস আঁই আঁই করে পালিয়ে গেল।

লালকমল নীলকমলের পরস্পরের প্রতি ভালোবাসায়, বোঝাপড়ায় এবং বুদ্ধিতে দুঃসহ সেই অভিযান জয়যুক্ত হয়েছিল। 'সোনার কাঠি রূপার কাঠি' গল্পের সেই অংশটা একবার দেখে নিতে পারি - বন্ধু মন্ত্রীপুত্রের চিৎকারে রাজপুত্র ধড়মড় করে উঠে বসল এবং দেখল রাক্ষসী মন্ত্রীপুত্র আর মন্ত্রীপুত্রের ঘোড়াকে খেয়ে ফেলছে। রাজপুত্র অস্থির হয়ে উঠল। 'তরোয়াল খুলিয়া রাজপুত্র দাঁড়াইলেন, রাজপুত্রের পক্ষিরাজ চেঁচিয়ে বলিল— 'রাজপুত্র, পালাও, পালাও আর রক্ষা নাই।'

রাজপুত্র বলিলেন, 'পলাইব না। বন্ধুদের খাইয়াছে, রাক্ষসী মারিব।'[২]

রূপকথার গল্পে রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, সওদাগর পুত্র, কোটালপুত্র এমন কি রাখালের সঙ্গেও এমন বন্ধুত্ব দেখা যায় যা সহস্র বিপদেও অটুট থাকে। বিশ্বাসঘাতকতা করে না একে অপরের সঙ্গে।

রূপকথার রাজপুত্রদের অনেক বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করতে হয়, তাদের অভীষ্টে পৌঁছাতে যারা সাহায্য করে, তাদের মধ্যে একদল স্বেচ্ছায় সাহায্য করে, এরা প্রায়ই পাখি বা মাছ বা গাছ ইত্যাদি। আবার অন্যদল ইচ্ছে না করেও সহায়ক হয়। গ্রীম ভাইদের গল্পেও সহায়ক প্রাণীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। বাংলা রূপকথায়

ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী কিংবা শুক-সারীর মতো চরিত্র বারবার আসে। ইয়ুং একেই বলেন, 'Archetype of the spirit' (C. G. Jung : Four Archetypes.)। ঠাকুরমার ঝুলির বিভিন্ন গল্পে দেখি এরা বিভিন্ন সমাধান বাৎলে দেয়, রাজপুত্র ও রাজকন্যাকে নিশ্চিত আশ্রয়ে পৌঁছে দিতে অযাচিত হাত বাড়িয়ে দেয়।

শুক কয়, 'সারি, সারি! বড় শীত।
সারী বলে, 'গায়ের বসন টেনে দিস।
শুক বলে, 'বসন গেল ছিঁড়ে, শীত গেল দূরে',
কোনখানে সারী নদীর কূল?

সারী বলে, 'দুধ-মুকুটে ধবল পাহাড় ক্ষীর সাগরের পাড়ে / গজমোতির রাঙা আলো ঝরঝরিয়ে পড়ে। আলোর তলে পদ্ম-পাতে খেলে দুধের দল / হাজার হাজার ফুটে আছে সোনার-কমল।'[৩]

'শীত-বসন্ত' গল্পে 'গজমোতি' পাওয়ার উৎসটি এইভাবে বেরিয়ে এল শুক-সারীর কথোপকথনে - যা কিনা গল্পের মূল চরিত্রকে সঠিক পথের ঠিকানা দিয়ে গেল।

এরা মানুষের মতো কথা বলে, কাজ করে। অভীষ্টের পথে পৌঁছুতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। ঠাকুরমার ঝুলির অনেক গল্পে দেখা যায় নৈসর্গিক যা কিছু তার মধ্যেও প্রাণিত্বের সঞ্চার ঘটেছে (সর্বপ্রাণবাদ)।

ঠাকুরমার ঝুলির গল্পগুলির মধ্যে প্রকৃতি বন্ধুর ভূমিকা নেয়, 'দিন যায়, রাত যায়, অরুণ বরুণ কিরণমালা চাঁদের মতো বাড়ে, ফুলের মতন ফোটে, অরুণ বরুণ কিরণের হাসি শুনিলে বনের পাখি আসিয়া গান ধরে, কান্না ধরিলে বনের পশু ছুটিয়া আসে। 'সোনার কাঠি, রূপোর কাঠি' গল্পে রাক্ষসীর ভয়ে নিরুপায় রাজপুত্র সামনে এক আমবাগান দেখে বলল, 'হে আমগাছ যদি তুমি সত্যকারের বৃক্ষ হও, রাক্ষসীর হাত হইতে আমায় রক্ষা করো। আমগাছ দু'ফাঁক হইয়া গেল। রাজপুত্র তাহার মধ্যে গিয়া হাঁফ ছাড়িলেন'। গাছের ভিতর রাজপুত্র বলল, 'হে বৃক্ষ, যদি সত্যিকারের বৃক্ষ হও তো আমাকে একটি আমের মধ্যে ঐ পুকুরের জলে ফেলিয়া দাও।'[৪] অমনি গাছ থেকে একটা আম টুপ করে পুকুরের জলে পড়ল। তখনি একটা বোয়াল সেটাকে খাবার মনে করে এক হাঁয়ে গিলে ফেলল। পেটের ভেতর আম, আমের ভেতর রাজপুত্র বলল, 'হে বোয়াল, যদি তুমি সত্যিকারের মাছ হও তো আমাকে একটি শামুক করিয়া ফেলিয়া দাও।' বোয়াল রাজপুত্রকে শামুক করে ফেলে দিল। এইভাবেই আমরা দেখি প্রকৃতি, জীবজন্তুর সঙ্গে নিবিড় সখ্যতা রূপকথার জগতের ঘনিষ্ঠ অনুষঙ্গ। রূপকথার চরিত্রগুলি প্রকৃতি, গাছপালা, ফুল-ফল, নদ-নদী, পাখি, জীবজন্তু সব কিছুর সঙ্গে মানবিক সম্পর্কে আবদ্ধ। প্রকৃতির বুকে এই যে আশ্রয় এই যে নিরাপত্তা তা আজকের শিশু কল্পনা করতে পারে না। কারণ আজকের যন্ত্রসভ্যতায় (Industrialisation) অভ্যস্ত যান্ত্রিক জীবন পদ্ধতিতে শিশুরা বয়স্ক মানুষের মতো হয়ে উঠেছে। আকাশ-ছোঁয়া ফ্ল্যাটের বাসিন্দা হয়েও তারা দেখতে পায় না নীল আকাশ, রামধনু-ওঠা। তাদের হাতছানি দেয় না তেপান্তরের মাঠ। নিঝুম দুপুরে ঘুমন্ত পরিবেশ তাকে ঘুমন্তপুরীর ইশারা দেয় না বা পাখি-পাখালির কণ্ঠস্বরে খুঁজে পায় না ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর কণ্ঠস্বর।

তিনকড়ি দাসীর মুখে-শোনা রূপকথা শিশু রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যেত এক

মায়ার জগতে। দ্বারকানাথের আমলে একটা পুরোনো পালকি পড়ে থাকত খাতাঞ্চিখানার বারান্দার এক কোণে। রবিবারের ছুটির ফাঁকে সেই পালকির সওয়ার হয়ে শ্যামের কাছে শোনা গল্পের জালে জড়িয়ে কল্পনার আস্বাদ গ্রহণ করতেন রবীন্দ্রনাথ। প্রত্যেকটা শিশুর মধ্যেই অবদমিত হয়ে থাকে এক একটি বীরপুরুষ—

'তুমি বললে, যাস্ নে খোকো ওরে,
আমি বলি, দেখো না চুপ করে
ছুটিয়ে ঘোড়া গেলেম তাদের মাঝে
ঢাল তরোয়াল ঝনঝনিয়ে বাজে
কী ভয়ানক লড়াই হল মা যে
শুনে তোমার গায়ে দেবে কাঁটা। (বীরপুরুষ)[৫]

রূপকথার মুখ্যচরিত্রের শৌর্য প্রমাণিত হয় তার সম্ভাব্য শক্তির গুণে। 'বীরপুরুষ' কবিতায়ও কল্পযুদ্ধে প্রতিপক্ষ ডাকাতেরা পরাজিত হয় শিশুটির কাছে। কল্পনায় সে নিজেকে জানে রাজপুত্র বলে। এ কবিতায় প্রধান চরিত্র শিশু, রূপকথার রাজপুত্রের মতোই সে বিঘ্ন বিপদজয়ী বীরপুরুষ।

রূপকথার বিভিন্ন গল্পে ইচ্ছাপূরণের মধ্য দিয়ে মানুষের মনের গভীর আকাঙ্খাগুলি ফলবতী হয়ে উঠতে পারে। জাগতিক বিশ্বে প্রত্যাশাপূরণের সম্ভাবনা কম। ইচ্ছাপূরণ রূপকথারই অন্তর্গত। হান্স ক্রিশ্চিয়ান আন্ডারসনের গল্পে রাজপুত্র পেয়ে যায় আসল রাজকন্যাকে অথবা কদাকার হাঁসের ছানা দেখতে সুন্দর হয়ে ওঠে। (Hans Christian Anderson - The Ugly Duckling)। আমাদের বাংলা রূপকথাতেও বিজয়ী রাজপুত্রের রাজত্ব লাভ অতি-সাধারণ ঘটনা মাত্র— এইভাবেই রূপকথা জগতে ইচ্ছেগুলো ক্রমশ পৌঁছে যায় প্রাপ্তির লক্ষ্যে।

আধুনিক যুগের অনেকে রূপকথাকে আজগুবি বলে উড়িয়ে দিতে চান, রাক্ষস-খোক্কোস, ঝিনুকের মধ্যে রাজপুত্র— যতসব অবাস্তব জিনিস। আজকাল আমরা বড় কষ্টের সঙ্গে লক্ষ্য করি চারপাশের শিশুদের শৈশব বলে যেন কিছু নেই। নেই কল্পনা, রোমান্টিসিজম্, নেই আশেপাশে খুব চেনা পৃথিবীর সৌন্দর্যে বিস্ময়বোধ। তারা যেন কল্পনা-বিমুখ, বয়স্ক মানুষ। বর্তমান প্রজন্মের এই ছেলেমানুষীহীন ছেলেবেলা নিয়ে সারা বিশ্ব এখন চিন্তিত। সমাজতাত্ত্বিক, মনস্তাত্ত্বিকরা এখন সকলেই একমত যে বাস্তবের সঙ্গে অতি অল্প বয়সেই এখন সকলেই অত্যন্ত বেশি পরিচিত বলেই অকালে ঝরে যাচ্ছে তাদের শৈশব, বিকাশ ঘটছে না তাদের কল্পনার, হারিয়ে যাচ্ছে সৃজনশীলতা।

রূপকথার বাস্তবকে সম্পূর্ণতা দিতে প্রয়োজন হয় আপাত-অবাস্তব গহন অন্তর্লোকের এক বাস্তবতা। বাস্তব জগত এত বেশি জটিল যে তাকে তার সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ করার কোনো বাস্তব উপায় নেই। শুধু চোখ দিয়ে বা সম্পূর্ণ detouched হয়ে বাস্তবকে দেখা যায় না। চোখের সঙ্গে মন মিশে, কল্পনার স্মৃতির রঙ মিশে কোনো বস্তুকে পরিপূর্ণ রূপ দেওয়া যায়।

আধুনিক ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় মৌলিক দুর্বলতাগুলিই শিশুকে পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে বাধা সৃষ্টি করছে। এই

শিক্ষা ব্যবস্থায় বিদ্যার সঙ্গে প্রাণের যোগ সাধিত হচ্ছে না। 'তোতাকাহিনি'র (রবীন্দ্রনাথ) মূর্খ পাখির মতো নবীন শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক প্রাণের স্ফূর্তি প্রকাশে বাধা দিয়ে তাকে বিদ্যালয়ের খাঁচায় ভরা হচ্ছে। তাই স্বতঃস্ফূর্ত জীবনের সঙ্গে আনন্দের সঙ্গে শিশুদের যোগাযোগ ছিন্ন হচ্ছে। পৃথিবীর জটিল সমস্যা শিশুমনে স্থান পায় না। নানারকম সম্ভব-অসম্ভব আশা-আকাঙ্খার রঙীন কল্পনায় তার শিশুমন বুঁদ হয়ে থাকতে চায়। রূপকথার গল্প তার সামনে একটা দিগন্ত বিস্তৃত বাধা বন্ধনহীন কল্পনা রাজ্যের দ্বার খুলে দেয়। তার সংসারানভিজ্ঞ মনে মুক্তির বার্তা এনে দেয়।

''পৃথিবীর আর সকলে টাকা খুঁজছে, নাম খুঁজছে, আরাম খুঁজছে আর যে আমাদের রাজপুত্তুর সে দৈত্যপুরী থেকে রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে বেরিয়েছে। তুফান উঠল, নৌকা মিলল না, তবু সে পথ খুঁজছে; এইটেই হচ্ছে মানুষের সব গোড়াকার রূপকথা আর সব শেষের। পৃথিবীতে যারা নতুন জন্মেছে দিদিমার কাছে তাদের এই চিরকালে খবরটি পাওয়া চাই যে, রাজকন্যা বন্দিনী, সমুদ্র দুর্গম, দৈত্য দুর্জয়, আর ছোটো মানুষটি একলা দাঁড়িয়ে পণ করছে, বন্দিনীকে উদ্ধার করে আনব''।[৬]

এবারে একটু বড়দের কথায় আসা যাক। ঠাকুরমার ঝুলির রূপকথাগুলির মধ্যে ধরা পড়ে সমাজ বিন্যাসের নানা খুঁটিনাটি। সে কেমন সমাজ? নারীদের স্থানই বা কোথায়? এ বিষয়ে প্রাবন্ধিক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কয়েকটি কথা স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বাংলাদেশের সামাজিক ব্যবস্থা ও বিচারের একটা সম্পূর্ণ ছবি প্রতিফলিত হতে দেখেছেন রূপকথার মধ্যে। এবং তাঁর মতে, ''আমাদের সামাজিক ব্যবস্থার দৃঢ়ীকরণ সমাপ্ত হইবার পর ইহার জন্ম। সমস্ত রূপক ও বর্ণনা-বাহুল্যের অন্তরালে আমাদের বঙ্গদেশের পরিবার ও সমাজের একটি নিখুঁত ছবি ইহার মধ্যে পাওয়া যায়। আমাদের বহুবিবাহ, আমাদের গৃহের সপত্নীবিরোধ, সপত্নী পুত্রের প্রতি বিমাতার অত্যাচার, রূপসী প্রণয়িনীর মোহ ও পরিশেষে সেই মোহভঙ্গ, আমাদের শঠতা ও বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদি আমাদের পারিবারিক জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি কল্পনার উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হইয়া আমাদের সম্মুখে দেখা দেয়''[৭] (রূপকথা)।

রূপকথা তাই শিশুপাঠ্য হয়েও বড়দের কাহিনির সঙ্গে পরতে পরতে জড়িয়ে থাকে। গ্রামীণ সমাজে প্রচলিত এইসব রূপকথাগুলিতে আছে সামন্তপ্রথার নানা শৃঙ্খলা। ড. দিব্যজ্যোতি মজুমদার এর সুন্দর বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে, ''আগেকার দিনে নারীত্বের পূর্ণ বিকাশের আগেই মেয়েদের যেতে হত পরগৃহে। শ্বশুরবাড়িতে একান্নবর্তী গ্রামীণ পরিবারে শাশুড়ি, ননদ, জায়েদের খবরদারি শাসন-ঈর্ষা, ঘৃণা, রূপকথার বড় রানিদের প্রতিরূপ হয়ে দেখা দেয়।''[৮]

প্রাচীন রূপকথাগুলি গ্রাম্য জীবননির্ভর এবং সেই জীবন কৃষিভিত্তিক বাংলার গ্রাম্যজীবনকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। প্রাচীন রূপকথায় দেখি ঐশ্বর্যের ছড়াছড়ি। রাজকীয় চরিত্র, রত্নালঙ্কার, রাজকীয় যানবাহন, মূল্যবান পোশাক-আশাক সবকিছু থাকলেও তা যে সামন্ততন্ত্র গ্রাম্য অর্থনীতির উপর ভিত্তি করে উঠেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাই একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে, অঙ্গ মার্জনের জন্য ঘরে খৈল গামছা রাখতে হয়। তাদের অনেক পরিশ্রমও করতে হয়। রাজপুত্রের রাখালবন্ধুও সম্ভ্রান্ত সমাজের একজন হয়ে ওঠে।

ঠাকুরমার ঝুলিতে রাক্ষস-খোক্কস দৈত্য দানোর আনাগোনা। এ সবের কার্যকলাপ শিশুদের কাছে ভীষণ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। কিন্তু এই অদ্ভুত চরিত্র কল্পনা কেন? এ নিয়ে অনেক মতামত আছে। তা যে প্রতীক বা সংকেত-রূপে আসে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সেগুলি প্রকৃতপক্ষে কী ধরনের? 'রাক্ষস-খোক্কস, দৈত্য, দানো, ডাইনি, পেত্নি-এর গোষ্ঠীর (এবং অবশ্যই ব্যক্তিরও) মনের অন্তঃশীলা স্তরে অশুভ বা ক্ষতিকারক বা অমঙ্গলসূচক বলে যা প্রতিভাসিত হয়, তাদেরই বহিরাঙ্গিক স্তরের ভাবনার প্রতীক স্বরূপ।[৯]

আবার এক নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে রাক্ষসীদের দেখেছেন আধুনিক সমালোচক শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, ''ঠাকুরমার ঝুলির গল্পগুলিতে দেখতে পাই রাক্ষসীরা সংসারের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে একেবরে উলোট-পালট ঘটিয়ে দেয়। রাজা ছদ্মবেশী রানিকে দেখে মোহিত এবং কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে পড়েন। অনেক কাণ্ড ঘটালেও কিন্তু রাক্ষসীদের শেষ পর্যন্ত প্রাণ দিতে হয় কোন না কোন রাজপুত্রের হাতে। সাধারণ মানবীর সাথে তাদের কোনো তুলনা চলে না। একেবারে শেষে তারা যখন স্বমূর্তি ধারণ করে তখন তাদের কুশ্রী রূপটা ধরা পড়ে যায় সবার কাছে, কিন্তু ঐ রানিরা বার বার কেন চিত্রিত হন রাক্ষসী হিসেবে? বহিরাগত হিসেবে?' প্রশ্ন তুলেছেন সমালোচক শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, 'এমন কি ভাবা যায় না, যারা সামাজিক বিধিনিষেধের গভীর সীমানা ছাড়িয়ে যেতে চায়, উপেক্ষা করতে চায়, বহু যুগ যাপিত নারী-পুরুষ সম্বন্ধের ন্যায় সংগতি, তারাই বহিরাগত, চিরকেলে রীতিনীতি ওল্টাতে চায় যারা তাদেরই এক অতিকৃত সংস্করণ ঐ রাক্ষসীরা?'[১০]

মা কল্যাণময়ী আবার মায়ের মধ্যে প্রকাশ পায় ভয়ঙ্করী রূপ। 'Mother archetype' ....এর শিশু যখন মায়ের গর্ভে থাকে, তার অন্ধকার, গর্ভস্থ থাকার কষ্ট তার মনে মায়ের সম্বন্ধে এক ভয়ঙ্কর রূপের জন্ম দেয়। তাই ভাল-মন্দ (রাক্ষসী) দুই মায়েরই সাক্ষাৎ রূপকথার গল্পে পাওয়া যায়।

এইসব নানা ভাবনা রূপকথার গল্পের মধ্যে প্রশ্রয় পেলেও রূপকথায় সরল সাদা ভঙ্গিতে সরাসরি কিছু কিছু সামাজিক বোধ ও নৈতিক শিক্ষার প্রসঙ্গ থাকে যা সরল শিশুমনকে স্পর্শ করে এবং অনুপ্রাণিত করে তোলে।

'সুখু দুখু' গল্পটা, সেখানে প্রথমে দুখুর কথাই বলি। দুখু সে খুব ভালো মেয়ে। সে কাউকে হিংসে করে না। সে কোনো লোভ করে না, নিঃস্বার্থ। সে সবাইকে সাহায্য করে, কর্তব্য করে এবং সে যখন ফিরে আসে চাঁদের বুড়ির কাছ থেকে, তখন কিন্তু সে এক অসম্ভব জীবনের, জয়ের পথ আবিষ্কার করে এবং অনেক কিছু পায়। আর সুখু, সে একটা স্বার্থপর, হিংসুটে, কাউকে সম্মান করতে পারে না, লোভী একটা মেয়ে। যে যখন ফিরে আসে তারপর দেখা যায় যে অজগর তাকে গিলে খেয়েছে। আসলে রূপকথার মধ্যে থাকে আশ্বাস। একটা বিশ্বাস, জীবনে যদি কিছু ভালো কাজ করা যায়, তাহলে সে পাবে সত্যিকারের কিছু। আমাদের এই বিশ্বাসের জায়গাটা তৈরি করে রূপকথা। তাই রূপকথার মধ্যে একটা বড়ো কিছু সন্ধান বা একটা দিশা পেতে পারে শিশু। তার জীবনে চলার পাথেয় হতে পারে রূপকথার শিক্ষা।

রূপকথা শিশুকে ভাবতে শেখায় যে সে একা নয়, সে একটা বড়ো কিছুর সঙ্গে সংযুক্ত, একটা বিরাট, একটা

প্রাচীনকাল, একটা আবহমানতার সাথে সে যুক্ত। একটা শিকড়ের সন্ধান দেয়, কারণ রূপকথার মধ্যে আমরা দেখছি প্রত্ন-চৈতন্যের একটা প্রতিভাস। যেটা বারবার গল্পের মধ্যে ফিরে আসে, সেটা বলা যায় আর্কিটাইপ। ইয়ুং এর মতে সুপ্রাচীন কাল থেকে বিভিন্ন দেশের সাহিত্যের ভাণ্ডারে সঞ্চিত মিথগুলি সমষ্টিগত 'মগ্ন চৈতন্যের'ই সৃষ্টি। দেশ-বিদেশের লোককথাগুলির ভিতরেও প্রায়শই অনুভব করা যায় ভাব ও রূপের সাম্য; এই সমধর্মী মিথগুলিই সব দিক দিয়ে সম্পূর্ণ আলাদা মানব শ্রেণির যাবতীয় ভিন্নতার আড়ালে এক সর্বজনীন প্রত্নচৈতন্যের আভাস নিয়ে আসে। আর্কিটাইপ অসংখ্য মিথের মধ্যে বারবার ফিরে আসে। আর্কিটাইপের মূল অর্থ 'আদিরূপ বা আদিকল্প'। এই আর্কিটাইপগুলোর মধ্যে দিয়ে একটা শিশু পরিপূর্ণভাবে নিজেকে আবিষ্কার করতে পারে, নিজেকে খুঁজে পেতে পারে।

আজকের শহরাঞ্চলগুলোতে আমরা দেখছি, বিশেষত আমাদের নিউক্লিয়ার ফ্যামেলি, একটা কি দুটো ছেলেমেয়ে, আর্থিক স্বচ্ছলতা, আমাদের সভ্যতা থেকে পিছিয়ে দিচ্ছে, আমাদের সংস্কৃতি থেকে আমাদের ছিন্ন করে দিচ্ছে, আমাদের ঠাকুমা-দিদিমা যাঁরা আমাদের মধ্যে আর নেই তাঁরা অপাংক্তেয় হয়ে গেছেন বলেই আমাদের শিশুরা এখন আর রূপকথা শুনতে পায় না।

যখন হ্যারি পটারের (জে.কে.রাউলিং-এর) এক একটা খণ্ড বেরোয়— ক্রশ-ওয়ার্ড, ল্যান্ডমার্ক, অক্সফোর্ড-এ প্রথমদিন ৮০০-৯০০ টাকা দিয়ে আমার মেয়ে বা ছেলে কিনছে। সেটা একটা স্ট্যাটাস সিম্বল হয়ে গেছে। ওটাও আজগুবি কথা, ওটাও তো ম্যাজিক ওয়ার্লড। তবে কেন আমরা মাত্র আশি টাকা দামের ঠাকুরমার ঝুলি কিনে না দিয়ে ঝোঁক করি হ্যারি পটারের? ইংরেজি মোহগ্রস্ত সমাজে সেটাই, আমাদের গর্বের জায়গা হয়ে যায়। এইভাবেই কিন্তু আমরা আমাদের সংস্কৃতি থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার গ্রাম থেকে সংগ্রহ করেছিলেন কথাগুলো। এবং আমার মনে হয় যে আজকেও গ্রামেই কিন্তু রূপকথা বা ঠাকুরমার ঝুলি অনেক বেশি করে প্রচলিত, বেশি করে চলে। এই আবহমানতার কারণ সেখানে এখনও কিন্তু ঠাকুমা-দিদিমারা ততটা অপাংক্তেয় হয়ে পড়েন নি। আমাদের এই শহরে যন্ত্র-নির্ভর পদ্ধতি, কম্পিউটার আমাদের আরও অনেক কিছু শিখিয়েছে। কিন্তু আমাদের শিশুর মনের বিকাশের, শৈশব ফিরিয়ে আনার যে মন্ত্র ঠাকুমার ঝুলি দেয় তার মতো কিছু শেখায়নি। দায়িত্ব আমাদেরও রয়েছে, প্রতিটি পরিবারেই রয়েছে। আমরা কেনই বা স্বপ্ন দেখব না যে, রাজপুত্রের মতন বাধা-বিঘ্নকারী অদম্য সাহসী, প্রচণ্ড শক্তিতে ভরপুর কোনো রাজপুত্র এসে আমাদের এই ক্লান্ত অবসাদগ্রস্ত অবক্ষয়ী সমাজে প্রাণের সঞ্চার করবে? আজকের শৈশবের পথ চলা আবার নতুন সম্ভাবনায় জেগে উঠবে।

তথ্যসূত্র—

১. ঠাকুরমার ঝুলি, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, ভূমিকা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ২০০৭. পৃ: ১২১
২. ঐ (লালকমল নীলকমল)
৩. ঐ (শীতবসন্ত)
৪. ঐ (সোনার কাঠি রূপোর কাঠি)

৫. বীরপুরুষ— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৬. রূপকথা— লিপিকা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পশ্চিমবঙ্গ (ড. সুকুমার সেন) ১৩৬৮।
৭. রূপকথা— শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, একালের সমালোচনা সঞ্চয়ন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
৮. রূপকথা— ছোটদের পাঠ বড়দের পাঠ, দিব্যজ্যোতি মজুমদার, সম্পাদনা ৬. সত্যবতী গিরি, প্রবন্ধ সঞ্চয়ন, রত্নাবলী , ২০০৬, পৃ: ১২৮
৯. রূপকথা— লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ, পল্লব সেনগুপ্ত, পুস্তক বিপণি, ২০০২ পৃ: ১৪০
১০. গোপাল রাখাল দ্বন্দ্ব সমাস - শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, কারিগর।

গল্পগুচ্ছের কয়েকটি চরিত্র : মেঘ ও রৌদ্রের মাঝখানে

উপাসনা ঘোষ,
অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর,
বাসন্তী দেবী কলেজ, কলকাতা - ২৯
upasona.deghosh@gmail.com

সারসংক্ষেপ

রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পের চরিত্রের জগতে চোখ ফেললে দেখা যাবে কিশোর বয়স্ক পাত্র পাত্রীর সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। কিশোরবয়স বা বয়ঃসন্ধিকালের চরিত্রগুলির ভাবনা-চিন্তা, সুখ-দুঃখের উন্মোচন ঘটিয়েছেন তিনি, প্রত্যেকটি চরিত্রের মনোগহনে আত্মপ্রক্ষেপ ঘটেছে লেখকের। অধিকাংশ চরিত্রের পটভূমিকায় রয়েছে এক নিদারুণ নিঃসঙ্গতা। পরিবার, সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের অবস্থান অনুসন্ধানের এক নিবিড় কাহিনি হয়ে ওঠে এক একটি গল্প। অনেকের মাঝখানে থেকেও নিজেকে খোঁজার এক অবিরাম প্রচেষ্টা যেন সমার্থক হয়ে ওঠে চরিত্রগুলির সঙ্গে।

আধুনিক সাহিত্য সমালোচনায় বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ, বিভিন্ন স্তরের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট গান, কবিতা, গল্প এবং উপন্যাসের আঙ্গিক - চরিত্র - ভাষা বিচার বিশ্লেষণ করা হচ্ছে দীর্ঘদিন। বিশেষত মনস্তত্ব-বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্দ্রসৃষ্ট চরিত্রের বিচার বিশ্লেষণ আধুনিক পাঠকের কাছে আজ আগ্রহের বিষয়। মনোবিজ্ঞানী এরিকসনের তত্ত্বের আলোকে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট কিশোরবয়স্ক চরিত্রগুলির মনোগহনে, তাদের আচার-আচরণে আলো ফেলে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে বর্তমান প্রবন্ধে। আধুনিক মনস্তত্বের জটিল ব্যাখ্যা যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে এক একটি চরিত্রের মধ্য দিয়ে। বিশেষ বয়সের হাসি-কান্না, বিশেষ চাওয়া, বিশেষ আত্ম-পরিচিতি গড়ে নেবার চেষ্টার জন্য পাঠকের কাছে চিরকালীন হয়ে আছে রতন, ফটিক, মৃণ্ময়ী চরিত্রগুলি। জীবনের আলো-আঁধারির মধ্যে থাকা কিশোরবয়স্ক চরিত্রগুলিকে নতুন করে দেখার চেষ্টা করা হলো।

সূচক শব্দ : কিশোর মনস্তত্ত্ব, রবীন্দ্র ছোটোগল্পের কিশোর চরিত্র

শেক্সপিয়ের ''অ্যাজ ইউ লাইক ইট'' নাটকে জাক (Jaques)-এর সংলাপে মানবজীবনের সাতটি স্তর বা পর্যায়ের (Seven Ages of Man) উল্লেখ করেছেন। অপরদিকে মনস্তত্ত্ববিদ এরিক এইচ এরিকসন মানবজীবনের আটটি পর্যায়ের নির্দেশ করেছেন। প্রত্যেক ব্যক্তির একটি মাত্র নির্দিষ্ট জীবনের জীবৎকালে প্রায় স্পষ্ট কতগুলি পর্যায় আছে — শৈশব, কৈশোর বা বয়ঃসন্ধিকাল, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব এবং বার্ধক্য। নির্দিষ্ট বছরে যে পর্যায়গুলি শুরু না হলেও শারীরিক, মানসিক বিকাশ এবং সক্ষমতার নিরিখে প্রতিটি পর্যায় সম্পূর্ণ পৃথক। মনস্তত্ব-বিজ্ঞানের বিচার অনুযায়ী এরিকসন মানবজীবনের যে বিভাজন করেছেন, তার মধ্যে পঞ্চম হলো বয়ঃসন্ধিকাল।[১] মোটামুটি ভাবে মানুষের জীবনের এগারো-বারো বছর বয়স থেকে

আঠেরো-কুড়ি পর্যন্ত এর ব্যাপ্তি। কেউ কেউ শুরুর বয়সটিকে পিছিয়ে তেরো বছরে নিয়ে গিয়েছেন।[২] বয়ঃসন্ধিকালের সর্বাপেক্ষা বড় বৈশিষ্ট্য এটি মানবজীবনের একটি সংক্রান্তি-পর্যায় (transitional period)।[৩] শৈশব ও যৌবনের মধ্যবর্তী সেতু, কিংবা বলা যায়, মানবজীবনে শৈশব থেকে পরবর্তী পর্যায়ের এটি একটি স্পষ্ট বিভাজন রেখা তৈরি করে যা, কারুর এক জীবনেই আর এক জন্মের সৃষ্টি করে। শুরু হয় এক বিরাট পরিবর্তন, শরীরে এবং মনে।

শারীরিক পরিবর্তন, বিবর্তন এবং ধীরে ধীরে তার বিকাশ যেমন ঘটে, মানসিক দিক থেকেও ইন্দ্রিয়জ কামনা-বাসনার বিরাট আধিপত্য অনুভব করা যায়।[৪] একদিকে নিজস্ব লিঙ্গ-পরিচিতি সম্পর্কে সচেতনতা, অপরদিকে বিপরীত সেক্সের প্রতি আকর্ষণ-বোধ এই সময়ের এক স্বাভাবিক প্রবণতা। অভূতপূর্ব শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের জন্যই এটি আত্মপরিচয় অনুসন্ধানের কালও বটে। শুধু পরিবার নয়, সামাজিক অবস্থানটিও বুঝে নেবার সময় এই বয়ঃসন্ধি। পরিবার সমাজ প্রভৃতির সঙ্গে মতাদর্শের সংঘাত শুধু নয় নিজের মধ্যেই ক্রমাগত দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। "The crisis between identity and identity confusion reaches its ascendence during this stage. From this crisis of identity versus identity confusion emerges fidelity, the basic strength of adolescence.[৫] বস্তুত এই সময়ের আত্মানুসন্ধান বা আত্মজিজ্ঞাসা, নিজেকে নিয়ে সচেতনতা ক্রমশ ব্যক্তির নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি, ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলে। "They (adolescent) seek to establish a clear self-identity to understand their own unique traits and what's really of central importance to them."[৬] বয়ঃসন্ধির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মনস্তত্ত্ববিদেরা আলোচনা করেছেন, সাহিত্যেও তার প্রকাশ প্রচুর। সাহিত্য চিরকালই মানবজীবন অনুগামী। মানবমনের গহীন প্রদেশ তার অন্যতম উপজীব্য। সাহিত্যের সঙ্গে মনস্তত্ত্ববিদ্যার সম্পর্ক আজ ঘনিষ্ঠ। মনস্তত্ত্বের বিভিন্ন তত্ত্বের আলোকে আজ সাহিত্য আলোচনা শুরু হয়েছে দেশে বিদেশে।

রবীন্দ্রনাথের গান কবিতা কথাসাহিত্যে মানবমন ও জীবনের বিভিন্ন সাধারণ আবার একই সঙ্গে জটিল অনুভব-উপলব্ধির পরিচয় মেলে। এবং তার সূত্রপাত তাঁর রচনার সূচনা পর্ব থেকেই। হিতবাদী, সাধনা-ভারতী পর্বে, রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু ছোটোগল্পে তাঁর শৈশব কৈশোরের স্মৃতি-অনুভব-অভিজ্ঞতার নিদর্শন পাওয়া যায়। এই গল্পগুলি যেমন সরাসরি তাঁর বয়ঃসন্ধিকালের ভাবনা-অনুভূতি প্রকাশ করেছে, আবার দ্যোতিত হয়েছে সেই অনুভূতিগুলিকে নির্বিশেষ মানবজীবনে স্থিত করে দেখার চেষ্টা। 'গিন্নি' গল্পের আশুর যে অপমান এবং 'ছুটি' গল্পের ফটিকের স্কুলের গণ্ডিবাঁধা পরিবেশ সম্পর্কে যে বিতৃষ্ণা, সে যে রবীন্দ্রনাথের শৈশব-কৈশোরের তিক্ত স্মৃতিরই প্রতিফলন, 'জীবনস্মৃতি'র পাঠকমাত্রেই জানেন। এই গল্পগুলিতে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের স্মৃতি আছে, আছে নির্বিশেষ কিশোরের অপমানবোধ, বেদনানুভব। আবার কিছু গল্পের মূল ভিত্তিভূমিই গড়ে দিয়েছে কৈশোরের বেদনাবিধুর স্মৃতি। যেমন 'একরাত্রি' গল্প। সুরবালা এবং গল্প-কথকের কৈশোরের বিভিন্ন স্মৃতি তাদের রূপ-রস-গন্ধ নিয়ে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো গল্প-কথকের না-পাওয়ার ভারাক্রান্ত দিনগুলিকে। সেই বেদনা যেন ঝরে পড়েছিলো ঘন-ঘোর বর্ষা হয়ে। বর্ষা-প্লাবিত রাতে ক্ষণিকের প্রাপ্তি যে গল্প-কথকের ''তুচ্ছ জীবনের একমাত্র চরম সার্থকতা'' হয়ে উঠতে পেরেছিলো তার সম্ভাবনার বীজ নিহিত ছিলো ঐ কৈশোরক স্মৃতিতে। আবার 'নিশীথে' গল্পের

দক্ষিণাচরণের অপরাধবোধের গভীরে আছে প্রথমা স্ত্রীর সঙ্গে অল্পবয়সের স্মৃতি। গল্পগুচ্ছের চরিত্রগুলির অনেকের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের অনুভব আরোপিত হলেও, এই পর্বের ছোটগল্পের বয়ঃসন্ধিকালের উল্লেখ্য চরিত্রগুলি কেউই জোড়াসাঁকোর এলিট পরিবারের মতো পরিবার থেকে উঠে আসে নি। অর্থাৎ পারিবারিক সামাজিক আর্থিক পার্থক্যের জন্য জীবনের মৌল অনুভবের তারতম্য ঘটে না—এই সত্যটি রবীন্দ্রনাথের সমর্থন পেয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ যখন গল্প লেখা শুরু করেন, বাংলা গল্প-উপন্যাসে নায়িকাদের বয়স খুব বেশি হলেও সতেরো-আঠেরো; সাধারণত এর বেশি পরিকল্পনা করা হতো না। ধীরে ধীরে তাদের বয়োপ্রাপ্তি ঘটেছে সাহিত্যে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের গল্পে বারো-তেরো বা চোদ্দো-পনেরোর কিশোরীর সংখ্যাই বেশি। অবশ্য সংখ্যায় কম হলেও কিশোরও কম নয়। যদিও রবীন্দ্রনাথ প্রায় সর্বত্রই এদের বালক-বালিকা বলেই উল্লেখ করেছেন। 'পোস্টমাস্টার' গল্পের রতন, 'ছুটি' গল্পের ফটিক, 'সমাপ্তি' গল্পের মৃণ্ময়ী, 'অতিথি' গল্পের চারুশশী এবং তারাপদ, 'আপদ' গল্পের নীলকান্ত প্রভৃতি চরিত্রগুলিতে বয়ঃসন্ধির লক্ষণ-বৈশিষ্ট্য যতোখানি সুপরিস্ফুট বা বেশি জায়গা পেয়েছে অন্যান্য চরিত্রে হয়তো ততো নয়; তবু আমাদের মনে পড়বে 'মধ্যবর্তিনী' গল্পের শৈলবালা, 'খাতা' গল্পের উমা, 'হৈমন্তী' গল্পে হৈমন্তীকে। এছাড়া উল্লেখ্য 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পের গিরিবালা, 'মানভঞ্জন' গল্পের গিরিবালা; এবং গল্পগুচ্ছের তৃতীয় খণ্ডের কয়েকটি চরিত্র— 'বেণুগোপাল' (মাস্টারমশায়), 'কালীপদ' (রাসমণির ছেলে), 'কল্যাণী' (অপরিচিতা), 'রসিক' (পণরক্ষা), 'সুবোধ' (ভাইফোঁটা), 'সনৎ' (পাত্র ও পাত্রী,) এবং 'বলাই' (বলাই)-কে।

২

বয়ঃসন্ধিকাল চায় চারপাশের মানুষের মনোযোগ, স্বীকৃতি; বিশেষত প্রিয়জনের। 'দেনাপাওনা' গল্পের নিরুপমার স্বল্পকালীন জীবনে কোনো প্রিয়জনের আশ্রয় জোটে নি। নিরুপমা যখন অপমানে, অভিমানে ধীরে ধীরে আত্মহননের পথ বেছে নেয়, শ্বশুরবাড়ির অবজ্ঞা, খারাপ ব্যবহার শুধু নয়, বয়ঃসন্ধির তীব্র আত্মর্যাদাবোধ, স্বীকৃতির অভাব তাকে চালিত করেছিলো। আমাদের মনে পড়বে, পরে লেখা 'হৈমন্তী' গল্পের হৈমন্তীকে। শাশুড়ির শেখানো মিথ্যে কথা সে বলতে চায় নি। সতেরো বছর বয়স কমিয়ে নিজেকে নীচে নামাতে তার অনীহা দেখা দিয়েছিলো। তার সততা, আত্মমর্যাদাবোধ ছিল তার আশ্রয়। তার ক্ষেত্রেও দেখা যায়, ধীরে ধীরে মৃত্যুকে ডেকে নিয়েছিলো সে এক কঠিন অভিমানে। 'মানভঞ্জন' গল্পের গিরিবালার পরিণতি একটু অন্যরকম। কৈশোর-তারুণ্যে স্বামীর দীর্ঘ অনাদরের প্রতিশোধ নিয়েছে, থিয়েটারের আলোকবৃত্তে নিজেকে হারিয়ে দিয়ে। মনস্তত্ত্ববিদ এলিজাবেথ বি. হারলক এই জন্যই বয়ঃসন্ধিকালকে এক ভয়ানক সময় (a dreaded age)[৭] বলে উল্লেখ করেছেন; যখন ধ্বংসাত্মক সিদ্ধান্ত অনায়াসেই নেওয়া যায়।।

বয়ঃসন্ধিকাল এক সমস্যাসঙ্কুল সময়, যখন নিজের অস্তিত্বের সংকট তীব্র হয়ে ওঠে, চাহিদা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠে না। ফলে অন্যান্যদের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের সংঘাত প্রায়শই অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। 'মধ্যবর্তিনী' গল্পের শৈলবালা তার স্বামীগৃহের যাবতীয় মনোযোগের একমাত্র কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিলো। স্বামী এবং সতীনের কাছ থেকে অত্যধিক প্রশ্রয় পেয়ে পেয়ে তার জগৎ ছিল আত্মকেন্দ্রিক। সীমাছাড়া ছিল তার অসহিষ্ণুতা।

দিনে দিনে সে এক অবাস্তব পৃথিবী মনের মধ্যে গড়ে নিয়েছিলো। যখন সে ধরে নিল সবার সমস্ত স্নেহ যত্ন একমাত্র তার জন্যই কিন্তু কারুর জন্যই কোনোরকম ত্যাগস্বীকার তাকে করতে হবে না। তার স্বার্থে সামান্যতম বাধা দিলেই সে হিংস্র হয়ে উঠতো। তার আচরণের গভীরতর কারণ বোঝার ক্ষমতা তার স্বামী নিতান্ত এক সাধারণ মানুষ নিবারণের ছিলো না।

'অতিথি' গল্পের চারুশশী চরিত্রটিকে তারাপদর মনে হয়েছিলো একটি প্রহেলিকা। তার দুরন্ত জেদ, অন্যায় আবদার, সবার ওপরে কর্তৃত্ব করার প্রবণতা, স্বাধীনতাবোধের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে বয়ঃসন্ধির বিশেষ বৈশিষ্ট্য— "A strong desire for independence develops in early adolescene and reaches a peak as this period draws to a close. This leads to many clashes with parents and other adults in authority."[৮] সমাপ্তি গল্পের মৃণ্ময়ীর জীবনের প্রথমাংশেও এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যাবে। চারুশশী এবং মৃণ্ময়ী—দুজনের জীবনেই প্রিয় মানুষের সংস্পর্শে এসেছে নারীহৃদয়ের পূর্ণতা। যদিও চারুশশীর নয় থেকে এগারো বছর বয়সের কাহিনিই গল্পে জানা গেছে। লেখক তার সম্পর্কে জানিয়েছেন—''বালিকাবস্থাতেও নারীদের অন্তররহস্য ভেদ করা সুকঠিন, চারুশশী তাহার প্রমাণ দিল"। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র তারাপদর প্রতি তার বিরাগ ক্রমশ অনুরাগে পরিণত হয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলো তার অধিকারবোধ। প্রথমাবস্থাতে তারাপদর প্রতি তার বাবা-মায়ের স্নেহ চারুশশী সহ্য করে নি। তারাপদর কোনো রকম গুণের স্বীকৃতি তার কাছে ছিলো না। ''কেবল তারাপদ মধ্যাহ্নে যখন নদীতে স্নান করিতে নামিত, পরিপূর্ণ জলরাশির মধ্যে গৌরবর্ণ সরল তনুদেহখানি নানা সন্তরণভঙ্গিতে অবলীলাক্রমে সঞ্চালন করিয়া তরুণ জলদেবতার মতো শোভা পাইত, তখন বালিকার কৌতূহল আকৃষ্ট না হইয়া থাকিত না; সে সেই সময়টির জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত।" 'অত্যন্ত উপেক্ষাভরে কটাক্ষে' এই স্নানদৃশ্য দেখার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে, নবীন কিশোরের পুরুষত্বের প্রতি কিশোরী চারুশশীর আকর্ষণ, ইন্দ্রিয়জ কামনা।

অপরদিকে তারাপদ নিস্পৃহ, অনাসক্ত ছিল বলে সবার সঙ্গেই সমান নৈকট্যে মিশতে পারতো; সমান দূরত্বে স্থিত থাকতে পারতো; ''কোথাও তাহার প্রকৃত কোনো বন্ধন ছিল না বলিয়াই এই বালক আশ্চর্য সত্বর ও সহজে সকলেরই সহিত পরিচয় করিয়া লইতে পারিত।" বন্ধন-অনুভূতিহীন এই কিশোরটিরও দুবছর সময়ের মধ্যে অনেক পরিবর্তন হলো। জমিদার মতিলালবাবুর লাইব্রেরির ইংরেজি ছবির বই তাকে আকর্ষণ করতো। ছবির জগৎ তার মনে নতুন এক কল্পলোকের উদ্বোধন ঘটালো। তার অলক্ষিতে তার মধ্যে ঘটেছে নতুন এক তারাপদর নির্মাণ। এর সঙ্গে ছিল চারুশশীর সতেজ সংস্পর্শ। চারুশশী তারাপদর পড়ার ঘরে ঢুকে ''কখনও রাগ, কখনও অনুরাগ, কখনও বিরাগের দ্বারা তাহার পাঠচর্যার নিভৃত শান্তি অকস্মাৎ তরঙ্গিত করিয়া তুলিত।" চঞ্চল প্রাণের দীপ্ত স্পর্শে ''এই নির্লিপ্ত মুক্তস্বভাব ব্রাহ্মণবালকের চিত্তে মাঝে মাঝে ক্ষণকালের জন্য বিদ্যুৎস্পন্দনের ন্যায় এক অপূর্ব চাঞ্চল্য-সঞ্চার হইত।" মাঝে মাঝেই তারাপদ ''দিবাস্বপ্ন জালের মধ্যে জড়ীভূত হইয়া পড়ে।" এবং, ''নিজের এই গূঢ় পরিবর্তন, এই আবদ্ধ আসক্ত ভাব নিজের কাছে এক নূতন স্বপ্নের মতো মনে হইতে লাগিল।" যদিও অচিরেই অচেনা স্বপ্নের জাল ছিঁড়ে ''এই ব্রাহ্মণবালক আসক্তিবিহীন উদাসীন জননী বিশ্বপৃথিবীর" কাছে চলে যায়। চরিত্রটিতে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রক্ষেপণ অত্যধিক। তারাপদ

যেন কিশোর রবীন্দ্রনাথের 'ইচ্ছে হয়ে ছিলি মনের মাঝারে'। তারাপদ একাদিক্রমে পাঁচালি, জিমন্যাস্টিক্ প্রভৃতি দলে অনায়াসে ভিড়ে গিয়েছিল। পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুচর কিশোরী চাটুর্জের পাঁচালি দলের ক্রমাগত প্রশংসায় প্রলুব্ধ রবীন্দ্রনাথের উক্তিটি উল্লেখযোগ্য— ''পাঁচালির দলে ভিড়িয়া দেশদেশান্তরে গান গাহিয়া বেড়ানোটা মহা একটা সৌভাগ্য বলিয়া বোধ হইত।" ('প্রত্যাবর্তন'/জীবনস্মৃতি)। এই চরিত্রটির মধ্যে দিয়ে সর্বজনীন মানব-প্রেমের বন্ধন-বৃত্ত গড়ে তোলা এবং আবার ছিঁড়ে ফেলার প্রবণতাটিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা রবীন্দ্রনাথ নিজের মধ্যে অনুভব করেছেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে স্বীকার করতে হয়, তারাপদ অপরাপর কিশোরের তুলনায় স্বতন্ত্র। চারুশশীর মধ্যে যে রাসায়নিক পরিবর্তন হয়েছিলো, তারাপদর মধ্যে তা ক্ষণিকের মোহজাল সৃষ্টি করলেও তার চরিত্রগত ব্যাপক কোনো পরিবর্তন ঘটে নি। স্বীকার করতেই হয়, পৃথিবী-জননীর সন্তান হিসেবে সৃষ্ট হওয়ার জন্য চরিত্রটির নির্মাণে কিছু উদ্দেশ্যমূলকতা কাজ করেছে।

৩

কৈশোরক অনুভূতি চায় স্বীকৃতি—একথা আগেই বলা হয়েছে। পোস্টমাস্টার গল্পের বারো-তেরো বছরের অনাথ কিশোরী রতনের ছিল আত্মজন-সংকট সমস্যা। এই বিরাট পৃথিবীতে নিঃসহায় মেয়েটি, উলাপুর গ্রামের পোস্টমাস্টার—তার দাদাবাবুকে কেন্দ্র করে শ্রেণিবোধহীন অসম্ভব এক নির্ভরতার সম্পর্কের আবেগে আচ্ছন্ন হয়েছিলো। একসময় তাকে সম্পূর্ণ নির্বান্ধব করে পোস্টমাস্টার যখন নিজের বাড়ির উদ্দেশে কলকাতা রওনা দিলেন, সামাজিকভাবে যে শূন্যতায় রতন নিমজ্জিত হয়েছিল, সে বিষয় থেকে গল্পের পরিসমাপ্তিতে প্রাধান্য পেয়েছে 'পৃথিবীতে কে কাহার'—এই তত্ত্বের দার্শনিকতা। কিভাবে তার পরবর্তী দীর্ঘ জীবন অতিবাহিত হবে তার কোনও হদিস আমরা পাই না। তার একাকীত্ব, তার নৈঃশব্দ্যের মধ্যে তাকে নিক্ষিপ্ত করেন লেখক। পোস্টমাস্টার যাবার সময় তাকে কিছু অর্থ সাহায্য করতে চাইলে রতন পোস্টমাস্টারের দু-পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে বলে—''আমার জন্যে কাউকে কিছু ভাবতে হবে না।" 'আমার' এবং 'কাউকে' শব্দ দুটি এখানে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। 'আমার' শব্দটিতে কিশোরীর জাগ্রত আত্মসচেতনতা প্রতিমূর্ত হয়েছে; প্রতিহত বেদনার প্রকাশ ঘটেছে। 'কাউকে' শব্দটি ইঙ্গিত করে, যাকে বিশ্বাস করা গিয়েছিলো, সহজ মনে হয়েছিলো—সেই মানুষ এখন তার কাছে তৃতীয় ব্যক্তিতে রূপান্তরিত।

পোস্টমাস্টারকে কেন্দ্র করে রতনের ভাবনা-উপলব্ধিতে বিবর্তনের একটি রেখা চোখে পড়ে। গল্পের প্রথম দিকে, পোস্টমাস্টার যখন তার স্বল্প-পরিচিত, তার আত্মসচেতনতার পরিচয় একরকম। ''ঘরের কোণে একটি ক্ষীণশিখা প্রদীপ জ্বালিয়া পোস্টমাস্টার ডাকিতেন—'রতন'। রতন দ্বারে বসিয়া এই ডাকের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিত কিন্তু এক ডাকেই ঘরে আসিত না।" রবীন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছে, এই ব্যবহার শৈশবের সরল একমুখী ব্যবহার নয়; কৈশোরের উদ্ভিন্ন আত্মসচেতনতার জন্য একদিকে দ্বিধা আবার একই সঙ্গে আকর্ষণ-অনুভব জনিত রতনের এই আচরণ। এক বছরের মধ্যেই তার মধ্যে পরিবর্তন সূচিত হতে থাকে। পোস্টমাস্টারের বাড়ির গল্প শুনে শুনে তাঁর পরিবারের মধ্যে রতন কল্পনায় নিজেকে স্থিত করে নেয়। পোস্টমাস্টারের মা-ভাই-দিদির সঙ্গে সে নিজেও যেন একজন পারিবারিক সদস্য হয়ে উঠেছিলো। কৈশোরের নবীন বিশ্বাসে, নির্ভরতায় বিশেষ কোনো ব্যক্তি প্রিয়জন হয়ে ওঠে, যাকে অবলম্বন করে মনের

কোমল অনুভূতিগুলি স্ফটিকঘন রূপ ধরতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের জীবনে জ্যোতিদাদা এবং কাদম্বরী বৌঠানের যে ভূমিকা দেখা যায় রতনের মনোগহনে এমনই মূর্তি (attachment figure) গড়ে উঠেছিলো পোস্টমাস্টারকে কেন্দ্র করে।[৯]

কিন্তু কৈশোরের স্বপ্ন-আশা-কল্পনার জগৎ যে নিটোল থাকে না, স্বপ্ন মানেই স্বপ্নভঙ্গ—রতনের কল্পনার জগতের আবহ ভেঙে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ সেই অমোঘ সত্যটিকে নির্দেশিত করেন। এভাবেই অনুভব-বিবর্তনের পথ ধরে কিশোরী রতন এগিয়ে চলে। রতনের জীবনের এক বিশেষ সন্ধিক্ষণে পোস্টমাস্টার বিশেষ খবর নিয়ে এসেছিলেন; যখন বালিকা আর বালিকা থাকে না।[১০] বিশেষ করে পোস্টমাস্টারের অসুস্থতায় সেবা, তার ভিতরের নারীকে জাগিয়ে তুলেছিলো। পোস্টমাস্টারের প্রতীকে রতনের জীবনে শুরু হয়েছিল বয়ঃসন্ধিকালের আয়নায় আত্মানুভব, আত্মপরিচয় সন্ধান এবং নিঃসঙ্গতাবোধের উপলব্ধি।

পোস্টমাস্টার গল্প রতনের সামাজিক অবস্থান উপলব্ধিরও গল্প। অক্ষর-পরিচয়হীন রতন পোস্টমাস্টারের দাক্ষিণ্যে বাংলা যুক্তাক্ষর পড়তে শিখেছিলো। 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পে শশিভূষণের কাছে গিরিবালা যে বিদ্যাশিক্ষা অর্জন করেছিল, তাতে তার মানসজগতের ব্যাপ্তি ঘটেছিলো। রতনের সেই ধরনের মানস-বিস্তৃতি না ঘটলেও, সেও তার পরিচিত জগতের বাইরে অন্য একটি জগতের স্বাদ পাচ্ছিলো ঐ সামান্য বিদ্যার মাধ্যমেই। হয়তো নিজের কাছেই নিজের গুরুত্ব বেড়েছিলো। কিন্তু রতন যখন পোস্টমাস্টারকে অনুরোধ করে তাঁর বাড়িতে তাকেও নিয়ে যেতে এবং স্বাভাবিক ভাবেই পোস্টমাস্টার উত্তর দেন—''সে কি করে হবে''—সে মুহূর্তটি রতনের জীবনের এক চরম ক্ষণ। সে উপলব্ধি করে তার দাদাবাবুর সঙ্গে এতদিনের সহজ গল্প, দৈনন্দিনতা—সবই দাদাবাবুর সময় কাটানোর উপকরণ মাত্র। সে মুহূর্তেই তার অবস্থান সমস্ত পৃথিবীর কাছে শুধু নয়, তার নিজের কাছেও স্পষ্ট হয়ে যায়।

৪

ছিন্নপত্রাবলীর ২৪ সংখ্যক চিঠিতে আছে 'ছুটি' গল্পের খনিজ সূত্র, যেখানে তিনি জানিয়েছেন কাঠের গুঁড়ি নিয়ে অল্পবয়সী ছেলে মেয়েদের খেলার কথা। তাদের খেলার আনন্দের ছবি নিয়ে ছুটি গল্পটি শুরু। অনেকেই এই গল্পে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাবিষয়ক ভাবনাচিন্তার প্রকাশ খুঁজে পেয়েছেন। তার গভীরে আছে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের স্মৃতি। নর্মাল স্কুলের ভয়াবহ স্মৃতি যেমন আছে, আছে বয়ঃসন্ধিকালের একাকীত্বের যন্ত্রণা, নারীর কাছ থেকে স্নেহ পাবার দুর্মর বাসনা।

উদার আকাশ, খোলা মাঠ নদী-ঘেরা গ্রামের ছেলে ফটিক ভেবেছিলো কলকাতায় সে তার স্বপ্নের জগৎ খুঁজে পাবে। তার মামা তাকে কলকাতা যাবার প্রস্তাব করতেই সে সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে যায়। কলকাতায় আসার পরই শুরু হয় তার আশাভঙ্গের কাহিনি। একদিকে স্কুলের প্রাণহীন পরিবেশ, অপরদিকে মামী এবং মামাতো ভাইদের শুষ্ক কঠিন ব্যবহার। তার সামাজিক অবস্থানের উন্মোচন ঘটলো কলকাতায় এসে। জীবনস্মৃতির 'প্রত্যাবর্তন' শীর্ষক রচনায় রবীন্দ্রনাথ কৈশোরে কোনো কিশোরের নারীর স্নেহপ্রাপ্তি সম্পর্কে লিখেছেন—''যখনকার যেটি সহজপ্রাপ্য তখন সেটি না জুটিলে মানুষ কাঙাল হইয়া দাঁড়ায়।'' ফটিকের সেই অবস্থা

হলো। মাকে ছেড়ে এসে মামীর অনাত্তরিক ব্যবহারে তার অন্তরাত্মা আশ্রয়হীন হলো। ফটিকের মধ্যে লেখক দেখিয়েছেন স্নেহ না-পাবার যন্ত্রণা। ফটিকের শারীরিক বর্ণনার মধ্যে মা-হারা চোদ্দ বছরের রবীন্দ্রনাথ যেন নিজেকে খুঁজে পেয়েছেন। তিনি বলছেন—''বিশেষত তেরো-চৌদ্দ বৎসরের ছেলের মতো পৃথিবীতে এমন বালাই আর নাই। শোভাও নাই, কোনো কাজেও লাগে না। স্নেহও উদ্রেক করে না, তাহার সঙ্গসুখও বিশেষ প্রার্থনীয় নহে। তাহার মুখে আধো আধো কথাও ন্যাকামি, পাকা কথাও জ্যাঠামি এবং কথামাত্রই প্রগলভতা। হঠাৎ কাপড়চোপড়ের পরিমাণ রক্ষা না করিয়া বেমানানরূপে বাড়িয়া উঠে; লোকে সেটা তাহার একটু কুশ্রী স্পর্ধাস্বরূপ জ্ঞান করে। তাহার শৈশবের লালিত্য এবং কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা সহসা চলিয়া যায়।'' বয়ঃসন্ধিকালের কিশোরের এমন নিখুঁত বর্ণনা বাংলাসাহিত্যে বিরল। অবহেলিত কিশোর নিজেকে কিভাবে পর্যালোচনা করে সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—''সেও সর্বদা মনে মনে বুঝিতে পারে, পৃথিবীর কোথাও সে ঠিক খাপ খাইতেছে না; এইজন্য আপনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সর্বদা লজ্জিত ও ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া থাকে। অথচ এই বয়সেই স্নেহের জন্য কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত কাতরতা জন্মায়।.....অতএব এমন অবস্থায় মাতৃভবন ছাড়া আর কোনো অপরিচিত স্থান বালকের পক্ষে নরক। চারিদিকের স্নেহশূন্য বিরাগ তাহাকে পদে পদে কাঁটার মতো বিঁধে। এই বয়সে সাধারণত নারীজাতিকে কোনো এক স্বর্গলোকের দুর্লভ জীব বলিয়া মনে ধারণা হইতে আরম্ভ হয়, অতএব তাঁহাদের নিকট হইতে উপেক্ষা অত্যন্ত দুঃসহবোধ হয়।'' ফটিকের আচরণে একদিকে যেমন নিজ ব্যক্তিসত্তার পরিচিতি (Igo Identity) সন্ধান দেখা গেছে, দেখা গেছে সামাজিক ক্ষেত্রে তার ভূমিকা বা পরিচয় সম্পর্কে বিভ্রান্তি (Role Confusion)।[১১] তেমনই দেখা গেছে বিপরীত লিঙ্গ-পরিচিতির মানুষের কাছ থেকে বিশেষ স্নেহ পাবার আকাঙ্ক্ষা। যা রতনের কাহিনিতেও দেখা গেছে পোস্টমাস্টারকে কেন্দ্র করে।

ফটিকের জীবনের করুণ অসহায় পরিণতির জন্য কলকাতা, তার স্কুল বা মামাবাড়ির কঠিন অনাদরের পরিবেশের যেমন দায় রয়েছে, তার থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে তার কৈশোরক অনুভূতির, অভিমানের। জীবনের যে পর্যায়ে এলে সব অনাদর অগ্রাহ্য করা যয়, অস্বীকার করা যায়; সে পর্যায়ে উন্নীত হবার আগেই ফটিকের জীবন-কাহিনি শেষ হয়ে গেছে। শৈশবে যেমন দুঃখ গাঢ় হয় না, যৌবনের প্রাণশক্তিও পারে গভীরতর বেদনাকে অতিক্রম করতে। কিন্তু যখন মানুষের কোমল অনুভূতিগুলি গাঢ় হতে থাকে অথচ ভাবনাশক্তি অপরিণত থাকে, জীবনের সে পর্যায়ে আঘাত সহ্য করার মনের জোর অনেক কিশোর কিশোরীরই থাকে না। রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু ছোটোগল্পে আছে নবীন প্রাণ ঝরে যাবার কাহিনি। হয়তো পারিবারিক ক্ষেত্রে কিছু মৃত্যুর স্মৃতি, সেগুলিকে কেন্দ্র করে ব্যক্তিগত উপলব্ধি এই চরিত্রগুলির পরিণতি-নির্মাণে কাজ করেছে। বিশেষত কিশোর-চরিত্রগুলির তীব্র অভিমানে হয়তো খুব-নিকট কারুর ছায়াপাত ঘটেছে।

৫

আপদ গল্পের কিশোর নীলকান্তেরও ছিল ফটিকের মতোই 'স্নেহের জন্য কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত কাতরতা'। পিতৃমাতৃহীন নীলকান্ত এক আকস্মিক ঘটনার অভিঘাতে অভিজাত পরিবারের বধূ কিরণময়ীর কাছে আশ্রয় পায়। তার এই সময়ের চেহারার বর্ণনা দিয়েছেন লেখক—''ছেলেটির লম্বা চুল, বড়ো বড়ো চোখ, গোঁফের রেখা এখনও উঠে নাই।'' 'যাত্রার দলের ছোকরাটি' সম্পর্কে আরও জানিয়েছেন তিনি—''নীলকান্তের ঠিক

কত বয়স নির্ণয় করিয়া বলা কঠিন; যদি চৌদ্দ-পনেরো হয় তবে বয়সের তুলনায় মুখ অনেক পাকিয়াছে বলিতে হইবে, যদি সতেরো-আঠারো হয় তবে বয়সের অনুরূপ পাক ধরে নাই। হয় সে অকাল-পক্ক, নয় সে অকাল-অপক্ক।" ধীরে ধীরে নিজের মধ্যে সে অন্যতর এক অস্তিত্ব অনুভব করতে লাগলো। তার পরিবর্তনের লক্ষণ হিসেব লেখক জানাচ্ছেন, আগে যে গান সে অভ্যাস-অনুসারে গাইত, ক্রমশ ''সেই গানের সুরগুলো তাহার মনে এক অপূর্ব চাঞ্চল্য সঞ্চার করে।" ফলে ''সে যেন সহসা লোকান্তরে জন্মান্তরে উপনীত হইত; তখন চারিদিকের অভ্যস্ত জগতটা এবং তাহার তুচ্ছ জীবনটা গানে তর্জমা হইয়া একটা নূতন চেহারা ধারণ করিত।" শুরু হচ্ছে তার মনোগহনে নতুন জগতের উদ্ভাসন। যদিও অতীত - নীলকান্ত একেবারে হারিয়ে যায় নি; তা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ অচেনা এক জগতের উপলব্ধিতে সে বিহ্বল হয়ে পড়লো। সেই নতুন জগতে কিরণময়ীর ছিল অপ্রতিরোধ্য ভূমিকা—''গানের সুরের মধ্যে এই যাত্রার দলের ছেলেটি আপনাকে এবং আপনার জগতটিকে একটি নবীন আকারে সৃজন করিয়া তুলিত—জলের ধ্বনি, পাতার শব্দ, পাখির ডাক, এবং যে লক্ষ্মী এই লক্ষ্মীছাড়াকে আশ্রয় দিয়াছেন তাঁহার সহাস্য স্নেহ - মুখচ্ছবি, তাঁহার কল্যাণমণ্ডিত বলয়বেষ্টিত বাহুদুইখানি এবং দুর্লভসুন্দর পুষ্পদলকোমল রক্তিম চরণযুগল কী-এক মায়ামন্ত্রবলে রাগিণীর মধ্যে রূপান্তরিত হইয়া যাইত।" এক কিশোরের কল্পনার রঙিন অথচ সত্য ভুবন যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে। এখানেও আমরা দেখছি, নারী স্বর্গলোকের দূতী হয়ে উঠেছে এক কিশোরের ধ্যানলোকে। আমাদের মনে পড়বে, তেরো-চোদ্দ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথের লেখা মালতী-পুঁথির প্রথম সর্গের কয়েকটি পংক্তি—

অনন্ত প্রণয়ময়ী রমণী তোমরা
পৃথিবীর মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।
তোমাদের স্নেহধারা যদি না বর্ষিত
হৃদয় হইত তবে মরুভূমি সম
স্নেহদয়া প্রেমভক্তি যাইত শুকায়ে।
তোমরাই পৃথিবীর সংগীত, কবিতা।।

গল্পটি রচনার (ফাল্গুন ১৩০১) কিছু আগে লেখা 'সোনার তরী' কাব্যের 'অচলস্মৃতি' কবিতার কয়েকটি পংক্তিও এখানে উল্লেখ্য—

যেখানে চরণ রেখেছে সে মোর
মর্ম গভীরতম —
উন্নতশির রয়েছে তুলিয়া
সকল উচ্চ মম।
মোর কল্পনা শত
রঙিন মেঘের মতো
তাহারে ঘেরিয়া হাসিছে কাঁদিছে
সোহাগে হতেছে নত।।

আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠছে ভ্রাতৃবধূ - দেবর - সম্পর্কের প্রোটোটাইপ। যদিও নীলকান্তের মানসবিশ্বের নিশ্চিন্ত আশ্রয়টিও ভেঙে যায়। কিরণময়ীর প্রকৃত দেবর সতীশের আগমনে স্পষ্ট হয় নীলকান্তের সামাজিক অবস্থান—সে উপলব্ধি করে কিরণময়ীর পরিবারে সে একজন আশ্রিত মাত্র। সে কিরণময়ীর ক্ষণিক আমোদের উপকরণ—এই সত্যটি মেনে নিতে তার কষ্ট হয়েছিল। এই জন্য সতীশের সাধের দোয়াতদানটি লুকিয়ে নষ্ট করার বাসনা ছিলো তার। কৈশোরের আহত যন্ত্রণা তাকে করেছে প্রতিশোধপরায়ণ। যখন কিরণময়ীর চোখে তার অনিচ্ছাকৃত চুরি ধরা পড়ে যায়, তার যন্ত্রণা আরও বেশি। চুরির উদ্দেশ্যে সে চুরি করেনি; কিন্তু সে কি করে বোঝাবে, ''সে চোর নয়! তবে সে কী। কেমন করিয়া বলিবে সে কী।'' কিরণময়ীর সন্দেহ তার কাছে 'নিষ্ঠুর অন্যায়'—পরদিন সকালে নীলকান্তকে যে কারণে আর দেখা যায় না। রবীন্দ্রনাথ গল্পটি শেষ করেছেন নীলকান্তের পোষা গ্রাম্য কুকুরের বেদনাহত আচরণের বর্ণনায়—যে কি না ''আহার ত্যাগ করিয়া নদীর ধারে ধারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, খুঁজিয়া খুঁজিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিল।'' ঘটনাস্রোতে ভেসে আসা নীলকান্ত আবার ভেসে গেল জীবনের অনিশ্চয়তার পথে; শুধু তার বেদনাটুকু ধরা রইল আশ্রয়হীনের ঐ শব্দদ্বৈতগুলির মধ্যে।

৬

'সুভা' গল্পের সুভার জীবনের পরিণতিও সুখদায়ক নয়। তার নিস্তব্ধতা তো ছিলই, উপরন্তু সারা জীবন ধরেই তাকে রবীন্দ্রনাথ নিক্ষেপ করেছেন এক চরম একাকীত্বে। কিন্তু নিঃশব্দ সুভার জীবনে স্বপ্ন ছিলো; সেও চেয়েছিলো, ''কাহার প্রেমের বেদনায় আমার মূল্য আছে''। গ্রামের প্রতিবেশী অকর্মণ্য ছেলে প্রতাপের সঙ্গে কোনো অনুরাগের সম্পর্ক না থাকলেও প্রতাপের জন্য প্রতিদিন একটি করে পান সুভা পুকুরঘাটে সাজিয়ে আনতো। অনেকক্ষণ বসে বসে প্রতাপের মাছ-ধরা দেখতে দেখতে সুভার খুব ইচ্ছে করতো, প্রতাপের ''একটা কোনো কাজে লাগিতে, কোনো মতে জানাইয়া দিতে যে, এই পৃথিবীতে সেও একজন কম প্রয়োজনীয় লোক নহে।'' সুভার মনের মধ্যে গড়ে ওঠে তার নিজস্ব কল্পনার জগৎ—নিজেকে কেন্দ্র করে চারপাশে পছন্দের মানুষজনকে নিয়ে সুখী মুহূর্ত কল্পনা যে জগতের প্রধান কাজ। মনস্তত্ত্ববিদেরা বলেন, বয়ঃসন্ধিকালের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, যেখানে থাকে নিজেকে কেন্দ্র করে কাহিনি এবং দর্শক - শ্রোতা নির্মাণ — "Elkind refers to this self-consciousness as the imaginary audience, a conceptualized 'observer' who is as concerned with a young person's thoughts and behaviour as he or she is."[১২] শুরু হয় নিজেকে বিভিন্ন সত্তায় খণ্ডিত করে নিয়ে আত্মআলাপন। যেমন, সুভা কল্পনা করেছে—''মনে করো, সুভা যদি জলকুমারী হইত, আস্তে আস্তে জল হইতে উঠিয়া একটা সাপের মাথার মণি ঘাটে রাখিয়া যাইত; প্রতাপ তাহার তুচ্ছ মাছ ধরা রাখিয়া সেই মানিক লইয়া জলে ডুব মারিত; এবং পাতালে গিয়া দেখিত, রূপার পালঙ্কে—কে বসিয়া? আমাদের বাণীকণ্ঠের ঘরের সেই বোবা মেয়ে সু— আমাদের সু সেই মণিদীপ্ত গভীর নিস্তব্ধ পাতালপুরীর একমাত্র রাজকন্যা।'' বিশেষ মানুষকে নিয়ে অসম্ভব এক কল্পনার জগতে আশ্রয় খুঁজে নেয় কিশোরী সুভা।

সুভা এবং 'সমাপ্তি' গল্পে মৃণ্ময়ীর মধ্যে বয়ঃসন্ধিকালের ক্রমপরিণতি বর্ণিত হয়েছে। সুভা গল্পে সুভার শারীরিক

মানসিক বয়স বেড়ে চলার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সুকৌশলে প্রকৃতির সৌন্দর্য মিলিয়ে দিয়েছেন। তার আত্মোপলব্ধি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—''ক্রমে সে যেন আপনাকে আপনি অনুভব করিতে পারিতেছে। যেন কোনো একটা পূর্ণিমাতিথিতে কোনো একটা সমুদ্র হইতে একটা জোয়ারের স্রোত আসিয়া তাহার অন্তরাত্মাকে এক নূতন অনির্বচনীয় চেতনাশক্তিতে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে। সে আপনাকে আপনি দেখিতেছে। ভাবিতেছে, প্রশ্ন করিতেছে এবং বুঝিতে পারিতেছে না।" মনস্তত্ত্ববিদেরা কৈশোরক মনের এই অবস্থাকেই বলেছেন—"The core conflict of adolescene is the tension between role confusion and identity."[১৩] এই সমস্যা রতন, ফটিক, নীলকান্তের মধ্যেও দেখা গেছে। কিন্তু সুভার মধ্যে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে 'রোমান্টিক এ্যাগনি' (romantic agony)। ফলে ধীরে ধীরে পৃথক হয়ে যাচ্ছে একদিকে তার শৈশব এবং অপরদিকে তার আগত যৌবন; অন্ত্য-বয়ঃসন্ধিকাল যাকে সূচিত করেছে। ঘটেছে তার নূতন এক জন্মান্তর।

'সমাপ্তি' গল্পটিও মৃণ্ময়ীর জন্মান্তরের কাহিনি। এই প্রসঙ্গে ছিন্নপত্রাবলীর ২৬ সংখ্যক চিঠি (৪ জুলাই ১৮৯১)-র কথা মনে পড়বে। ''ছেলেদের মতো আত্মসম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন ভাব এবং তার সঙ্গে মাধুরী মিশে ভারী নতুন রকমের একটি মেয়েকে" দেখে রবীন্দ্রনাথ মৃন্ময়ীকে গড়ে তুলেছেন। সেই মেয়েটিকে শ্বশুরবাড়ি যেতে দেখে রবীন্দ্রনাথের উক্তি—''সকাল বেলাকার একটা অত্যন্ত হতাশ্বাস করুণ রাগিণীর মতো মনে হল, সমস্ত পৃথিবীটা এমন সুন্দর অথচ এমন বেদনায় পরিপূর্ণ। ..... বিদায়কালে এই নৌকো করে নদীর স্রোতে ভেসে যাওয়ার মধ্যে আরও একটু বেশি করুণা আছে। অনেকটা যেন মৃত্যুর মতো—তীর থেকে প্রবাহে ভেসে যাওয়া।" মৃণ্ময়ীর জীবনেও দেখি আদি-বয়ঃসন্ধিকালের সত্তার সমাপ্তি ঘটে সে নূতন এক মৃণ্ময়ীতে রূপান্তরিত হয়েছে। তার এই স্পষ্ট দুটি সত্তার নির্মাণ—যা রবীন্দ্রনাথের মতে সম্ভব হয়েছে হাসির রূপোর কাঠি এবং বেদনার সোনার কাঠির ছোঁয়ায়, সৃজন-কৌশলের সূক্ষ্মতায়, যা পাঠককে মুগ্ধ করে।

যদিও এই দুটি সত্তার পার্থক্যের ক্ষেত্রে কালগত হিসেব একেবারেই দীর্ঘ নয়। মৃণ্ময়ীর বয়ঃসন্ধিকাল চাপল্যের বিবরণ যেমন লেখক বিস্তৃতাকারে দিয়েছেন; তার অবসানের ছবিটিও কম বিস্তারিত নয়। আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না, তার বয়ঃসন্ধিকাল সময়ের বিচারে তখন শেষ না হলেও দেশীয় যুগগত সামাজিক সংস্কৃতিও যে বয়ঃসন্ধিকালে পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা নেয়, রবীন্দ্রনাথ সে দিকে ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ বয়ঃসন্ধির বিভিন্ন ভাবভঙ্গিমা প্রকাশের জন্য স্থান-কাল-পাত্রের পার্থক্যও কাজ করে।

অপূর্বর কলকাতায় ফিরে যাবার পর মৃণ্ময়ীর বয়ঃসন্ধিকালের দ্বিতীয় সত্তার সূচনা হলো। তাকে পিতৃগৃহে রেখে অপূর্ব কলকাতায় চলে গেলে—''মৃণ্ময়ীর হঠাৎ মনে হইল, যেন সমস্ত গৃহে এবং সমস্ত গ্রামে কেহ লোক নাই। যেন মধ্যাহ্নে সূর্যগ্রহণ হইল।" রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ কাব্যিক ভাষায় মৃণ্ময়ীর মনস্তত্ব ব্যাখ্যা করেছেন—''কাল সে জানিত না যে, জীবনের যে অংশ পরিহার করিয়া যাইবার জন্য এত মন-কেমন করিতেছিল তৎপূর্বেই তাহার সম্পূর্ণ স্বাদ পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। গাছের পক্ক-পত্রের ন্যায় আজ সেই বৃন্তচ্যুত অতীত জীবনটাকে ইচ্ছাপূর্বক অনায়াসে ছুঁড়িয়া ফেলিল।" মৃণ্ময়ীর আত্ম-উপলব্ধির মধ্যে অতীত জীবন ছুঁড়ে-ফেলার পূর্ব ইতিহাস রবীন্দ্রনাথ আগেই সৃষ্টি করেছিলেন, যদিও সে সচেতন ছিলো না। কনে দেখে ফেরার সময় নির্জন পথে মৃণ্ময়ীকে বন্দী করে অপূর্ব গভীর ভাবে তাকে দেখতে থাকে, ''এবং অত্যন্ত

ধীরে ধীরে মুষ্টি শিথিল করিয়া যেন যথাকর্তব্য অসম্পন্ন রাখিয়া বন্দিনীকে ছাড়িয়া দিল।" এই অপরূপ নীরব শাস্তির অর্থ মৃণ্ময়ী সে মুহূর্তে উপলব্ধি করে নি, কিন্তু কবির ভাষায় 'বঁধূ কোন আলো লাগলো চোখে'। তার যৌনচেতনার উন্মেষ শুধু নয়, অপূর্বর প্রতি নীরব আকর্ষণের সূত্রপাতও ঐ মুহূর্ত থেকেই।

এর পরে অপূর্বর সংস্পর্শে, কুশীগঞ্জে মৃণ্ময়ীর বাবার ছোট ঘরে একত্র বাসকালে তার হৃদয়ানুভব বিকশিত হচ্ছিলো। অলক্ষ্যে, গভীরে। এর সঙ্গে পেয়েছিল কুশীগঞ্জে নদীর তীরে 'অবাধ স্বাধীনতা'—যা বয়ঃসন্ধির কিশোরীর সব চাইতে প্রিয়। শ্বশুরবাড়ির বন্দী জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে এই মুক্তি এবং প্রিয় মানুষের সঙ্গ—মৃণ্ময়ীকে দিয়েছিলো দ্বৈত জীবনের স্বাদ।

প্রায়-অরণ্যবালিকা থেকে প্রেমিকা মৃণ্ময়ীর উদ্বোধন ধীরে ধীরে ঘটেছে। কিন্তু অপূর্বর কলকাতা চলে যাওয়া, মৃণ্ময়ীর মনে ঘটে-যাওয়া বিরাট পরিবর্তনের ক্ষেত্রে দ্রুত অনুঘটকের কাজ করেছে। এই পরিবর্তন, রবীন্দ্রনাথ বিধাতার হাতের সূক্ষ্ম তরবারির সাহায্যে সংঘটিত বলে বর্ণনা করেছেন—"কখন তিনি মৃণ্ময়ীর বাল্য ও যৌবনের মাঝখানে আঘাত করিয়াছিলেন সে জানিতে পারে নাই; আজ কেমন করিয়া নাড়া পাইয়া বাল্য-অংশ যৌবন হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িল এবং মৃণ্ময়ী বিস্মিত হইয়া ব্যথিত হইয়া চাহিয়া রহিল।" মৃণ্ময়ীর কাছে তার পূর্ব পরিচয় অতীত ইতিহাস হয়ে রইলো মাত্র, নিজের মধ্যে সে উপলব্ধি করলো বেদনার সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ আর এক মৃণ্ময়ীকে;—"এই যে একটি গম্ভীর স্নিগ্ধ বিশাল রমণীপ্রকৃতি মৃণ্ময়ীর সমস্ত শরীরে ও সমস্ত অন্তরে রেখায় রেখায় ভরিয়া উঠিল, ইহাতে তাকে যেন বেদনা দিতে লাগিল।" বয়ঃসন্ধিকালের এই পরিপূর্ণতা যেন আষাঢ়ের শ্যামসজল নবীন মেঘের আসন্ন সৃষ্টির পরিপূর্ণতা।

বিরহবেদনার সজল ছোঁয়ায় সম্পূর্ণ হয়েছে মৃণ্ময়ীর উপলব্ধির আবিশ্ব। নতুন যৌবনের বেদনায় তার মন এবং আচরণের সদ্য অতীতের স্মৃতি তাকে ক্রমাগত লজ্জা দিতে লাগলো। অভিমানী মৃণ্ময়ী অপূর্বকে অভিযোগ করার জন্য নিজের মনের মধ্যে অপূর্বকে সৃজন করে—অর্থাৎ তারই একটি সত্তা অপূর্ব হয়ে উঠলো, নিবিড় এক কল্পনার জগতে এবং তার সঙ্গে শুরু হলো মৃণ্ময়ীর কথোপকথন। তার আক্ষেপ হলো—"অপূর্ব তাহাকে যে দুরন্ত চপল অবিবেচক নির্বোধ বালিকা বলিয়া জানিল, পরিপূর্ণ হৃদয়ামৃত ধারায় প্রেমপিপাসা মিটাইতে সক্ষম রমণী বলিয়া পরিচয় পাইল না, ইহাতেই সে পরিতাপে লজ্জায় ধিক্কারে পীড়িত হইতে লাগিল।" অর্থাৎ মৃণ্ময়ীর মধ্যে শুরু হয়েছে 'নির্বোধ বালিকা' বনাম 'সক্ষম রমণী'র দ্বন্দ্ব। তার অসমাপ্ত চুম্বন অতীত স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে পরিতৃপ্তির পথ খুঁজে চললো। যৌন-আকর্ষণ এবং প্রেম-পিপাসা দুই এখানে মিলেছে এক বিন্দুতে। অন্ত্য-বয়ঃসন্ধির শারীরিক মানসিক পরিবর্তন, বেদনাবোধ তাকে চিরকালের মতো নতুন জীবন দিলো, সমাপ্তি ঘটলো তার শৈশবের।

৮

মৃণ্ময়ী তার বিবাহিত জীবনের গোড়ায় সর্বাপেক্ষা অপছন্দ করেছে তার শ্বশুরবাড়িকে। উনিশ শতকের শেষার্ধে দেশীয় প্রথা অনুযায়ী বাঙালি মেয়েদের যে বয়সে বিয়ে হতো তাদের পক্ষে সবচেয়ে ভীতিজনক ছিল তাদের শ্বশুরবাড়ি। সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি পরিবেশে নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছা বিসর্জন দিয়ে বারো-তেরো-চোদ্দ বা

আরও ছোট মেয়েটিকে শৈশব ভুলে বড় হবার চেষ্টা করতে হতো; মনোবিদের ভাষায় যাকে বলা যায়—"One of the most diffficult developmental tasks of adolescene relates to social adjustments. These adjustments must be made to members of the opposite sex in a relationship that never existed before and to adults outside the family."[১৪] এই কথাগুলি উনিশ শতকের বাঙালি মেয়েদের জীবনের ধ্রুব সত্য। এই সমস্যা আমরা দেখতে পাই 'খাতা' গল্পের উমার জীবনে। তার জীবনকথায় বাংলাদেশের বিজয়ার সুর লেগেছে। 'গ্রাম্যসাহিত্য' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করেছেন—''হরগৌরীর কথায় আমাদের বাংলাদেশের একটা বড় মর্মের কথা আছে। কন্যা আমাদের গৃহের এক মস্ত ভার। ..... একান্নবর্তী পরিবারে আমরা দূর ও নিকট, এমনকি নামমাত্র আত্মীয়কেও, বাঁধিয়া রাখিতে চাই; কেবল কন্যাকেই ফেলিয়া দিতে হয়।" উমাকেও কৈশোর শুরুর আগেই পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করেছিলো।

নয় বছর বয়সে বিবাহিত জীবন শুরু করার সময় উমা সঙ্গে পেয়েছিলো তার প্রিয় খাতাটি, যা তার নিভৃত মনের সুখ দুঃখের বিশ্বস্ত বন্ধু—''এই খাতাটি তাহার পিতৃভবনের একটি অংশ; তাহার অতিক্ষণিক জন্মগৃহবাসের স্নেহময় স্মৃতিচিহ্ন, পিতামাতার অঙ্কস্থলীর একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, অত্যন্ত বাঁকাচোরা কাঁচা অক্ষরে লেখা। তাহার এই অকাল গৃহিণীপনার মধ্যে বালিকাস্বভাবরোচক একটুখানি স্নেহমধুর স্বাধীনতার আস্বাদ।" তার আত্মপ্রকাশের সেই 'স্নেহমধুর স্বাধীনতার আস্বাদ' সে বেশিদিন উপভোগ করতে পারলো না, তিন ননদিনীর কৌতূহল এবং স্বামী প্যারীমোহনের শাসনের জন্য। বাংলাদেশের অনেক কিশোরীকে একসময় তার স্বামীগৃহে মনের সুকুমার বৃত্তিগুলিকে চিরদিনের মতো বিনষ্ট করে পরিবারের ছাঁচে নিজেকে তৈরি করার সাধনায় ব্রতী হতে হতো। অর্থাৎ বয়ঃসন্ধিকালের আত্মপ্রকাশের ভাব-ইচ্ছা-অনিচ্ছাগুলিও পরিবার-সমাজ এবং দেশীয় সংস্কৃতির অনুমোদনের অপেক্ষা রাখে, গল্পকারের ইঙ্গিত সেদিকেই। আর উনিশ শতকে সমাজের এই শাসন প্রধানত ছিলো পরিবারের কিশোরী বধূটির জন্য; একইসঙ্গে সংসারে সবার মাঝে থেকেও সে বন্দী থেকে যায় তার নিঃসঙ্গতাবোধের বৃত্তে।

৯

কৈশোরের স্মৃতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এক অক্ষয় সম্পদ, অমূল্য সঞ্চয়। পরবর্তী জীবনের ব্যক্তিত্বের ছাঁচ গঠনের জন্য এই স্মৃতির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তিমানুষের আবেগীয় জগতের অনেকখানি গড়ে ওঠে এই স্মৃতির সহায়তায়। 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পের গিরিবালার মানসবিশ্ব গঠনে কাজ করেছে তার কৈশোরের স্মৃতি। গল্পটির কাহিনিবৃত্তে আছে তার জীবনের দীর্ঘ পর্যায়। সূচনা তার শৈশব-কৈশোরে। গ্রামে যুবক শশিভূষণের সঙ্গে ছিল তার অসমবয়সী বন্ধুত্ব। রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন— ''গ্রামের মধ্যে আর সকলেই দলাদলি, চক্রান্ত, ইক্ষুর চাষ, মিথ্যা মোকদ্দমা এবং পাটের কারবার লইয়া থাকিত, ভাবের আলোচনা এবং সাহিত্যচর্চা করিত কেবল শশিভূষণ আর গিরিবালা।" গিরিবালার কৈশোরে এই 'ভাবের আলোচনা এবং সাহিত্যচর্চা' তার মনোগহনে দুভাবে কাজ করেছে—একদিকে শশিভূষণের প্রতি তার গভীর আকর্ষণ এবং শ্রদ্ধাবোধ গাঢ়তর হয়েছে, অপরদিকে তার নিজের মনোজগতের ঊর্ধ্বায়ন ঘটেছে—গ্রামের কুশ্রী পরিবেশে সুন্দর সম্পর্কের যে স্নিগ্ধ শ্যামলতার এবং জ্ঞানের বৃহত্তর জগতের যে আস্বাদন সে পেয়েছিলো, তার পরবর্তী

জীবনে ও গল্পের উপসংহারে দেখি তারই সক্রিয় প্রবর্তনা। অল্প বয়সের সেই মধুর স্মৃতিটুকুই তার বাকি পথের একমাত্র অবলম্বন।

রবীন্দ্রনাথ শশিভূষণকে বারবার উল্লেখ করেছেন 'ক্ষীণদৃষ্টি' বা 'অন্ধ যুবাপুরুষ' নামে—তার দৃষ্টির অল্পতাতো ছিলোই, এছাড়াও ছিলো নারীচরিত্র সম্পর্কে তার অজ্ঞতা। কৈশোরেও যে নারীর হৃদয়রহস্য অপরিসীম কৌতূহলের, অজানা মণির নূতন খনি তা শশিভূষণের বোধের বাইরে ছিলো। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—''এই বালিকা কেন যে একদিন বা রাগ করে, একদিন বা অপরিমিত স্নেহ প্রকাশ করিতে থাকে, কোনোদিন বা দৈনিক বরাদ্দ (জাম) বাড়াইয়া দেয়, কোনোদিন বা দৈনিক বরাদ্দ একেবারেই বন্ধ করে, তাহার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া সহজ নহে। এক-একদিন যেন তাহার সমস্ত কল্পনা ভাবনা এবং নৈপুণ্য একত্র করিয়া যুবকের সন্তোষ সাধনে প্রবৃত্ত হয়, আবার এক-একদিন তাহার সমস্ত ক্ষুদ্র শক্তি, তাহার সমস্ত কাঠিন্য দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠে; কৃতকার্য হইলে সে কাঠিন্য অনুতাপের অশ্রুজলে শতধা বিগলিত হইয়া অজস্র স্নেহধারায় প্রবাহিত হইতে থাকে।" বয়ঃসন্ধিকালের নারী-স্বভাবের এত সুন্দর পরিচয়—একইসঙ্গে নিজেকে সংগুপ্ত রাখার ও প্রকাশিত করার চেষ্টা—এও বাংলাসাহিত্যে বিরল।

শশিভূষণের কাছে গিরিবালা লেখাপড়া শিখতে শুরু করেছিলো। রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন—''এই মাস্টারটি তাহার ক্ষুদ্র ছাত্রীকে কেবল যে অক্ষর বানান এবং ব্যাকরণ শিখাইত তাহা নহে—অনেক বড়ো বড়ো কাব্যের তর্জমা করিয়া শুনাইত এবং তাহার মতামত জিজ্ঞাসা করিত। বালিকা কি বুঝিত তাহা অন্তর্যামীই জানেন, কিন্তু তাহার ভালো লাগিত সন্দেহ নাই। সে বোঝা-না-বোঝায় মিশাইয়া আপন বাল্য-হৃদয়ে নানা অপরূপ কল্পনাচিত্র আঁকিয়া লইত।" গিরিবালার মনোজগতে আনন্দের সহযোগে এই যে বিস্তার, এই যে উন্মোচন ঘটলো তা দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলেছিলো। শশিভূষণের ওপর ক্রমশ সে অধিকারবোধ অনুভব করেছে। কিন্তু গল্পে যখন, ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে সামাজিক ঘটনার দ্বন্দ্বে শশিভূষণ তার প্রতি উদাসীন, গিরিবালা অভিমানে তার চারুপাঠ ছিঁড়ে পথে ছড়িয়ে দিয়েছিল; একদিন সে-ই আবার বকুলফুল তুলে মালা গেঁথে শশিভূষণের তক্তপোষের উপর রেখে চলে গিয়েছিলো। তার বিবাহ যেখানেই হোক না কেন, সে বরণ করে নিয়েছিল শশিভূষণকেই। শশিভূষণের কাছে যে স্লেট-বই নিয়ে সে লেখাপড়া শিখেছিলো, সেগুলি ছিল তার পরম আদরের ধন; কৈশোরের সেই স্মৃতিচিহ্নগুলি এবং শশিভূষণের সমস্ত বই গিরিবালা পরম মমতায় যত্নে সংরক্ষণ করেছে। কৈশোরের বিশেষ মানুষের স্মৃতি-আশ্লিষ্ট সঞ্চয়গুলি তার বেঁচে থাকার বড় আশ্রয় ছিলো।

১০

গল্পগুচ্ছের তৃতীয় খণ্ডের কৈশোরক কালের যে কটি চরিত্র আছে অধিকাংশই কিশোর; 'হৈমন্তী' গল্পের হৈমন্তী এবং 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণী ব্যতিক্রম। এই গল্পগুলি, বিশেষ কোনো আদর্শ, বক্তব্য বা তত্ত্বকথা মুখ্য হয়ে ওঠার কারণে চরিত্রের উপর আলোকপাতের তুলনায় কোথাও বা ঘটনামুখ্য কোথাও বা ভাবমুখ্য হয়ে উঠেছে। একমাত্র 'বলাই' গল্পটি বলাই চরিত্রকে ঘিরে গড়ে উঠেছে।

'মাস্টারমশায়' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র 'হরলাল'। তার ছাত্র বেণুগোপালের শৈশব থেকে কৈশোর অবস্থার কিছু

ঘটনা গল্পের অভিমুখ গড়ে দিয়েছে; যদিও তার চরিত্র গল্পে বিস্তৃতাকার পায় নি। শৈশব-কৈশোরে হরলাল ছিলো বেণুগোপালের সর্বাপেক্ষা প্রিয় মানুষ। এই বয়স পছন্দের শিক্ষককে যেভাবে আঁকড়ে ধরে সেও তা-ই করেছিল। শুধু অতি নির্ভরতা নয়, ধনী পরিবারের সন্তান বেণুগোপাল জানত নিরীহ ছা-পোষা নিতান্ত ভদ্র মানুষ হরলাল তার পক্ষে সব চাইতে নিরাপদ। সেজন্য হরলালের অফিসের টাকা অনায়াসে চুরি করে বিদেশে পাড়ি দিতে সে দ্বিধাবোধ করে নি। এই বয়স যে অনেক সময়ই অপরিণামদর্শী, বেণুগোপাল তা প্রমাণ করলো।

'রাসমণির ছেলে' গল্পে 'কালীপদ'র স্বল্পায়ু জীবনকাহিনি বর্ণিত হয়েছে। মা রাসমণির শিক্ষায়, সে অতি অল্প বয়স থেকেই তাদের দারিদ্র্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিলো। তার অতি কাঙ্ক্ষিত মোমের পরি, মাত্র এক দিনের জন্য দু-টাকা ভাড়ার বিনিময়ে সে যখন পেলো, সেই ''একদিনের মিলনের সুখস্মৃতি অনেক দিন তাহার মনে জাগরূক হইয়া রহিল, তাহার কল্পনালোকে পাখা চলার আর বিরাম রহিল না।'' তবে তার শৈশব-কৈশোর দারিদ্র্যের কাঠিন্যে বাঁধা ছিলো বলে কল্পনার রঙিন আবেশ খুব তাড়াতাড়িই তাকে কাটিয়ে উঠতে হয়েছিলো। পরিবর্তে সে উজ্জীবিত হয়ে উঠলো আরও বড় এক স্বপ্নে, শপথে— লেখাপড়া শিখে সে তার উপার্জনে পরিবারের দারিদ্র্য দূর করবে।

যদিও তার স্বপ্নও স্বপ্নভঙ্গেরই ইতিহাস। তার পরিণতি পাঠককে ভারাক্রান্ত করে রাখে। এই গল্পটিতে জমিদার পরিবারের দলিল-চুরি এবং জ্ঞাতি-শত্রুতা-ভালোবাসার প্রেক্ষাপটে কৈশোর-তারুণ্যের দু-ধরনের ছবি পাশাপাশি রেখেছেন রবীন্দ্রনাথ। একদিকে দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কালীপদ'র একনিষ্ঠতা, অপরদিকে তাদেরই সম্পদে ধনী-হওয়া তার জ্ঞাতি আত্মীয় শৈলেনের উচ্ছৃঙ্খলতা-বিলাসব্যসন ও পরিশেষে প্রায়শ্চিত্ত সম্পাদন। ঠাকুর-পরিবারের আত্মীয় পরিবেশে এই গল্পের চরিত্রগুলির সমগোত্রীয় চরিত্র সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ দেখে থাকবেন। যেন এক বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে চরিত্রগুলিকে খুব দ্রুততার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। তবে কালীপদ-চরিত্রের একমুখিতা তাকে করুণ করে তুলেছে।

'পণরক্ষা' গল্প দুই অসমবয়সী সহোদরের গল্প। বংশী তার ভাই রসিককে অত্যধিক আদরে প্রশ্রয়ে বড় করার জন্য সে এক বাস্তবসম্পর্কহীন পৃথিবীর অধিবাসী হয়ে ওঠে। একইসঙ্গে রসিকের ছিল বহুমুখী প্রতিভা। গ্রামেরই মেয়ে সৌরভীর সঙ্গে তার একটি রোমান্টিক সম্পর্কের অবকাশ সৃষ্টি করেছেন রবীন্দ্রনাথ। রসিক যখন পুতুল গড়তো, সৌরভীর দেখতে দেখতে ইচ্ছা করতো ''রসিক তাহাকে একটা কিছু ফরমাশ করে। কাজ করিতে করিতে পান চাহিবে জানিয়া সৌরভী তাহা যোগাইয়া দিবার জন্য প্রতিদিন প্রস্তুত হইয়া আসিত।'' সুভার কথা এখানে মনে পড়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এখানে রবীন্দ্রনাথ গল্পটি গড়ে তুলেছেন কিশোরটিকে কেন্দ্র করে।

সৌরভীর প্রতি রসিকেরও ছিল বিশেষ মমতা—নিজের হাতে তার বানানো পুতুল থেকে বেছে সৌরভীকে দিতো সে। কিন্তু দাদার স্নেহ, নিজের স্বপ্নের জগৎ এবং সৌরভীকে কেন্দ্র করে তার আকর্ষণ, ভবিষ্যত জীবনের পরিকল্পনা—সমস্ত ছিন্ন করে একসময় সে, নিজে উপার্জন করে সাইকেল কিনবে এই প্রতিজ্ঞায়

গ্রামত্যাগ করে। তার আহত কৈশোরক অনুভূতিতে সে এই প্রতিজ্ঞা করলেও গল্পের শেষে 'দ্য প্রডিগাল সন' (The Prodigal Son) নামক বাইবেলের বিখ্যাত নীতি গল্পটি মনে পড়ে; সে যখন গ্রামে ফিরে আসে। যদিও তার সমস্ত সুখের সম্ভাবনা শেষ হয়েছে তখন।

'ভাইফোঁটা' গল্পের সুবোধ চরিত্রটি সাত বছর বয়সে মা-হারা হয়েছিলো; বাবাকে হারিয়েছিলো আরও আগে। তার সম্পর্কে লেখক লিখেছেন—''সমস্তটা জড়াইয়া তার কেমন - একটি ক্ষণিকতার ভাব, পৃথিবী যেন তাকে পুরা পরিমাণ স্তন্য দিতে ভুলিয়া গেছে।'' সে আশ্রয় পেয়েছিলো তার মায়ের কৈশোরের বিশেষ পরিচিত গল্প-কথকের কাছে। কিন্তু সমাদরের পরিবর্তে তার ভাগ্যে জুটেছিলো অপরিসীম অবহেলা আর শারীরিক মানসিক অত্যাচার। অসহনীয় পরিবেশে যে নবীন প্রাণ বাঁচে না, ফটিকের মতোই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সুবোধ তা প্রমাণ করে গেলো।

'অপরিচিতা' গল্পের সতেরো বছরের কল্যাণীর বিবাহ-সম্বন্ধ ভেঙে গেলে সে মেয়েদের শিক্ষাদানের ব্রত গ্রহণ করেছিলো। পরাধীন ভারতের নারীশক্তির জাগরণ তার মধ্যে দ্যোতিত হয়েছে সন্দেহ নেই। তবে কিশোর বয়স যে মা কিংবা বাবাকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে, বিশেষত তিনি যদি ব্যক্তিত্বশালী হন, তা কল্যাণীর আচরণে প্রতিফলিত হয়েছে। পিতা শম্ভুনাথ সেনের আদর্শ কল্যাণীকে প্রভাবিত করেছিলো।

'পাত্র ও পাত্রী' গল্পটি কেন্দ্রীয় চরিত্র 'সনৎকুমারের' দীর্ঘ জীবনকাহিনি। গল্পের প্রথমাংশে দেখা যায়, যুগীয় প্রথা অনুযায়ী কৈশোরেই তার বিবাহ-সম্বন্ধ হতে থাকে। ফলে তার মনে হয়—''আমি যে পূজনীয় সে কথাটা সেই চোদ্দ বছর বয়সে আমার পুরুষের রক্তে গাঁজিয়ে উঠল।'' তার কল্পনার স্মৃতির মধ্যে আছে তার বাবাকে অনুকরণের স্পৃহা, একজন কিশোরের পক্ষে যা অত্যন্ত স্বাভাবিক—পারিবারিক স্মৃতির মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে ব্যক্তির মানসিক গঠন। তার মনে ''গার্হস্থ্যের যে চিত্রগুলি স্পষ্ট রেখায় জেগে উঠল'' সেগুলি তার ভাষায় ''আমার পৈতৃক ইতিহাসে ঠিক এই রকম ঘটনাই পূর্বে একদিন ঘটেছিল, এই কল্পনার মধ্যে আমার ওরিজিন্যালিটি কিছুই নেই।''

'বলাই' চরিত্রটি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ ভাবনাপ্রসূত। তিনি বিশ্বাস করতেন প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নিবিড় সম্পর্ক আছে। ছিন্নপত্রাবলীর বিভিন্ন চিঠিতে তার পরিচয় আছে। জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে তাঁর সেই বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ ছিলো। ১৩৩৫ (১৯২৮) এ লেখা এই গল্পটিতে তিনি এমন একটি চরিত্র সৃষ্টি করলেন যে বাস্তবিকই প্রকৃতির সন্তান, প্রকৃতির আনন্দসুধা পান করে যে বড় হয়ে উঠেছিলো। বলাই তার বন্ধুত্ব স্থাপন করেছিলো একটি শিমূল গাছের সঙ্গে, তার একান্ত ভালোবাসা বিশ্বাসের জগৎ গড়ে উঠেছিলো গাছটিকে কেন্দ্র করে। এখানেও রবীন্দ্রনাথ কোমল মানসিকতার আবহ তৈরি করে ভেঙে দিলেন; কিশোরকালের ভাঙাগড়াকে যা নিশ্চিতভাবে ইঙ্গিত করে।

গল্পগুচ্ছের তৃতীয় খণ্ডের কিশোর চরিত্রগুলির রূপায়ণে তাদের মানসিকতা কিংবা আচরণের সূক্ষ্মতা বা জটিলতা উন্মোচনে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ ভাবিত ছিলেন না। বরং কোনো বিশেষ ভাবনা কিংবা মতাদর্শ জ্ঞাপনই তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো। প্রথম দিকের গল্পগুলিতে বিভিন্ন চরিত্রের মনোগহনের এবং আচরণের যে বিস্ময়কর

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কাব্যিক প্রকাশ পাঠককে মুগ্ধ করে রাখে, তা ভাষা এবং প্রকাশভঙ্গির পার্থক্যের কারণে পরের দিকের গল্পে সুলভ নয়। তবু হৈমন্তীর বেদনাবোধের গভীরতা এবং কল্যাণী চরিত্রের আত্মগৌরবের সতেজতা মন ছুঁয়ে যায়।

চতুর্থ খণ্ডের 'মুসলমানীর গল্প'-এর 'কমলা' চরিত্রে প্রেমোদ্দামের মধ্য দিয়ে চবিত্রটির পরিচিতি ঘটে। বিস্তারিত বিবরণ রবীন্দ্রনাথ দেননি, হয়তো তাঁর ক্লান্তি ছিলো; মৃত্যুর মাত্র দু'মাস আগে লেখা গল্পে হিন্দু-মুসলমানের তুলনামূলক পার্থক্য গুরুত্ব পেয়েছে।

মনস্তত্বের সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা অনুসারে রবীন্দ্রনাথ গল্প লেখেন নি। কিন্তু তাঁর গল্প-সাহিত্য আজ মনস্তত্ব-বিচারের অন্যতম উপকরণ। তাঁর গল্পে আমরা নিঃসঙ্গ মানুষের দেখা বারবার পেয়েছি। কৈশোর থেকেই তাঁর চরিত্রেরা অধিকাংশই নিঃসঙ্গ। এক তীব্র অভিমানে এরা যেন মাটির পৃথিবীতে প্রকৃতই ক্ষণিকের অতিথি। কিংবা নিঃসঙ্গ না হলেও তাদের বেদনাবোধের গভীরতা আমাদের আপ্লুত করে, ভাবিত করে। তাদের মনোগহনে ডুব দিতে অনুপ্রাণিত করে। বিদেশে মনস্তত্বের বিভিন্ন বিষয়ে শেক্সপিয়েরের নাটকগুলি উপকরণ হিসেবে আলোচিত হয়। বাংলাসাহিত্যেও রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যের মনস্তত্বের সংজ্ঞা-তত্ত্ব অনুযায়ী আলোচনা শুরু হয়েছে, তবে তা সীমিত। আশা করি, এই দৃষ্টিভঙ্গি ক্রমশঃ গুরুত্ব পাবে।

ঋণস্বীকার : নীরাজনা ঘোষ, অধ্যাপক, দি নেওটিয়া ইউনিভার্সিটি।
শ্রীমতী মুখার্জি, অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি।

তথ্যসূত্র

১. Eriction, Eric H. 1950 Childhood and Society, p-235, Paladin Grafton Books, London, 1977.

২. Ciccarelli, Sundra., Meyer, G. 2006, Psychology, P-293 Pearson - Longman. (Adolescence is the period of life from about age 13 to the early twenties.)

৩. Hurlock, Elizabeth. B. 1981, Developmental Psychology; A Life - Span Approach, 5th Edition, p-223, Tata - Mcgraw - Hill Publishing Company Limited.

৪. The clearest sign of the beginning of adolescene is the onset of puberty, the physical changes in both primary sex characteristics (growth of actual sex organs such as the penis or the uterus) and secondary sex characteristics (changes in the body such as sexual development) reaches its peak. Ciccarelli, P-293.

৫. Feist, J & Feist, G. J, 2009, Theories of Personality, P-256, Mcgraw - Hill

৬. Baron, Robbert. A. 2008, Psychology, 5th Edition, p-336, Pearson Prentice Hall

৭. Hurlock, p-225.

৮. Do, P-230.

৯. Bowlby, J. (1980). Attachment and Loss, volume 3, Sadness and Depression, New York; Basic Book.

১০. ''যদিও গল্পের 'নাম পোস্টমাস্টার', কিন্তু আসলে এটি একটি পল্লীবালিকার বয়ঃসন্ধিলগ্নে হৃদয় - উন্মীলনের বেদনাবিধুর কথাশিল্প।'—ঘোষ, তপোব্রত। রবীন্দ্র-ছোটগল্পের শিল্পরূপ (২০০১), পৃ : ৫৪, দে'জ পাবলিশিং।

১১. The new psychosocial dimension which appears during adolescence has a sense of ego identity at the positive end and a sense of role confusion at the negative end. — Zeigler, Daniel J & Hjelle, Larry A. Personality Theories : Basic Assumptions, Research and Application. (1976) P-125, Mcgraw - Hill 1992.

১২. Papalia, Diane E, Olds, Sally. W, Feldman, R. Duskin, 2006. Human Development, p-407. Tata - Mcgraw.

১৩. Morgan, King, Weisz, Schopler, 1993, Introduction to Psychology, 7th Edition. p-472.

১৪. Hurloc, P-230.

হিত-অহিতের রাজনীতি এবং *হিতোপদেশ*—এর গল্প : একটি বিশ্লেষণ

সৌম্যদীপ বসু, অতিথি-অধ্যাপক, বাসন্তী দেবী কলেজ
soumyadipbose7145@gmail.com

সারসংক্ষেপ

হিতোপদেশ-এর গল্প ভারতীয় 'কথা' ধারায় এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। সংরূপ বিচারে এসব কথা 'নীতিকথা'-র গোত্রভুক্ত। আপাত-দর্শনে 'নীতিকথা' হলেও উদ্দেশ্যে এবং অন্তর্বয়নের দিক থেকে এরা যথেষ্ট রাজনৈতিক। সমকালের আর্থ-রাজনৈতিক-সামাজিক বিন্যাসের অনেকানেক জটিল সূত্র এইসব পাঠের গহনে প্রচ্ছন্ন রয়েছে। 'হিতোপদেশ' বলতে সরলার্থে যাকে সর্বসাধারণের হিত বা মঙ্গলের জন্য প্রদেয় উপদেশ ভাবি, তা কী আদৌ শ্রেণি-নির্বিশেষে সকলের হিতের কথা বলে? নাকি, বিশেষ কোনও অংশের হিতার্থেই এইসব উপদেশের প্রয়োগ। *হিতোপদেশ* সংকলনের নির্বাচিত কয়েকটি গল্পকে ছুঁয়ে ঘনিয়ে ওঠা তেমন কিছু প্রশ্নের মোকাবিলা করাই বর্তমান পরিসরে আমাদের সন্ধান।

সূচক-শব্দ : শ্রেণি, তোষণ, বৈষম্য, নিম্নবর্গ, ছলনা, আকাঙ্ক্ষা, রাজনীতি

১

হিতোপদেশ— এর গল্পের চরিত্র প্রধানত নীতিমূলক। সাধারণভাবে পশুপাখিকে উপলক্ষ করে অথবা রূপক হিসেবে গ্রহণ করে এবং কখনও কখনও পশুপাখি ছাড়াই কেবলমাত্র মানুষকে নিয়ে গড়ে ওঠা নীতিজ্ঞানপ্রদায়ী যে কথা, তাই 'নীতিকথা' বা 'fables' শিরোনামে বিশ্ববন্দিত। এক্ষেত্রে নীতিনির্দেশনার উদ্দেশ্য ঘোষিতভাবে (যদিও ঘোষণাটাই কী সব?) সামাজিক হিতনির্ভর। এইজাতীয় নীতি-আখ্যানের গঠনসৌষ্ঠব বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে লোকসংস্কৃতিবিদ মযহারুল ইসলাম জানচ্ছেন :

> নীতিবাচক লোককাহিনী কলেবরে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, বৃক্ষলতা গুল্ম ইত্যাদি এর চরিত্র হিসেবে বিদ্যমান— মাঝে মাঝে এদের সঙ্গে মানুষও থাকে। মানুষ ছাড়া আর যেসব চরিত্র থাকে তারাও মানুষের মতোই আচরণ করে এবং কথা বলে। আরেকটি বিশেষ লক্ষণ এই যে, কাহিনির শেষে থাকে একটি নীতিকথা এবং সমগ্র কাহিনী যেন এই নীতিবাক্যটিকে প্রতিপন্ন করবার জন্যেই প্রথম থেকে তৈরি হতে থাকে।... নীতিবাচক লোককাহিনীতে কোনো জটিলতা থাকেনা, কাহিনী সহজ ও সরল। দুইটি পক্ষ থাকে, কিন্তু তাদের দ্বন্দ্ব ও সংঘাত ভয়ানক কোনো রূপ ধারণ করে না— বিরোধটি ব্যাপক পরিসর নয়।... একটি ছোট প্রাঙ্গণে এর জন্ম এবং সেই প্রাঙ্গণেই এর স্থিতি ও পরিণতি ঘটে। এর ক্রিয়াশীলতা থাকে অপরিবর্তনীয়।[১]

বলতেই হচ্ছে, নীতিকথার চারিত্রলক্ষণ নিয়ে বলা কথাগুলোর সবকটিকেই আক্ষরিকভাবে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। বর্তমান পরিসরেই নীতিকথা সম্পর্কিত উক্ত স্বতঃসিদ্ধের অনেকাংশ খণ্ডিত হবে। এখানে তাঁর দু'একটি নমুনা পেশ করা যেতে পারে। যেমন,

১। নীতিকথার প্লট ও কাহিনী অংশটি সব অবস্থাতেই জটিলতামুক্ত, এমন নয়। গল্পে অবস্থানরত দুই পক্ষের দ্বৈরথে ক্ষেত্রবিশেষে থাকতেই পারে সমাজদ্বন্দ্বের কূট ইশারা। আপাত-সরল কাহিনির অন্তর্লোকেও অনেকসময় থেকে যায় চোরাগোপ্তা সব ভাঁজ, গূঢ় তাৎপর্যের ইঙ্গিত। তবে এ ব্যাপারটি অবশ্যই কাহিনিবিশেষে পরিবর্তনীয়, এর কোনও একরৈখিক সহজসিদ্ধান্ত নেই।

২। নীতিকথার শেষে নীতিবাক্যের উপস্থিতি মোটেই সর্বত্রদৃষ্ট নয়। এমন অনেক কথা আছে যেখানে গল্পের শেষে আলাদা করে কোনও নীতিনির্দেশক বাক্য জোড়া হয়না। বিশেষ একটি নীতি বা মূল্যবোধের প্রতি সমর্থন থাকে কাহিনী-কাঠামোর অন্দরেই। ওই নৈতিক আদর্শের অভিমুখে কাহিনীটি এমনিতেই এগোয়। মাননীয় নরেশচন্দ্র জানা তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত *ইশপের গল্প সমগ্র*-এর ভূমিকায় লিখেছেন, ''ইশপ তাঁর গল্পে কোথাও নীতি-উপদেশ নির্দেশ করেননি। পরবর্তীকালে সংকলকেরা নিজেরা নীতি-উপদেশ জুড়ে দেন।''[২]

বাংলার কথাধারায় নীতিকথার ভাঁড়ার শূন্য। সেখানে প্রাপ্ত পশুপাখিকথা অথবা রঙ্গকথা গোত্রের কাহিনিতে অনেকসময় নৈতিক অভিমুখ থাকে। কিন্তু জ্যঁর হিসেবে 'নীতিকথা' যাকে বলে, তেমন অমিশ্র কোনও একক সংকলন বাংলার লোককথার লিখিত ঐতিহ্যে পাওয়া দুরূহ।[৩] ভারতীয় কথাধারায় অবশ্য এর রমরমা উপস্থিতি। এদেশে সংস্কৃত কথার প্রাচীনতম সংকলন *পঞ্চতন্ত্র* থেকে শুরু করে *হিতোপদেশ*-এর গল্প— সবই প্রবণতার দিক থেকে নীতি-আখ্যানের প্রতিনিধত্বমূলক।

২

হিতোপদেশ পঞ্চতন্ত্র-এর রচনারীতির আদর্শে মূল গল্পের মধ্যে প্রাসঙ্গিকভাবে ছোটো ছোটো গল্পের সমাবেশ সংকলিত একপ্রকার নীতিনির্দেশক কথামালা। এর ৪৩ টি গল্পের মধ্যে ২৫ টি গল্প পঞ্চতন্ত্র থেকে আর অবশিষ্ট গল্প সেইকালে প্রচলিত অন্য একটি বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ *কামন্দকীয় নীতিসার* থেকে আহৃত। মিত্রলাভ, সুহৃদ্‌ভেদ, বিগ্রহ ও সন্ধি - এই চারভাগে বিভক্ত *হিতোপদেশ*— এর গল্পগুলি মৌখিক পরম্পরায় বাহিত লোককথা হলেও এর সংকলক হিসেবে নারায়ণ নামে জনৈক ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়, যিনি নিজেকে রাজা ধবলচন্দ্রের সভাকবি হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন। ধবলচন্দ্রের ঐতিহাসিকত্ব আজও অনির্ণীত। কাজেই গ্রন্থ সংকলনের সময় নিয়েও বিতর্ক দানা বেঁধেছে। শুধু বলা যায়, *হিতোপদেশ পঞ্চতন্ত্র*-এর পরবর্তী সময়ে সংকলিত। এই গ্রন্থের প্রাচীনতম যে পুথিটি আবিষ্কৃত হয়েছে, তার তারিখ ১৩৭৩ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু এই পুথি তো মূল পুথির নকল কিংবা নকলের নকলও হতে পারে। এ থেকে কালনির্ণয় করা সম্ভব নয়। আবার অন্যমতে, ধবলচন্দ্র ১৩৭৩ খ্রিস্টাব্দের পূর্ববর্তী। সুতরাং তার পূর্বেই গ্রন্থটির উদ্ভবকাল। ভারততত্ত্ববিদ Witernitz *হিতোপদেশ*-এ 'ভট্টারকবার' শব্দটির উল্লেখ দেখে মন্তব্য করেছেন ৫০০ খ্রিস্টাব্দের পূর্ববর্তী ভারতীয় শিলালেখে এই শব্দটির প্রয়োগ নেই। সুতরাং, খ্রিস্টীয় নবম শতকের পর থেকে চতুর্দশ শতকের শেষার্ধের

মধ্যবর্তী কোনও এক সময়েই নারায়ণ শর্মার আবির্ভাবকাল। আবার, কেউ কেউ বলেছেন, তিনি চতুর্থ-পঞ্চম শতকের মানুষ।[৪] গবেষক A.N.D Haksar জানিয়েছেন :

It has been conjectured that the Hitopadesa was composed in eastern India. Its manuscripts have been found in Nagari, Newari and Bengali scripts. ...its origin during the last phase of the Pala empire. Which dominated eastern India at the turn of the millennium?[৫]

হিতোপদেশ-এর প্রস্তাবিকার কাহিনিটি *পঞ্চতন্ত্র*-এর আদলে তৈরি। পাটলিপুত্রের রাজা সুদর্শন তাঁর নিত্য-উন্মার্গগামী ও শাস্ত্রপাঠে বিমুখ ছেলেদের নীতিশাস্ত্রের জ্ঞান দিয়ে শিক্ষিত করে তোলার অভিপ্রায়ে পণ্ডিতদের সভা ডাকলেন। এমন কে আছেন যিনি রাজার অপোগণ্ড ছেলেদের শিক্ষিত করে তোলার দায়িত্ব নিতে পারেন? সভামধ্যে উপস্থিত সকল শাস্ত্রে সুপণ্ডিত বিষ্ণুশর্মা (অন্যমতে, নারায়ণ) সানন্দে রাজার ছেলেদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করলেন ঠিকই; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ করলেন এমন কতকগুলি বাক্য, যা কেবল রাজাকেই সন্তুষ্ট করেনা, সেই সঙ্গে সমাজের কেন্দ্রে থাকা প্রভু শ্রেণির হেজিমনিকেও স্পষ্টভাষায় চিহ্নিত করে। শত চেষ্টা করলেও যেমন বককে শুকপাখির মতো শেখানো যায় না কিংবা পদ্মরাগমণির খনিতে কাঁচের উদ্ভব হয়না, তেমনই রাজার বংশে কখনও গুণহীন পুত্র জন্ম নিতেই পারে না।[৬] এখানে বিশেষভাবে খেয়াল করবার বিষয় হল, রাজারে ছেলে গুণী হোক বা নির্গুণ, শিক্ষিত বা অজ্ঞান তাতে আদৌ কিছু যায় আসে না। আসল কথা হল, জন্মসূত্রে তারা 'রাজকুলের' প্রতিনিধি, অতএব 'রক্তেই' তদের অপার সম্ভাবনা। ছয়মাসের মধ্যেই তারা যে শাস্ত্রবিদ্যায় নিশ্চিত পারঙ্গম হয়ে উঠবে, এটা যেন একটা পূর্বনিরূপিত সত্য। শেখানোর আগেই পণ্ডিত কী এক আশ্চর্য উপায়ে জেনে গিয়েছেন যে রাজার ছেলেরা শিক্ষায় সফল হবেই! বুঝতে অসুবিধা হয়না, এই দৃঢ়নিশ্চয়তা কার্যত প্রতিষ্ঠানকে মান্য করে চলা এমন এক তোষণসর্বস্ব মনোভাব, যা চিরদিন রাজপণ্ডিতদের মতো উমেদার, চাটুকারবর্গকে ক্ষমতাতন্ত্রের অনুগত করে রাখে। কথামুখের এই অংশটি থেকেই *হিতোপদেশ* সংকলনের প্রকৃত 'ধাত' বুঝে নেওয়া যায়। *প্রাচীন ভারতে শূদ্র* (বাংলা অনুবাদ) গ্রন্থের ''রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও দাসবর্গ'' শীর্ষক অধ্যায়ে রামশরণ শর্মা দেখিয়েছেন যে, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র অনুসারে রাজার আসন ও অনুরূপ উচ্চ রাজপদগুলিকে উচ্চ তিনবর্ণের জন্য বিশেষভাবে সংরক্ষণ করা হতো। পরাক্রান্ত ও নীচ জাতির রাজার চেয়ে অভিজাত রাজাকেই লোকে দুর্বল হলেও স্বভাবতই মান্য করবে। অতএব রাজার মহাকুলীন হওয়া উচিত।[৭]

৩

হিতোপদেশ-এর গল্পগুলির অভ্যন্তরীণ গঠন-কাঠামো লক্ষ করলে এমন কতকগুলি প্রবণতা চিহ্নিত করা যাবে, যা মার্কসীয় পদ্ধতির নিরিখে লোককথায় প্রতিফলিত শ্রেণিচেতনার পূর্বপরিচিত বিন্যাসের (Pattern) সমধর্মী নয়। যেমন :

১। কাহিনীর অন্তিমে দুর্বলের জয় অনেকক্ষেত্রেই সম্ভব হয় নি। *পশুরাজের আহার, বাবুই ও বাঁদর, বাঁদরের রুটি ভাগ* প্রভৃতি গল্প এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

২। নিম্নবর্গের প্রতিনিধি চরিত্র (Subordinate class) কখনও তথাকথিত উচ্চবর্গের চরিত্রের (dominant class) প্রতি অনৈতিকভাবে আক্রমণাত্মক হয়েছে অথবা নির্বুদ্ধিতার কারণে (এমনকি আদর্শগত বা নীতিগত স্খলনের ফলেও) নিজের ভাগ্যবিপর্যয়ের পথ প্রশস্ত করেছে। উদাহরণস্বরূপ *নীলরঙা শেয়াল* এবং *বাঘের বুদ্ধি* গল্পদুটির কথা ভাবা যায়।

৩। লোককথায় শ্রেণিচেতনার প্রতিফলন প্রসঙ্গে সাধারণভাবে উচ্চবর্গের (dominant class) নিম্নবর্গকে (Subordinate class) শোষণের যে প্রক্রিয়া পরিদৃষ্ট হয়, আমাদের নির্বাচিত নীতিকথাগুলিতেও তার স্বরূপ কিছুটা ভিন্নরকমের। যেমন— *ইঁদুর যখন বাঘ, ধোপার গাধা, রাজা শূদ্র ও বীরবর, এক ব্রাহ্মণ ও তাঁর বেজি* প্রভৃতি গল্পের ক্ষেত্রে শ্রেণিশোষণের অন্যরূপ লক্ষ করা গেছে।

হিতোপদেশ-এর গল্পের সমাজ-পরিবেশ রাজতন্ত্র এবং সামন্ততন্ত্রের সময়কার। জনশ্রুতি অনুসারে, রাজা সুদর্শনের বালক পুত্রদের শিক্ষাদানার্থে মৌখিক পরম্পরায় প্রবাহিত এই ধরনের নীতিসম্বলিত ন্যারেটিভ কথা বলার ছলে (''কথাচ্ছলেন বালানাং নীতিস্তদিহ কথ্যতে'') পরিবেশিত হয়েছিল। সাধারণভাবে মনে করা হত এই নীতিমূলক কথামালা শিক্ষার্থীদের চরিত্রগঠনের উপযোগী হয়ে তদের 'হিতসাধন' করবে। যদিও এই 'হিতসাধনের' প্রসঙ্গটিকে ঘিরেই ব্যাসকূট তৈরি হয়েছে। এটা অনুমেয় 'হিতার্থে' পরিবেশিত হত বলেই সংকলন-ধৃত কথাগুলিকে *হিতোপদেশ*-এর গল্প বলা হয়। হিতোপদেশের সাধারণ অর্থ হিত বা মঙ্গলের জন্য প্রদেয় উপদেশ। এখন প্রশ্ন হল, এই হিত বা মঙ্গলের সঙ্গে কাদের সম্বন্ধ জড়িত, কী উপায়ে সেই হিতের ধারণাকে ফলবান করে তোলা সম্ভব এবং প্রদেয় উপদেশগুলি আদৌ সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের নির্বিশেষ হিতসাধনের পক্ষে কতখানি উপাদেয়? খুঁটিয়ে পড়লে এবং তলিয়ে ভাবলে দেখা যাবে অধিকাংশ গল্পের মধ্যে নীতির সমর্থন থাকলেও নীতিগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পরিকল্পিত হয়েছিলো উচ্চবর্গ তথা রাজন্যমণ্ডলীর স্বার্থপূরণ এবং অস্তিত্বরক্ষার প্রশ্নটিকে মাথায় রেখেই। যার ফলে আজকের শিক্ষার্থী তথা ভবিষ্যতের রাজা অথবা মন্ত্রী-সান্ত্রীরা (উচ্চবর্গের অন্যান্য অংশ) সমাজশাসনের প্রয়োজনীয় কৌশলগুলি (tricks) নীতিগতভাবেই আয়ত্ত করতে পারে। নীতিগুলিকে এমনভাবেই প্রতিটি গল্পে প্রয়োগ করা হয়েছে, যার ফলে নীতির প্রশ্নেই উচ্চবর্গ নিম্নবর্গকে সময় বিশেষে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। একথা ভুললে চলবে না, নীতি কিন্তু এক অর্থে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের (social control) হাতিয়ারও বটে। নীতিপ্রণেতারা একথা জানতেন বলেই রাজনতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক শক্তির মূলাধার (source) যে dominant class, তাদের হিতের সমর্থনেই গল্পগুলিতে নীতিনির্দেশনা করেছেন। তবে কোথাও কোথাও সাধারণ মনুষ্যসমাজের পক্ষে অপরিহার্য মহত্ত্বপূর্ণ নীতি-উপদেশগুলি গল্পে (*চার বন্ধু ও এক ব্যাধ, চালাকির খেসারত, হাতি ও খরগোশ*) অন্তঃশীল থেকেছে। এইসব ক্ষেত্রে বিশেষ কোনও শ্রেণির প্রতি পক্ষপাত নেই বললেই চলে। বলা বাহুল্য, শ্রেণি-নিরপেক্ষভাবেই এই নীতিগুলি কেন্দ্র-প্রান্ত নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের হিতসাধনের ফলপ্রসূ। তবে, নিশ্চয়ই সেটা প্রধান প্রবণতা নয়।

৪

আমাদের নির্বাচিত গল্পগুলিকে অন্তর্গত বৈশিষ্ট্যের নিরিখে কয়েকটি বর্গে বিভক্ত করা যেতে পারে :

যা-খুশি তাই করতে পারো / গায়ের জোরে রাখো মারো :

বেশ কিছু গল্পে সবল পক্ষ ("great tradition") দুর্বল পক্ষকে ("little tradition") নির্লজ্জভাবে গ্রাস করেছে।[৮] যেমন— *পশুরাজের আহার, বাঁদরের রুটি ভাগ, সাপের চালাকি, সিংহ ও বলদ* প্রভৃতি গল্পের কথা মনে পড়তে পারে। *পশুরাজের আহার*[৯] গল্পে কাক, শিয়াল ও বাঘের ঐক্যবদ্ধ চক্রান্তে dominant class-এর প্রতিনিধি পশুরাজ সিংহ [এক্ষেত্রে সিংহকে 'পশুরাজ' সম্বোধনের নেপথ্যবর্তী সত্যটি লক্ষ করার মতো। আমরা জানি, পশুপাখির রূপকের আড়ালে এ গল্প আসলে জীবনের কথা বলে, সমাজের শোষণের ছবি তুলে ধরে। স্বৈরাচারশাসিত রাজতান্ত্রিক আবহাওয়ায় পরিপুষ্ট বলেই কি ক্ষমতাবান শাসক শ্রেণির প্রতিভূ 'রাজা'র পরোক্ষ অভিব্যক্তি ঘটেছে। সিংহকে 'পশুরাজ' সম্বোধনে?] Subordinate class-এর প্রতিনিধি উটকে আহারে পরিণত করেছে। কাক, শিয়াল ও বাঘের অবস্থান এ গল্পে উচ্চবর্ণের সহায়ক শক্তি (helping power) হিসেবে। নিজেদের নিরাপত্তা রক্ষার কারণেই হোক অথবা স্বার্থপূরণের অভিপ্রায়েই হোক, এরা ক্ষুধার্ত পশুরাজকে প্ররোচিত করেছে আশ্রিত উটটিকে ভক্ষণের জন্য। পক্ষান্তরে, বিশ্বাসী উটটিও ভালো সাজার অভিপ্রায়ে বাঘ, কাক এবং শিয়ালের পাতা ফাঁদে (trap) পড়ে সিংহের গ্রাসে পরিণত হয়েছে। এখানে কাক, শিয়াল ও বাঘের চরিত্রে মার্কস-কথিত সুবিধাভোগী বুর্জোয়া (Bourgeoisie) মধ্যবিত্তের প্রতিবিম্বন দেখি, যাদের শ্রেণিগত অবস্থান উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের মধ্যবর্তী স্তরে হলেও অস্তিত্বরক্ষার তাগিদে এরা dominant class-এরই শ্রেণি-অভিমুখী। এরই ফলশ্রুতিতে কাহিনির অন্তিমে উটটি মারা যাবার পর পশুরাজ সিংহ তার মাংস দিয়ে ভোজন সারে আর কাক, শিয়াল ও বাঘ মাংসের উচ্ছিষ্ট পাওয়ার আশায় বসে থাকে। এ অংশটিও শাসকগোষ্ঠীর পদলেহনকারী মধ্যশ্রেণির তোষণসর্বস্ব মানসিকতাকে নির্লজ্জভাবে চিনিয়ে দেয়।

আবার *সিংহ ও বলদ*[১০] গল্পে পশুরাজ সিংহ (dominant class) তার দুই মন্ত্রী শিয়ালের উস্কানিমূলক প্ররোচনায় নিরীহ বলদের (Subordinate class) সঙ্গে অহেতুক সংগ্রামে জড়িয়ে পরিণামে মৃত্যুবরণ করেছে। এখানেও নিম্নবর্গের প্রতিনিধি বলদের মৃত্যুতে প্রভুশ্রেণির স্বার্থসংরক্ষণকারী সুবিধাভোগী মধ্যবিত্তের ভূমিকা কাজ করেছে। এই ধরনের শ্রেণিদ্বন্দ্বের (class-conflict) পরিস্থিতিতে মধ্যশ্রেণির চরিত্র শিয়ালের পক্ষ থেকে উচ্চবর্গীয় সিংহের প্রতি একধরনের শ্রেণি-সহযোগিতার (class-cooperation) মনোভাব লক্ষ করা যায়, যা একভাবে মধ্যবিত্তের শ্রেণিগত উর্ধ্বায়নের (upward mobility) আকাঙ্ক্ষাকে চিনিয়ে দেয়। অন্যদিকে, শিয়ালের এই সুবিধাজনক অবস্থানই অন্য অর্থে তাঁকে পরিণত করেছে বলদের শ্রেণিশত্রুতে।

বাঁদরের রুটি ভাগ[১১] গল্পে অপেক্ষাকৃত কম ক্ষমতাসম্পন্ন বেড়াল দুটি; যারা কার্যত 'low culture'-এর প্রতিভূ, অধিকতর ক্ষমতাবান বা তথাকথিত 'high culture'-এর প্রতিনিধি বাঁদরের দ্বারা প্রতারণামূলক উপায়ে পরাজিত হয়েছে। নিরীহ বেড়াল দুটি রুটির দুটি টুকরো সমানভাগে ভাগ করতে না পেরে বাঁদরের শরণাপন্ন হয় আর বাঁদরও এদের বোকা পেয়ে রুটি ভাগের ছলে ডান এবং বাম হাতের টুকরোদুটি সমান করবার নাম করে কামড়াতে কামড়াতে পুরোটাই সাবাড় করে ফেলে। একইভাবে *সাপের চালাকি*[১২] গল্পে মস্ত পোড়ো বাড়িতে একাকী বাসরত এক সাপ পুকুরপাড়ে গিয়ে ছল করে ব্যাঙের সঙ্গে বন্ধুত্ব জমায়। তার বন্ধুত্ব পাতাবার কৌশলটি এইরকম :

সাপ বলে তার মন খারাপের কারণ। এক ব্রাহ্মণের ছেলেকে সেদিন কামড়ে দিয়েছিল। ছেলে হারিয়ে শোকে পাগলের মতো হয়ে যায় ব্রাহ্মণ। অভিশাপ দেয় সাপকে। সাপের প্রিয় খাবার ব্যাং। সেই ব্যাং খাওয়াই এখন বারণ। ব্রাহ্মণ শাপ দিয়ে বলে দিয়েছে, ব্যাঙেদের বয়ে বেড়াতে হবে। ঘাড়ে মাথায় ঘুরে বেড়াবে। তবু তদের খাওয়া যাবে না।[১৩]

এই কথায় আশ্বস্ত হয়ে যেখানে যত ব্যাঙ ছিল সবাই ছুটে এসে সাপেড় ঘাড়ে, পিঠে এমনকি ফণার ওপর উঠেও নির্ভয়ে লাফাতে শুরু করে। এই মজার খেলা অনেকদিন চলার পর দেখা গেল পুকুরে ব্যাঙের সংখ্যা কমতে কমতে একটিও ব্যাঙ আর রইল না। এমনকি সাপ যাকে বন্ধু বলেছিল, শেষমেশ সেও গেল সাপেরই পেটে। এখানেও "litle tradition" ব্যাঙ "great tradition" সাপের কাছে নতি স্বীকার করেছে। বলা বাহুল্য, subordinate class-এর প্রতিবাদী স্বরগুলিকে দমন করার জন্য এ একধরনের রাজনৈতিক প্রতারণা (political conspiracy) ছাড়া অন্য কিছু নয়। একথা ঠিক যে, মার্কসীয় পদ্ধতিতে লোককথা বিশ্লেষণের পরিচিত ধরন অনুসারে কাহিনিগুলিতে সাব অলটার্নদের জয় সুনিশ্চিত হয়নি। ফলে লোককথার অন্তর্লোকে নিম্নবর্গের আকাঙ্ক্ষা পূরণের যে আভাস থাকে, তাও একপ্রকার খারিজ হয়ে গেছে। নীতিকথার সাধারণ ধর্ম হিসেবে এগুলিতে দুর্বৃত্তের সমালোচনা উঠে এসেছে ঠিকই, কিন্তু আদপে তা উচ্চবর্গের নির্মম শ্রেণিশোষণেরই বাস্তবানুগ উপস্থাপনা। সুতরাং লোককথা এসব ক্ষেত্রে যৌথ নির্জ্ঞানপ্রসূত কোনও শিল্প কিংবা বাস্তবের 'বিপরীত' নির্মাণ নয়, বরং বাস্তবের-ই সত্য এবং বিশ্বস্ত রূপায়ণ (true and faithful representation of reality) বলা যায়।

মস্ত-বড়োর লোভে শেষে / মস্ত ফাঁকি জোটে এসে :

এখানে 'দ্বন্দ্ব' (Conflict) যত বেশি না 'দুর্বল-সবলের' অথবা 'উচ্চবর্গের সঙ্গে নিম্নবর্গের', তার চেয়েও বেশি 'সৎ' বনাম 'অসৎ'-এর। শ্রেণি-উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষায় "little tradition" যখন অনৈতিকভাবে "great tradition"-এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে, তখন সর্বজনীন হিতের প্রশ্নেই কাহিনির অন্তর্কাঠামোয় subordinate class-এর পরাজয় হয়েছে কখনও কখনও দুর্বল পক্ষ নিজের শক্তির সীমাবদ্ধতা জানা সত্ত্বেও তা উল্লঙ্ঘন করবার প্রয়াস দেখিয়ে নিজেরাই পরাস্ত হয়েছে। যেমন, *বোকা কচ্ছপ*[১৪] গল্পে। এখানে বিপদকালীন পরিস্থিতিতে উত্তেজনা পরিহার করে ধীরস্থিরভাবে লক্ষ্যে পৌঁছোনোর আদর্শ উচ্চারিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, নীতির দিক থেকে এ শিক্ষাও প্রশংসনীয় এবং সমাজের পক্ষে হিতকারী।

নীলরঙা শেয়াল[১৫] গল্পে অপেক্ষাকৃত কম ক্ষমতাসম্পন্ন শেয়াল (little tradition) অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন পশুরাজ সিংহের (great tradition) কাছে পরাস্ত হয়েছে। আসলে নিজের শক্তির সীমা জানা সত্ত্বেও শেয়াল নীলরঙ গায়ে মেখে প্রতারণামূলক উপায়ে ভয়ঙ্কর জন্তু সেজে বাঘ, সিংহ প্রভৃতি বলবান পক্ষকে পর্যুদস্ত করতে গিয়ে নিজেই মৃত্যুবরণ করেছে। এ গল্পে শেয়ালের বাঘ, সিংহ সহ অন্যান্য পশুদের নিজের নিয়ন্ত্রণাধীন করার অভিপ্রায়ের মধ্যে নিম্নবর্গের ইচ্ছাপূরণের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু, আকাঙ্ক্ষাপূরণের পথটি একান্তভাবে অনৈতিক হওয়ায় নীতিবিগর্হিত কাজের ফল হিসেবে তাকে শাস্তি পেতে হয়েছে। আসলে দুর্বল

পক্ষ সবল পক্ষকে নিয়ন্ত্রণাধীন করে রাখার অভিপ্রায়ে যদি অসৎ পথ অবলম্বন করে, তবে নীতিগল্পে কখনোই তার সমর্থন মেলেনা। কারণ তাহলে নীতির মাধ্যমে সামাজিক পুনর্গঠনের প্রকল্পও ব্যাহত হতে বাধ্য।

বাঘের বুদ্ধি[১৬] গল্পেও দেখা যাচ্ছে লোভী পথিক (subordinate class) নিজের ক্ষমতার সীমা সম্পর্কে অবগত হয়েও বাঘের (dominant class) প্ররোচনায় ছলনার স্বীকার হয়ে তার গ্রাসে পরিণত হয়েছে। এখানে নিম্নবর্গের নীতিহীন লালসাপরায়ণতা সমালোচিত হয়েছে। সবলের হাতে দুর্বলের এহেন পরাজয় মর্মান্তিক হলেও নীতির প্রশ্নে তা সামাজিক হিতসাধনের অনুকূলবর্তী।

চিরদিন টানবে পিছে, চিরদিন রাখবে নীচে :

রাজা শূদ্রক ও বীরবর[১৭] গল্পে পরার্থে আত্মদানের মাহাত্ম্য ঘোষণা আছে ঠিকই, কিন্তু এর সমান্তরালে চলেছে শ্রেণিশোষণের এক অতিসূক্ষ্ম রাজনীতি। subordinate class-এর প্রতিনিধি বীরবর dominant class-এর প্রতিভূ রাজার প্রাণরক্ষার্থে নিজের স্ত্রী, সন্তান এমনকি নিজের প্রাণও বিসর্জন দিয়েছে। পদমর্যাদার দিক থেকে বীরবর রাজদরবারের সামান্য দ্বারী। রাজার এবং রাজমহলের সুরক্ষাকল্পে নিযুক্ত। শ্রেণি-অবস্থানের নিরিখে রাজার সঙ্গে বীরবরের আর্থ-সামাজিক ক্ষমতার যোজন দূরত্ব। অথচ রাজার প্রাণরক্ষার জন্য কেন সর্বমঙ্গলা দেবীর আদেশে বীরবরের পুত্র শক্তিধরকেই বলি দিতে হবে? পাঠকমনে এ প্রশ্ন জাগলেও জাগতে পারে; কিন্তু পাঠের চরিত্রদের মনে নৈব নৈব চ। অনুমান করা যায়, তেমন কোনও 'অস্বস্তি' হয়ত জেগেছিল 'অবচেতনে', কিন্তু প্রকাশ করতে পারেননি তারা। পারেননি ক্ষমতার ভয়ে, প্রতিষ্ঠানের প্রতি নিষ্প্রশ্ন আনুগত্য দেখানোর বাধ্যতামূলক শর্তে। অথবা হয়ত জাগেনি, কারণ উচ্চবর্গের 'ভালোর' জন্য, 'হিতের' জন্য, 'সুরক্ষার' জন্য নিম্নবর্গের মানুষ নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দেবে; এমনকি 'প্রণের বিনিময়ে' হলেও— 'আত্মত্যাগের' এমন একটা অলিখিত অঙ্গীকার সাবঅলটার্নদের শ্রেণিচৈতন্যে বদ্ধমূল বলেই তারা একে স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করেছে। আমরা এই প্রাণদানের সিদ্ধান্তকে 'নিম্নবর্গের স্বাভাবিক শ্রেণি-আচরণ' বলতে পারি, যা যুগ যুগ ধরে dominant class-এর হোমড়া-চোমড়াদের নেতৃত্বে subordinate মানুষদের মজ্জায় মজ্জায় চারিয়ে দেওয়া হয়েছে। একটা গোটা শ্রেণিকে বিশ্বাস করতে শেখানো হয়েছে তারা সর্বাবস্থাতেই 'অন্নদাতার' নিরাপত্তার জন্য বলিপ্রদত্ত। তা না হলে এত সহজে প্রাণত্যাগের সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব ছিল না। গল্পে একা শক্তিধর নয়, বীরবরের সম্পূর্ণ পরিবারটিই রাজার মৃত্যু আটকানোর জন্য প্রাণাহুতি দিয়েছে। রাজা শূদ্রকও বীরবরের এহেন আত্মদানে বিস্মিত হয়ে মৃত্যুবরণ করতে উদ্যত হয়েছেন আর এই বিন্দুতেই গল্পে লেগেছে অলৌকিকত্বের ছোঁয়া। সর্বমঙ্গলা দেবীর প্রসাদে মৃতদের পুনর্জীবনপ্রাপ্তিও ঘটেছে। শুধু এত কিছু ভালোর মধ্যে একটাই খটকা থেকে যায়— কেন "little tradition"-এর মানুষেরাই কেবল "great tradition"-এর হিতার্থে 'নির্দ্বিধায়' প্রাণোৎসর্গে প্রস্তুত থাকে অথবা দৈবনির্বন্ধে তাদের 'নৈতিকভাবে' প্রস্তুত করা হয়? এই প্রেক্ষিতে দেবীর অবস্থানও তীব্রভাবে রাজনৈতিক মনে হয়। তাঁর প্রদত্ত আদেশ বা নির্দেশগুলি স্বাভাবিক মানবধর্মকে যতই লঙ্ঘন করুক, তাতে উচ্চবর্গের লাভ হল কিনা, সেটাই একমাত্র বিবেচ্য। আসলে দেবীর মুখ দিয়ে বলিয়ে নিলে তাকে অমান্য করার আর কোনও প্রশ্নই ওঠেনা। তখন যে কোনও অ-মানবিক

সিদ্ধান্তও সাধারণজনের কাছে অবশ্য পালনীয় হয়ে ওঠে। রাজতন্ত্রের আমলে যে কোনও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানই যেভাবে রাজার পক্ষে রায় দেয়, এখানেও তেমনটাই ঘটেছে। এর একটি মোক্ষম দৃষ্টান্ত আছে গল্পের শেষে, যেখানে আরোগ্য লাভের পর রাজা বীরবর শূদ্রক ও তার পরিবারের প্রাণবিসর্জনের খবর পেয়ে নিজেও প্রাণত্যাগ করতে চেয়েছেন। আর তখনই দেবী আবির্ভূত হয়ে রাজাকে নিরস্ত করে শূদ্রক সহ তার পরিবারের প্রাণসঞ্জীবন করলেন। এমনটা কী মনে হয়না, রাজা নিজের প্রাণ উৎসর্গ করতে এলেন বলেই দেবীও রাজার প্রাণরক্ষণের স্বার্থে প্রকট হলেন। আচ্ছা, রাজা যদি আদৌ প্রাণ বিসর্জন দিতে না আসতেন, তাহলেও কী দেবী হিউম্যানিজমের পক্ষে থেকে কোনও নৈতিক অবস্থান নিতেন? শূদ্রকরা যখন আত্মাহুতি দিল, দেবী তো তখনও তাঁর লীলা প্রদর্শন করতে পারতেন। কিন্তু, তা তো তিনি করেন না। এর একটাই যুক্তি রাজার প্রাণ শূদ্রক ও তার পরিবারের চেয়ে অনেক বেশি 'মূল্যবান'। কাজেই, যে কোনও মূল্যে তাকে টিকিয়ে না রাখলে প্রতিষ্ঠানের ভিতটাই নড়বড়ে হয়ে যাবে! 'ধর্ম'-ও যে সময়ে সময়ে চরম রাজনৈতিক আচরণ করে শুধুমাত্র ক্ষমতা আর ব্যবস্থার স্বার্থে, এখানেই তার প্রমাণ মিলেছে। বলতে বাধা নেই, উচ্চবর্গের পারস্পেকটিভ থেকে এ কথার পরিকল্পনা বলেই বোধহয় নীতিদানের ছলে এমন 'কু'নীতিও প্রশ্রয় পেয়েছে। সুকুমারী ভট্টাচার্য তাঁর ''সংস্কৃত সাহিত্যে শূদ্র ও নারীর চিত্র'' প্রবন্ধে লিখেছেন :

> শূদ্রের ক্ষেত্রে ধর্মসূত্র থেকে ধর্মশাস্ত্র ও স্মৃতিগ্রন্থ পর্যন্ত সকলেই একবাক্যে বলেছে যে তার স্থান অন্য তিন বর্ণের নিচে এবং তার একমাত্র কর্তব্য হল সর্বতোভাবে এদের সেবা করা। পরবর্তীকালে জন্মান্তরবাদ ও কর্মবাদের দ্বারা এই মতকে দৃঢ় করা হয়েছে এই বলে যে পূর্বজন্মের দুষ্কৃতির ফলে শূদ্রজন্ম, এবং এজন্মে যথোপযুক্তভাবে দ্বিজসেবা করলে পরজন্মে সে উচ্চতর বর্ণে জন্মাবে; এজন্মে দ্বিজসেবায় ত্রুটি ঘটলে সে আরও হীন পশুযোনি প্রাপ্ত হবে। এইসব মত চালু থাকার ফলে শূদ্রের স্থান ছিল ত্রিবর্ণের পাদপীঠে। সব শূদ্র দাস নয়, শূদ্রদের মধ্যে অভাগ্যতর যারা তারাই দাস, অন্যরা বৃত্তিজীবী।[১৮]

এক ব্রাহ্মণ ও তাঁর বেজি[১৯] গল্পে নিম্নবর্গ তথা ক্ষুদ্রশক্তির প্রতীক বেজি উচ্চবর্গের প্রতিনিধি ব্রাহ্মণের অর্থহীন হঠকারিতায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। এক্ষেত্রে উপকারীর উপকারের প্রতিদানে (বেজি) উপকৃত ব্যক্তির (ব্রাহ্মণ) দ্বারা উপকারীর ভাগ্যেই (বেজি) সংকট ঘনিয়ে এসেছে। ব্রাহ্মণের নির্দেশমত বেজি নিদ্রিত সন্তানের নিরাপত্ত রক্ষার্থে কেউটে সাপটিকে হত্যা করলেও বিনিময়ে ব্রাহ্মণ অবিবেচকের মতই ভুল বুঝে তাকে হত্যা করেছে। এখানেও নিম্নবর্গের (subordinate class) প্রতি ক্ষমতাসীন উচ্চবর্গের (dominant clas) হঠকারিতা, অবিশ্বাস শোষণ-প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রতিভাত। আসলে নিজেদের খেয়ালখুশিমত ''great tradition'' ''little tradition''-কে পরিচালনা করে; 'ভরসা' তো করেই না, উপরন্তু মুহূর্তের উত্তেজনায় অকারণে 'হত্যা'ও করে— সমাজবাস্তবের এই নির্মম সত্য কাহিনির অন্তর্বয়নে প্রকাশমাধ্যম খুঁজে নিয়েছে।

ইঁদুর যখন বাঘ[২০] dominant class-এর প্রতিভূ মুনি subordinate class-এর প্রতিনিধি ইঁদুরটিকে প্রথমে বিড়াল, তারপর কুকুর এবং শেষে বাঘে পরিণত করে। কিন্তু বাঘরূপী ইঁদুর মুনিকেই হত্যা করতে উদ্যত হলে ক্ষমতাবান মুনি তাকে আবার ইঁদুরেই পর্যবসিত করে। গল্পে উচ্চবর্গের সঙ্গে নিম্নবর্গের শ্রেণিদ্বন্দ্বের চিত্রটি প্রতিফলিত হলেও ক্ষমতাপরায়ণ উচ্চবর্গ নিম্নবর্গকে তার উপযুক্ত সামাজিক স্থানটি চিনিয়ে দিয়েছে।

এখানে আর্থ-সামাজিক ক্ষমতার মূল চালকশক্তি উচ্চবর্গের দিক থেকে কথাটির পরিকল্পনা হয়েছে বলেই গল্পশেষে নীতিশিক্ষার দোহাই পেড়ে নিম্নশ্রেণিকে তার সমাজনির্দিষ্ট শ্রেণি-অবস্থানে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। উচ্চবর্গ ঠিক ততদিনই নিম্নবর্গকে উপরে উঠতে দেবে যতদিন dominant class-এর নিরাপত্তা বিঘ্নিত না হয়। শ্রেণিগত উর্ধ্বায়নের মাধ্যমে subordinate class-এর শ্রেণি-অবস্থান যখনই ত্বরান্বিত হয়ে dominant class-কে অতিক্রম অথবা অস্বীকার করতে চাইবে, তখনই তাদের পূর্বের অবস্থানে টেনে নামিয়ে আনা হবে। বলা বাহুল্য, এখানেও নীতির আড়ালে প্রচ্ছন্ন রয়েছে নিম্নবর্গকে উচ্চবর্ণের সমতুল্যতায় অথবা উচ্চতর অবস্থানে স্বীকৃতি না দেওয়ার পূর্বনির্ধারিত সামাজিক সিদ্ধান্ত। বর্ণবিভাজিত হিন্দুসমাজের কাঠামোর মৌল বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা প্রসঙ্গে এস. সি. দুবে তাঁর *ভারতীয় সমাজ* (*Indian Society*-এর বাংলা অনুবাদ) গ্রন্থের ''বৈচিত্র্য ও ঐক্য'' অধ্যায়ে জানাচ্ছেন :

প্রথমত, সনাতন হিন্দু সমাজ বিশ্বাস করত, সামাজিক অবস্থান পূর্বনির্ধারিত। সোজা কথায় এর অর্থ, কে কোন জাত-কুলে জন্মেছে, তাই তার সামাজিক অবস্থান নির্ধারণ করে দেবে। কর্মসূত্রে দক্ষতা অর্জন করলেও তা সামাজিক অবস্থানে তারতম্য ঘটাবে না। চেষ্টা করে সামাজিক অবস্থান উন্নত করার নিজর ছিল না তা নয়, তবে তা ব্যতিক্রমী ঘটনা। সমাজের উপরতলায় ওঠার পথ ছিল কঠিন ও গতি খুবই শ্লথ।

দ্বিতীয়ত, হিন্দুসমাজ পদমর্যাদা অনুসারে স্তরবিন্যস্ত ছিল। সামাজিক কাঠামোর মূল স্তরগুলি উপর থেকে নিচে চতুবর্ণের উপর দাঁড়িয়ে। এছাড়া বর্ণকাঠামোর বাইরে ছিল আর এক ধাপ। প্রতিটি বর্ণের মধ্যে আবার একাধিক জাতিবর্ণের স্তরভেদ ছিল, এখনও আছে। এছাড়া বহু জাতি পরে এই কাঠামোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। দেরিতে যুক্ত হওয়া জাতিগুলির আপেক্ষিক গুরুত্ব সম্পর্কে মতভেদ থাকলেও মূল চার বর্ণ স্তরের মধ্যেই তারা জায়গা করে নিয়েছে।[২১]

সমাজকাঠামোর এই শ্রেণিবিন্যাস আসলে এমন একটি আদর্শ মডেল কল্পনা, যেখানে মেধা ও বৃত্তির গুরুত্ব এবং তাদের মধ্যেকার অন্তরঙ্গ সম্পর্ক অনুযায়ী সমাজকে ভাগ করার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু সমাজব্যবস্থার জটিল বাস্তবচিত্রের প্রতিফলন তাতে ধরা পড়ে নি। যেমন, হিন্দু সমাজেরই অঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও অস্পৃশ্য জাতিদের চতুর্বর্ণের মধ্যে জায়গা হয়নি। তাছাড়া এমন উদাহরণও আছে, যেখানে একটা গোটা জাতি তার বর্ণ-নির্দিষ্ট সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী আচার-ধর্ম পালন না করায়, তাকে সমাজের নিচের তলায় নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই বর্ণবিভক্ত সমাজ-কাঠামোয় উচ্চবর্গের আধিপত্যবাদ নিম্নবর্ণের মানুষের সামাজিক অবস্থান, সমাজজীবনের বিশেষ ক্ষেত্রে কর্তব্য, আচার-আচরণ এবং প্রত্যাশিত সামাজিক ভূমিকাটুকু নির্দিষ্ট করে দেয়। বর্ণপ্রথার এই অপরিবর্তনীয় ব্যবস্থার জন্য নিম্নবর্গের পক্ষ থেকে কখনও কখনও হয়ত প্রতিবাদী অভিব্যক্তি ধরা পড়েছে, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সাবঅলটার্নদের সেই সব 'অন্যস্বর' (other voices)-কে দমিয়ে দেওয়া হয়েছে। ক্ষমতাসীন ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র ''great tradition' হিসেবে সমাজব্যবস্থায় অস্তিত্ববান যাবতীয় ''little tradition''-কে নির্মূল করতে চেয়েছে। কখনও হিতসাধনের ছলে, কখনও আবার কৃতঘ্নতার অপরাধে প্রতিবাদী সুবিধাবঞ্চিত নিম্নবর্গকে আখ্যা দেওয়া হয়েছে 'দুর্নীতিকারী', 'বিশ্বাসঘাতক' হিসেবে। নীচ কুলে জন্মমাত্রেই

ব্যক্তি হীনমতি, স্বার্থান্ধ এবং ক্ষমতালিপ্সু হয়ে থাকে; তাকে উচ্চপদের অধিকার দিলেও সে তার মর্যাদা রক্ষা করতে জানেনা—নিম্নবর্গের প্রতি এমন একটা স্থির অনড় মনোভাব সমাজমনে ছড়িয়ে দিলে dominant class-এর পক্ষে subordinate class-কে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সুবিধে হয় আর কী! এইসব আসলে অধীনস্থদের শাসনযন্ত্রের 'অভিমুখে' রাখবার, আরও বিশেষভাবে বললে তলায় থাকা মানুষদের চিরদিন 'অধীন' বানিয়ে রাখার বিশুদ্ধনীতির কৌশল। "little tradition"-কে সামাজিকভাবে ন্যুব্জ, বিকল করে দিয়ে তাদের নিয়ন্ত্রণের রাখার এই যে প্রভুত্বের ("Hegemony") দর্শন, এরই শৈল্পিক রূপায়ণ দেখি *ইঁদুর যখন বাঘ* গল্পে।

ধোপার গাধা গল্পে নিম্নবর্গের দুটি অংশ— গাধা এবং কুকুর। গল্পে গাধার প্রতি ধোপার সযত্ন পক্ষপাত কুকুরের মনে ধোপার প্রতি বিদ্বেষবিষ জাগিয়ে তুলেছে। ভারবহনকারী গাধা ধোপার স্বার্থরক্ষায় সহায়ক বলে সে মনিবের নেকনজরে পড়েছে। পক্ষান্তরে, কুকুরের ভাগ্যে আহার্যের উচ্ছিষ্ট বৈ আর তেমন কিছু জোটে না। অথচ রাত জেগে বাড়ি পাহারা দিতে তার পরিশ্রমও নেহাত কম হয় না। প্রাসঙ্গিক অংশটুকু উদ্ধারযোগ্য :

গাধা ধোপার সঙ্গে সঙ্গে থাকে, খাটুনিও খুব কম হয় না। মনিব সবই বোঝে। তাই তার যত্নআত্তিও করে। কুকুরটিকে কেউ-ই দেখতে পারেনা। ধোপার বউ এঁটোকাঁটা যা দেয়, তা-ই খেয়ে কোনোরকমে তার দিন কাটে। ...তার কথা কেউই ভাবে না। ওসব নিয়ে কুকুরের মনে রাগও আছে। দুঃখও আছে। কাউকেই সেসব বলেনা চেপে রাখে।[২২]

সম্পদের বিলিবণ্টনে অসাম্য যেমন শাসকের সঙ্গে শাসিতের সম্পর্কের অবনতি ঘটায়, তেমনি শাসিত পক্ষের এক অংশের সঙ্গে শাসকের সম্পর্কের আনুকূল্য অপর অংশকে শাসকবিরোধী আচরণে প্ররোচিত করে। ফলে ওই সুবিধাবঞ্চিত অংশেরও শাসকের স্বার্থরক্ষার কোনও দায় থাকে না। কুকুরের প্রতি মনিবের অবহেলা এবং অনাদর কুকুরকে প্রতিহিংসাপরায়ণ করে তুলে প্রকাশ্যে প্রভু ধোপার অধীন নিম্নবর্গের দুই অংশের (গাধা এবং কুকুর) মধ্যে পারস্পরিক প্রতিপক্ষতার আবহ তৈরি করেছে।

সিচ্যুয়েশন বা পরিস্থিতি এ গল্পের প্রধান নিয়ন্ত্রক। গভীর রাত্রে ধোপার বাড়িতে চোর চুরি করতে এলে কুকুর নিশ্চুপ থেকে কর্তব্যকর্মে অবহেলা করে গৃহস্বামীকে বিপদে ফেলতে চায়। তার সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে ঘটে চলা অসাম্যের যোগ্য জবাব দেওয়ার আদর্শ সময় এটাই— অন্তত তার অস্তিত্বের গুরুত্ব বুঝিয়ে দেওয়ার পক্ষে এর থেকে ভালো সময় সে আর পাবে না। এই মানসিকতা চালিত হয়েই কুকুর কার্যত তার নিজের কাজে অনীহা দেখিয়েছে এবং সচেতনভাবেই নিশ্চুপতা অবলম্বন করে ধোপাকে তার কৃতকর্মের ফল দিতে চেয়েছে। আর এখানেই নিম্নবর্গের অন্য অংশ গাধার সঙ্গে তার বিরোধের সূচনা। গাধার মতে মনিবের প্রতি তার যত রাগ-ই থাক না কেন, এভাবে প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ করাটা নৈতিকভাবে অনুচিত। কারণ প্রভুর স্বার্থরক্ষার পূর্বশর্ত মেনেই সে কাজে বহাল হয়েছিল। নিজের কর্তব্যপালনে কুকুরের এই অনীহা দেখে গাধা শেষমেশ ধোপাকে জাগানোর দায়িত্ব নিজের কাঁধেই তুলে নিল। গাধার এই সিদ্ধান্তে বাধা দিয়ে কুকুর তাকে সতর্ক করে বলে, "এমন কাজ করতে যেও না। যার কাজ তারই করা উচিত। আমার কাজ তুমি করতে গেলে বিপদ ঘটতে পারে।"[২৩] যদিও প্রভুর প্রতি দায়বদ্ধ গাধা কুকুরের সতর্কবাণীতে বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করে

না। প্রভুকে জাগানোর সৎ কর্তব্যপালনে সে বদ্ধপরিকর। তার বিকট গলার চ্যাঁচানিতে চোর পালাল বটে, কিন্তু সুখনিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটানোর অপরাধে উত্তেজিত মনিব গাধাকে পিটিয়ে মেরে ফেলল। এই গল্পে ঘটে চলা প্রতিটি ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়ার স্বতন্ত্র মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা পাঠের অন্তর্বয়ন থেকে তুলে আনা সম্ভব। যেমন,

ক. কার্যক্ষেত্রে কুকুরের নিশ্চুপতার কারণ হল তার প্রতি এতদিন ধরে মনিবের অসম এবং অন্যায্য ব্যবহার। আকাঙ্ক্ষার অপূরণজনিত বেদনায় কুকুর ধোপার প্রতি এই বিরুদ্ধতা দেখিয়েছে।

খ. মনিবের কৃপাধন্য এবং প্রসাদপুষ্ট গাধার কুকুরকে তার কাজ সম্বন্ধে সচেতন করে তোলার কারণ হল গাধা মনিবের ভালো-মন্দের ব্যাপারে সদা সতর্ক।

গ. ধোপার অকারণ উত্তেজনাবশে নিরীহ গাধাটিকে হত্যা করে ফেলার কারণ হল দ্বিবিধ :

প্রথমত, গাধার ডাক শুনে ধোপা আর গাধার বউ ভেবেছিল ক্ষুধার্ত গাধা আহার্যের জন্য এত রাতে প্রভুকে ডেকে তুলেছে। তার এই আচরণে তারা গাধার প্রতি যারপরনাই বিরক্ত হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত, বাড়িতে যে চোরের উপদ্রব হয়েছিল, এই ব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপে ধোপার অজানা ছিল। তার জেগে ওঠার আগেই চোর পালিয়ে গিয়েছিল। ফলে গাধার অসময়ের ডাকের অর্থবহতা সে অনুধাবনই করতে পরেনি। কুকুর যে ধোপাকে না ডেকে তুলে তার সঙ্গে একপ্রকার বিশ্বাসঘাতকতাই করেছে; সেটা পাঠকমাত্রেই জানেন, অথচ ধোপার তা অজানা। অন্যথায় এমন নৃশংস মৃত্যু গাধার নয়, কুকুরের ভাগ্যেই জুটত।

সাধারণভাবে গল্পটি থেকে যে নীতি নিষ্কাশন করা হয় তা গাধার অবস্থান সাপেক্ষ। গাধা কুকুরের কাজে হস্তক্ষেপ করেছিল বলেই পরিণামে তার মৃত্যু হয়েছে। অর্থাৎ এই গল্প সমাজকে এই শিক্ষা দেবে যে, অন্যের কাজে খবরদারি করলে তার ফল ভালো হয়না। কিন্তু, আমাদের প্রস্তাবে ধোপার গাধা গল্পটি নীতিশিক্ষার এই একমাত্রিক দৃষ্টিকোণটিকেই চিনিয়ে দেয়না। এর অর্থবোধ পাঠের অনেক গভীরে সম্প্রসারিত হয়েছে। বর্তমান পাঠটির পরিপ্রেক্ষিত বহুকৌণিক এবং ঘাত-প্রতিঘাতময় বলেই এর গহনে সমাজতত্ত্বের কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ইশারা খেয়াল করা যায়।

মার্কসীয় বীক্ষায় যিনি ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার কেন্দ্রে আসীন পুঁজিপতি, পুঁজিবাদ-পূর্ব সামাজিক ব্যবস্থায় (রাজতন্ত্র অথবা আধা-রাজতন্ত্র, আধা-সামন্ততন্ত্রের যুগে) তারই পূর্বরূপ প্রতিফলিত হয়েছে ধোপার মধ্যে। রাজা কিংবা সামন্তপ্রভুর প্রতিনিধি ধোপার শ্রেণি-অবস্থান এ গল্পে ক্ষমতার শীর্ষে অধিষ্ঠিত "great tradition"-এ। গাধা এবং কুকুর দু'জনেই এখানে উর্ধ্বতন শাসকের ক্ষমতাধীন এবং করতলগত। শাসক এদের যথেচ্ছ ব্যবহার করবে এবং এরা প্রতিনিয়ত শাসকের স্বার্থরক্ষায় ব্যবহৃত ও তার প্রতি নিষ্প্রশ্ন আনুগত্য প্রদর্শনে বাধ্য থাকবে— এটিই কার্যত "little tradition"-ভুক্ত গাধা এবং কুকুরের ভবিতব্য। কাজেই নিম্নবর্গ এখানে ব্যবহারকারী শাসকের প্রয়োজনে ব্যবহৃত দুই তরফেই এরা মনিবের স্বার্থরক্ষাকারী। নিহিতার্থে

তাদের স্টেটাস একই; তবু স্বার্থভোগী ধোপার হীন মূল্যবোধে দু'জনের কাজের মধ্যে একটা মাত্রাগত সূক্ষ্ম ফারাক প্রতিবিম্বিত হয়েছে। আর সেকারণেই দু'জনের প্রতি ধোপার আচরণগত পার্থক্য গল্পের অন্তর্কাঠামোয় একই শ্রেণির অন্তর্গত দুই পক্ষের মধ্যে একটা বৈষম্যের পরিবেশ তৈরি করেছে।

গাধার কাজের গুরুত্ব নিত্যনৈমিত্তিক বলেই স্বার্থসজাগ ধোপা তার প্রতিদিনের জীবনে সেই প্রয়োজনীয়তা সহজভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছে। তাই তার প্রতি বিশেষ খেয়াল দেখিয়েছে। অন্যদিকে, কুকুরের কাজের গুরুত্ব পরিস্থিতি-সাপেক্ষ। প্রতিদিন বাড়ি পাহারা দেওয়ার গুরুদায়িত্ব যদিও তার, তবু তেমন কোনও অঘটনা না ঘটলে তার ভূমিকার যথার্থতা প্রমাণ হয়না। ফলে, dominant class-এর স্বার্থপূরণের এই দড়িটানাটানি খেলায় কুকুরের পরাজয় তার প্রতি ধোপার যাবতীয় অনাদর এবং অবহেলার কারণ। বাড়িতে চোর ঢুকেছে জেনেও স্বেচ্ছায় নিঃশব্দ থেকে কুকুর বাহ্যত ধোপার ক্ষতিসাধনই করতে চেয়েছে। কিন্তু পাঠকমাত্রেই জানেন, এই নীরবতা আসলে এতদিন ধরে তার ওপর ধারাবাহিকভাবে ঘটে চলা অন্যায় আচরণের একটা যোগ্য উত্তর দেওয়ার চেষ্টা। উচ্চবর্গের খেয়ালখুশির উপকরণ হতে হতে তাদের পদতলে থেঁতলে যাওয়া অসহায় নিম্নবর্গের মানুষ হয়ত এভাবেই প্রতিবাদ, প্রতিরোধের জমি তৈরি করে। কুকুরের নৈঃশব্দপন্থা এখানে শাসকের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়ানোর একটা হাতিয়ার। একে যদি কালচার অব সাইলেন্স ভাবি, তাহলে পাঠের মর্মভেদ সম্ভব হবে না। এখানে subordinate class-এর প্রতিনিধি চরিত্র কুকুরের নিরুচ্চার অবস্থানের নেপথ্যে আকাঙ্ক্ষাপূরণের মনস্তত্ত্বের এক ঋজুরেখ চলনকে আবিষ্কার করা যায়, যা কিছুতেই অনৈতিক কোনও অবস্থান নয়, বরং এটাই উপদ্রুত সাবঅলটার্ণ-এর অস্তিত্ব জানান দেওয়ার একমাত্র মাধ্যম। এই নৈঃশব্দই তার প্রতিবাদের ভাষা। অনুমান করা যায়, একাজে সফল হলে পরদিন সকালে কুকুরের কপালে নিশ্চিত মৃত্যুই লেখা ছিল। কিন্তু সে ভবিষ্যতের তোয়াক্কা না করেই বর্তমানের ঝুঁকিটুকু নিয়েছিল। সেদিক থেকে প্রভুর শাসনক্ষমতার বিরুদ্ধে সাবভার্সন ঘটানোর এই চেষ্টা দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া বঞ্চিতজনের দুঃসাহসী পদক্ষেপ। শাসকের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার এই ইপ্সিত ভঙ্গিটুকু এভাবেই লোককথার অন্দরে মুখ লুকিয়ে থাকে।

অন্যদিকে, কুকুরের এই প্রতিশোধ প্রক্রিয়ায় বাধ সাধল নিম্নবর্গের আরেক প্রতিনিধি গাধা। ধোপা তার প্রতি দেখানো অতিরিক্ত যত্ন-আত্তিকে সে মনিবের মমতা ভেবে ভুল করল। নির্বোধ গাধা বুঝতেই পারলনা যে তার প্রতি মনিবের সহৃদয় আচরণ আসলে তাকে দিয়ে কাজ হাসিল করে নেওয়ার একটা সুবিধাজনক কৌশলমাত্র। অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক মালিকপক্ষ এভাবেই উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত কাঁচামালরূপ সাধারণজনদের নিজেদের প্রয়োজনে যথেচ্ছ কাজে লাগায়। উল্টোদিকে থাকা অসহায় দরিদ্র মানুষেরা বুঝতেই পারেনা যে কখন, কীভাবে তারা এই উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়ে চলেছে শুধু! শাসকের স্বার্থরক্ষার জাঁতাকলে ব্যবহৃত সহায়কের ভূমিকাটুকু ছাড়া এই চুনোপুঁটি কমনারদের অস্তিত্বের আর কোনও মূল্য নেই। এ গল্পে গাধার অবস্থান এই সর্বহারা কমনারদের দলেই, যারা কখনও কখনও সুচতুর শাসকের কাজ করিয়ে নেওয়ার ফন্দিকে তাদের কনসার্ন ভেবে ভুল করে। তাদের কাছে উচ্চবর্গের ছদ্মবেশ অনাবৃতই থেকে যায়, যতক্ষণ না পর্যন্ত চূড়ান্ত আঘাত নেমে আসে। ধোপা গাধাকে তোয়াজ করত বলেই হয়ত সে কুকুরকে ধোপার স্বার্থরক্ষার

অনুকূলে কাজ করার জন্য বারবার অনুরোধ করে। এক্ষেত্রে গাধা কুকুরের সমপর্যায়ভুক্ত হয়েও উচ্চবর্গের প্রতিনিধি ধোপার স্বার্থলোলুপ প্রতারণাবৃত্তিকে চিনতে পারে নি। ফলে গাধার আচরণও শাসকের সুরক্ষার্থে তারই শ্রেণি অভিমুখী হয়েছে। আর সেখানেই ঘটেছে বিপদ। উচ্চবর্গের শাসকের কাছে মধ্যরাতে গাধার উৎকট আওয়াজ তার পূর্বনির্ধারিত ভূমিকার সঙ্গে বেমানান ঠেকেছে বলেই গাধার চ্যাঁচানির পরিস্থিতিগত গুরুত্ব অনুধাবনে ধোপা ব্যর্থ হয়েছে। বরং গাধার অসময়ের চিৎকারকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে তাকে ধোপা তাকে হত্যা করেছে। এ থেকেই স্পষ্ট যে, dominant class-এর প্রতিভূ ধোপা তার পালিত পোষ্যদের কেবল নিজের কাজেই বহাল করেনি, একভাবে তাদের কাজের গণ্ডি বা সীমানাও বেঁধে দিয়েছে। ফলত ওই পূর্বনির্দিষ্ট কাজের একমাত্রিক ক্ষেত্রটুকু ছাড়া অন্য কোনও তাৎপর্যে বা নতুন কোনও চেহারায় শাসিতপক্ষের ভূমিকার মূল্যায়ন করার মতো মানসিক অবস্থাও নেই তাদের। আসলে নিম্নবর্ণের মানুষেরা শাসকের কাছে কার্যসিদ্ধির উপকরণ বলেই স্থিরনির্দিষ্ট কতকগুলি কাজের বাইরে তাদের আর অন্য কোনও অবস্থানকে শাসক স্বীকার করতেই চাননা। এর ফলে এদের যেমন খুশি কাজেও লাগানো যায়, আবার বিনা বাধায় মেরেও ফেলা যায়। এ গল্পে নিরপরাধ গাধার মৃত্যু শাসকের খেয়ালমাফিক শোষণের এক নির্মম সমাজসত্যকে মনে করিয়ে দেয়।

ধোপার শ্রেণি-অবস্থান এক্ষেত্রে স্বার্থপর নিষ্ঠুর শাসকের, যিনি অধীনস্থ প্রজাসাধারণকে শোষণের যন্ত্র হিসেবে যথেচ্ছ ব্যবহার করেন। কুকুর এবং গাধা দু'জনকেই তিনি ব্যবহার করেছেন নিজের স্বার্থপূরণের উদ্দেশ্যে। নিম্নবর্গের এই দুই অংশই গল্পে "great tradition"-এর দ্বারা ব্যবহৃত। শুধু তফাত হল, একপক্ষ শাসকের ক্রমিক অনাদর আর উপেক্ষা মেনে নিতে না পেরে শাসনক্ষমতার বিরুদ্ধে দ্রোহ দেখিয়েছে আর অন্যপক্ষ শাসকের সমর্থনে আচরণ করতে গিয়ে পরিণামে নিজের মৃত্যু ডেকে এনেছে। আমাদের প্রশ্ন, গাধার ভূমিকা যতখানি কুকুরের কাজে হস্তক্ষেপকারীর, ততখানি কী মালিক ধোপার স্বার্থরক্ষার সহায়কও নয়? গাধা কুকুরের কাজ নিজে সম্পাদন করে পরোক্ষে মনিবের উপকার সাধনই করতে চেয়েছিল। এক্ষেত্রে "great tradition"-এর প্রতিনিধি ধোপা "little tradition"-এর এক অংশের প্রতিনিধি গাধার সহায়কের ভূমিকাটিকে চিনতেই পারেনি, হয়ত চিনতে চায়ও নি। ফলে তার অনধিকার চর্চার অন্তরালবর্তী সত্যটিও ধোপার অজানা থেকে গেছে। অন্যদিকে, কুকুরের মনে যে প্রভুর বিরুদ্ধে এতদিন ধরে ক্ষোভ পুঞ্জিত হয়ে রয়েছে, প্রভু তার বিন্দুমাত্র আঁচও পান নি। রাতে বাড়ি পাহারা দেওয়া কুকুরের কাজ, তাই বাড়িতে কোনও অঘটন ঘটলে কুকুরই ডেকে তার জানান দেবে— কুকুরের প্রতি এই এক স্থির প্রত্যয় ধোপার মনে ছিল। কুকুর যে প্রভুর অন্যায় আচরণে বিতৃষ্ণ হয়ে তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্যই চোরের আগমন দেখেও নীরব থেকেছে এবং এ কাজ করে সে যে পরোক্ষে প্রভুর ক্ষতিই করতে চেয়েছে, সে সম্পর্কে ধোপার বিন্দুমাত্র ধারণা ছিলনা। এর কারণ ক্ষমতাবান শাসক (ধোপা) তার অধীন প্রজাসাধারণকে (গাধা এবং কুকুর) দুটি স্বতন্ত্র কাজে বহাল করেই নিশ্চিন্ত থাকে। উপরন্তু, ধোপার মতো ক্ষমতাবান শাসকশ্রেণির পাশে সর্বদাই গাধার মতো একদল মদতপুষ্ট উমেদার থাকে যারা নির্বোধের মতো বাস্তব পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়ন না করেই; এমনকি নিজেদের শ্রেণিস্বার্থ বিঘ্নিত করেও উচ্চবর্ণের মানুষকে সমর্থন দিয়েই যায়। আর এদেরই জন্যে চাপা পড়ে যায় শাসনব্যবস্থার প্রান্তে থাকা শোষিত মানুষের যাবতীয় প্রতিবাদী স্বর।

বিশিষ্ট ঐতিহাসিক রোমিলা থাপার তাঁর *পুরাকাল ও পক্ষপাত* (*The Past and Prejudice* গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ) গ্রন্থের ''তৃতীয় বক্তৃতা''-র একটি অংশে লিখছেন, ''জমির মালিকানা সংক্রান্ত তর্কের কেন্দ্রেই রয়েছে ব্যক্তিগত সম্পদ হিসেবে ভূমির প্রশ্ন। সরকার ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি বর্ণনা করতে গিয়ে প্রাচীন রচনাগুলি এমনই আন্দাজ দেয় যেন রাজতন্ত্র উদ্ভূত হয়েছিল সুরক্ষা ও আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য। পরবর্তী পর্যায়ে এতে যুক্ত হল একটি চুক্তির ধারণা— যেন মানুষ কর দেয় সুরক্ষা ও সুস্থিতির পরিবর্তে।''[২৪] আসলে রাজতন্ত্রই হোক বা সামন্ততন্ত্র— ক্ষমতাবৃত্তের যে কোনও প্রতিষ্ঠানই চায় কমনারদের চোখে ঠুলি পরিয়ে, কখনও বা নীতিপ্রণয়নের ছলে অধীনস্থ প্রজাদের শাসনতন্ত্রের অনুবর্তী করে রাখতে। Raymond Williams তাঁর *Marxism and Literature* গ্রন্থের "Hegemonoy (Cultural Theory)" শীর্ষক অধ্যায় এই জাতীয় 'hegemony'-কে দেখেছেন 'lived hegemony' বা যাপিত আধিপত্যরূপে। প্রভুত্ববাদ এক্ষেত্রে একটি সতত চলমান প্রক্রিয়া, এক সর্বব্যাপী নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা, যার অন্ধি-সন্ধি, ঘাঁত-ঘোঁত বহুবিস্তারী— "... it does not just passively exist as a form of dominance. It has continually to be renewed, recreated, defended and modified."[২৫]

৫

সাহিত্য সময়ের জাতক। কাজেই সময় এবং সমাজের প্রতিবিম্বায়ন সাহিত্যে একভাবে ঘটেই চলে। দেশে দেশে কালে কালে এই পরম্পরা অব্যাহত। পরিপার্শ্বে যা ঘটে চলেছে তার হুবহু মুদ্রণই যে সাহিত্যখণ্ডে প্রতিনিয়ত হচ্ছে, এমন নয়। কখনও কখনও যা হওয়া উচিত, কিন্তু সমকালীন ব্যবস্থায় আশ্চর্যজনকভাবে যা অনুপস্থিত, সেইসব আকাঙ্ক্ষিত স্বরগুলিও সাহিত্যের আধারে স্থান পায়। যে সমাজে প্রান্তীয় মানুষের প্রতি কেন্দ্রের তাচ্ছিল্য, অবজ্ঞা, অনাদর একটি পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধনীতি, সেই সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠের মূল্যবোধ যে অনুরূপ খাতেই বইবে, এতে আর আশ্চর্য কী? সুতরাং সাহিত্যখণ্ডে তার প্রতিফলন স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত সমাজচিত্রের ছকটা নির্ণীত হয় শাস্ত্র সমাজকে যে অনুশাসন দেয় তার দ্বারা। অবশ্যই সাহিত্যপ্রণেতার (তিনি সংকলক কিংবা রচয়িতা যেই হোন না কেন) স্বাধীনতা আছে এ কাঠামো অতিক্রম করবার, শোষিত, উৎপীড়িত মানুষের জয়ের স্বপ্ন দেখবার, নির্দিষ্ট সামাজিক অনুশাসন বা পরাম্পরাক্রমে আগত কাঠামোর সমালোচনা করবার। সীমিত এই স্বাধীনতা *হিতোপদেশ*-এর গল্পে কখনও কখনও দেখা গেছে, কিন্তু মোটের ওপর কথাগুলি সামাজিক নিয়মকে লঙ্ঘন করেনি, বরং 'হিতকথা' শোনাবার মুখোশ পরে সামাজিক নীতিসূত্রগুলিকেই পরোক্ষে প্রতিষ্ঠিত করেছে মাত্র।

ঋণস্বীকার : সম্পূর্ণ লেখাটি টাইপ করে দিয়ে আমার শ্রম লাঘব করেছেন রিমঝিম (রিয়া) মহাপাত্র। ওর সঙ্গে সম্পর্ক ধন্যবাদ জ্ঞাপনের নয়। ওর জন্য রইল অনেক অনেক ভালোবাসা আর শুভকামনা।

উল্লেখমূল :

১। মযহারুল ইসলাম, *ফোকলোর পরিচিতি ও পঠন পাঠন,* ঢাকা : অবসর, ২০১২, পৃ. ৩৯।
২। *ইশপের গল্প সমগ্র,* সম্পা, নরেশচন্দ্র জানা, কলকাতা : শিশু সাহিত্য সংসদ, ২০১৫, পৃ. অনুল্লিখিত (ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।

৩। আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোক-সাহিত্য* (১ম খণ্ড), কলিকাতা (= কলকাতা) : ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৬২, পৃ. ৪৭০-৭২।

৪। দিব্যজ্যোতি মজুমদার, *লোককথা,* কলকাতা : লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী কেন্দ্র, ১৯৯৮, পৃ. ৯৯-১০০।

৫। Narayana. *hitopadesh.* Translated from the Sanskrit with an introduction by A.N.D. Haksar. *The Hitopadesh.* New Delhi : Penguin Books, 1998, p. 3.

৬। রাজা সুদর্শনের পুত্রদের শিক্ষাপ্রদানের দায়িত্বগ্রহণ পর্বে বিষ্ণুশর্মা যেভাবে স্তুতি আওড়ে রাজাকে আশ্বস্ত করেছেন, একে শ্রেণি-তোষণেরই নির্লজ্জ দৃষ্টান্ত বলা চলে। ''নাদ্রব্যে নিহিতা কাচিত্ ক্রিয়া ফলবতী ভবেত্। / ন ব্যাপারশতেনাপি শুকবত্ পাঠ্যতে বকঃ।। / অসিংস্তু নির্গুণং গোত্র নাপত্যমুপজায়তে আকরে পদ্মরাগাণাং জন্ম কাচমনেঃ কৃতঃ।'' দ্রষ্টব্য :

Vishnusarma. *Hitopadesh.* Ed. with Beng. and Eng. Trans. *The Hitopadesha : A collection of Fables and Tales in Sanskrit.* Calcutta (now Kolkata) : Sastraprakasha Press, Sobhabazar Street, 1830, p. 16.

৭। রামশরণ শর্মা, *Sudras in Ancient India : A social History of the lower Order Down to Circa AD 600*, সম্পা, রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, *প্রাচীন ভারতে শূদ্র : আনুমানিক ৬০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত নিম্নতর বর্গের সামাজিক ইতিহাস* (শিবেশকুমার চট্টোপাধ্যায়, সৌমিত্র পালিত, স্নেহোৎপল দত্ত অনূদিত), কলকাতা : কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৮৯, পৃ. ১৫৮।

৮। "In a civilization there is a great tradition of the reflective view, and there is a little tradition of the largely unreflective many." দ্রষ্টব্য :

Redfield, Robert. *Peasant Society and Culture.* U.S.A. : The University of Chicago Press, 1958, p.70.

৯। *হিতোপদেশের গল্প,* সম্পা, উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, কলকাতা : পারুল প্রকাশনী, ২০১৩, পৃ. ৯-১১।

১০। তদেব, পৃ. ৩৯-৪০।

১১। তদেব, পৃ. ২০-২১।

১২। তদেব, পৃ. ৩২-৩৩।

১৩। তদেব, পৃ. ৩৩।

১৪। তদেব, পৃ. ১০-১২।

১৫। তদেব, পৃ. ৩০-৩১।

১৬। তদেব, পৃ. ২২-২৩।

১৭। তদেব, পৃ. ৩৬-৩৮।

১৮। সুকুমারী ভট্টাচার্য, *Women and Society in Ancient India,* বিজয়া গোস্বামী, নীলাঞ্জনা শিকদার দত্ত, করুণাসিন্ধু দাস অনূদিত, *প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ,* কলকাতা : ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ১৮৪।

১৯। পূর্বোক্ত, *হিতোপদেশের গল্প,* পৃ. ২৪-২৫।
২০। তদেব, পৃ. ৩২৮-২৯।
২১। এস সি. দুবে, *Indian Society*, রজত রায় অনূদিত, *ভারতীয় সমাজ,* নদাদিল্লি : ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ২০১৪, পৃ. ৩৯।
২২। পূর্বোক্ত, *হিতোপদেশের গল্প,* পৃ. ৩।
২৩। তদেব, পৃ. ৫।
২৪। রোমিলা থাপার, *The Past and Prejudice*, অনুরাদা রায় অনূদিত, *পুরাকাল ও পক্ষপাত,* নয়াদিল্লি : ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ২০১৭, পৃ. ৫১।
২৫। Willams, Raymond. *Marxism and Literature.* New York : Oxford University Press, 1977, p. 112.

GLO(B/C)ALIZATION OF ENGLISH : Aবঙ্গ-INDIAN PERSPECTIVE

Arup Kumar Bag
M.Phil ,Research scholar of Department of English
University of Calcutta
bagarupkumar1995.ab1@gmail.com

ABSTRACT

English Language has created a unique identity of its own . With the Globalization taking place all over the world, English has secured a prestigious position. From the very beginning, it was seen to be a language of the Rulers. With the decolonization , however , people haven't rejected the use of this global language . Rather , they have created a variety of its own out of its use through different times and spaces . In the process what has happened , is that , English has been used both globally and locally by the inhabitants . And in that way , they have paved the way for **'Glocalization'** of English ; a term that has been much talked about in recent scenario . This paper of mine is written with a purpose to identify the possible reasons of this process and to identify the ways of it . 'Why it has happened' , 'How it has happened' and 'What could be the possible outcomes of this process' , are the areas to be introduced and addressed in this paper .

Key Words : Globalization – Glocalization – Phonological Variations – Code-Mixing – Switching –E-Sources and Social Media – Emoji and Idiolect .

'Globalization' , so far as the term is concerned , has gained much popularity among the learners as well as among the teachers . English is being used worldwide , and it is the result of Globalization, there is no doubt about it . English is the most commonly spoken language in the world and is associated with the officials of India. It is the language of Science, Aviation , Computer , Diplomacy , Library and so on . As English paves the way for job opportunities , that's why its 'market' value as a subject cannot be denied . English is the official language of almost fifty three countries including – England , Australia , South Africa, Grenada and so on . It is also the state language of Tripura, Manipur and Mizoram (Ghosh T.) . As Decolonisation proceeded throughout the British Empire in the 1950s and 1960s , former colonies often continued to use it as independent countries setting their own language policies . In India , a commission was formed under the able leadership of S. Radhakrishnan in 1948-49 which was called Radhakrishnan Commission or University Education Commission . This is the first education commission that put stress on learning English as a compulsory language under the "Three-Language Formula" policy . The use of English as a global language has earned it a universal status . However , under the veil of this popularized phrase , the 'other' system of this process has been suppressed . We all can hardly ignore the colonial political reasons behind it for which English has gained this identity . Similarly, it is also cannot be neglected that a global

language like English has also been localized . As 'Reconstruction' is an unnamed underlying process of 'Deconstruction' , similarly , 'Globalization ' is an underlying process of 'Glocalization' . They are the two sides of the same coin , one of which , if neglected , will create a gap for the understanding of language as a system. . The term 'Glocalization' has its roots in the Japanese term 'dochakuku' which first appeared in a late 1980s publication of the *Harvard Business Review*(Sharma) However , Roland Robertson , a notable sociologist , in a conference on "Globalization and Indigenous Culture " in 1997 first used the term and stated that :

" Glocalization means the simultaneity – the co presence of both universalizing and particularizing tendencies" (Robertson 100). By using English globally , we have already mixed a lot of tendencies . And by doing so , we have created , though unknowingly , a lot of varieties of English(for Example- Indian English, American English etc). In this case it can be noted that , creating varieties and localizing the language is not confined to any space or nation only [e.g. the Indian English] . There can also be several other varieties within the socio-cultural scenario that has been produced either by a particular section of the community , or by a 'canonized' individual.

Today we talk about English as a second language , and we have different theories to focus on . But we must not forget that English was first introduced as a Foreign Language in 16th Century Mughal Period by East-India Company . At that time , English was used by British for the trading purpose only . Surely the Indian community didn't share the same language with them as Persian and Afghani languages were mostly used by the community . What may have happened in that situation is that a sort of Pidgin was created [Pidgin is a language which evolves in a situation where the communities do not share each other's language ; it is a grammatically simplified means of communication] where a mixing among the other lingual system is possible . And it is undoubtedly that point when the first process of Glocalization took place , though it was neither labelled under the preferred term at that time , nor it lasted . It is because the status of English language underwent a massive change in the 18th century when British finally established their rule in India . At that time , it no longer remained a trade-language . British found it difficult to communicate as Indians could not understand English ; they did not have the knowledge about it . It was only when English became an administrative language under British rule, Indians began to use English as a link language and thus , the process of Glocalization resumed .

When a Pidgin gets its establishment , gradually it is developed through some levels where finally a Creole is identified . The process is so silent that the conscious experiments would not see this . Unlike Pidgin , Creole has a complete identity with its own vocabulary and grammar, and most importantly it is shared by a community where the children use this as their native language . This is the crucial point where on can surely understand that 'Indian English' – the variety that has been talked much , can be traced as a Pidgin , but surely not as a Creole as it doesn't fulfil the basic criteria . English is not used by any child in India as his/her native language and that is the possible reason may be that the 'acquisition' of English as second

language (SLA) in a multilingual country like India , has to face more challenges . In case of West Bengal , Bangla culture has always been very kind in adopting the traditions of West . After the battle of Plassey taking place in 1757 , Kolkata [the then Calcutta] was chosen as the capital of British India . We do not know , how Glocalization has devastated the use of a good many Bangla and Hindi phrases , as Rituparno Ghosh , the famous film expert points out :

" পেয়ালা , পিরিচ [Spitton], দেরাজ , কুর্সি ধীরেধীরে রেকাপ -প্লেট, ড্রয়ার –

চেয়ারের কাছে বিনম্র কুর্নিশ [Obeisance] করে বিদায় নিল। " (80).

As Mr. Ghosh has pointed out very clearly , that the gradual use of English word and phrases has made the process too smooth to operate . As a result , we can see that we use at least 20% English in every single sentence conversation in any language . Ask yourself to speak pure Hindi or Bangla for a couple of minutes without using English , and you will find yourself stuck within the vast lack of expression . The process of Glocalization has taken place through this often-usage of English within other language system through code-switching and code-mixing . Code-Mixing refers to the mixing of two or more languages or language varieties . Some people use Code-Mixing and Code-Switching interchangeably and in particular cases with multilingual speakers , the reference of code-mixing is found more . For example , in Hindi , we often use 'पासबालिbuilding '[Nearest building] , ' किरायेकाroom ' [The rented room] and so on . Being a native speaker of Bangla , citing more Bangla-English mixing is more easier . For example – 'বাংলাcalendar', 'Pen –এর কালি' ,'Torch-এর আলো' , 'Chair-এর হাতল' , 'Missকরছি', 'Ready হও' , 'Scent – এর গন্ধ', 'Diary-র পাতা'and so on .We often find ourselves in a mid-situation where we don't know the exact Bangla or Hindi phrasing of certain words and have to rely on English (for example , 'Romance') , or in other cases where we know the Bangla word but don't know the exact English phrasing (for example , ' থই ') . What happens in between is that people are found often switching from one language to English (for example , the famous Pepsi ad , 'Ye dil mange more ') and vice versa , and thus both the processes – i.e. Globalization and localization take place simultaneously . The more common switches are the contribution of Hindi daily-soaps and also the Bollywood Film Industry where these switches are very much recurrent .

Each and every language has a hierarchal structure and the analysis are mostly done in the hierarchal way (so far as Modern Grammar is concerned). And among them , one of the very basic and important level is 'Sound' or Phonetics and Phonology . The Indianization of English has not been done only through its use in different spheres but also its discursive pronunciations . For example , 'Forest' has been pronounced by most of the Indians with an /e/ [as in 'Pen'] sound as they try to locate the phonological vowel in terms of its orthographical spelling . But in reality , according to British English Phonetics , it is 'Forist ' [/ f ɒ r i: s t /] (Jones 194) . What is more unfortunate about this case , is that if you try to pronounce it according to British phonology , then people will recognize you either as a mad or a pedant. We all know that in British English , the word final 'r ' [/r/] is not pronounced but in most of the cases the Indians have the tendency to pronounce it with an extra emphasis . A word like 'Container' to Indians is

not /kən t ei n ə/ [Jones 107] but /k ׀ ׀n t e n ׀ ׀ r / . I can understand that for an ordinary reader these phonemic transcriptions seem alien but one can surely notice in this particular example that the orthographic 'O' should not necessarily be pronounced as a phonetic / ⌶ / . The Schwa vowel[/ ə /] (as in 'earth') has a very prominent place in British English Phonology and that is why the Indianization of the sound makes people more disabled in pronouncing the Standard English . So far as typical Bengali pronunciation is concerned , Bengali people have mastered the British English pronunciation in their own way , and that is why 'Safety pin ' is always 'Septipin' , 'Exhaust Fan ' is always ' Egjost Fan' , 'Asbestos' is always 'Azbestar' and ' Pliers' is always ' Plus' to them . These Indianization of the regular words have taken place due to two reasons mainly –as , most Indians do not have a proper knowledge of the Phonetics system , and , as most of them try to locate English pronunciation in respect to their native language .

Today , we live in a society where almost everything can be done digitally or electronically . I wonder , one day will come , when people will eat electronically as well . So far as Glocalization is concerned , one of the very facts cannot be ignored that the language used in social and electronic media has widened the process of localization . How language has been used 'locally' can be best traced through the language we use in Facebook , WhatsApp , Twitter and other social-networking sites through electronic media or text-messaging . Examples drawn from conversations would be helpful in this case . For example , if you want to say that today you don't want to go to school because you are sick , the expression for this would be – "Ami ajke schoole jabona . Amar sorir kharap." Now , the first thing one may notice , is that , the language that is used for communication is Bangla but the letter used are of English . The Sender here uses English orthographic letters to convey a message in Bangla . But the whole of it is still not in Bangla , as one can see this as my second point which I have already talked about – that we do not use any pure language for communication . If it were so , then the 'School' should have been 'Bidyaloy'. Thirdly , the exact orthographic representation is also not done because 'S' of English mostly correspond to 'স' of Bangla and that is why 'Sorir'(সরীর) should be 'Shorir'(শরীর) . One may find these examples to be very colloquial but one must remember at this point that Glocalization takes place through day-to-day life communication . That is why these common life examples are chosen so as to portray how these process works .

The use of English through these orthography has gone in a very wrong way also as I have noticed some of my friends using the poorest form of this localization . As personal messages and chats are very strong examples but at the same time very confidential , that is why I cannot use any picture or screenshots in this paper . But the examples I will introduce here surely can be related to by the readers . Use of Bangla language with English orthography has introduced many hybrid abbreviations which I name as "Compunction" . These are not abbreviations , rather a deformed representation, like – 'Exm' for Examination , 'Gd' for Good , 'Mr9' for Morning , ' N8' for night , 'Nun' for Noon , 'T4r' for teacher , 'Plz' for please and so on . So , if one wants to express : "আমি আজকেExam দেবোনা , আমার mood নেই. Good Night ", then the message will look like : " Ami ajke exm dbona , amr mud nei . Gd n8." In a pilot survey done according to the use of these poor localized form based on WhatsApp conversation , it is found that mostly

these sort of variations are used among 14-30 age group people . Which means that unfortunately the young generations are the ones who on one hand accepts globalization and modern education , and on the other, flout the socio-cultural norms established for language use. Modern Linguistics has certain assumptions and one of which is that no language is good or bad or right or wrong ; rather it is the matter of acceptance – whether it is accepted or not by others in the society is a matter that is more important .

One of the very reasons of Glocalization can also be attributed to 'Idiolect' as well . 'Idio' means individual , and 'lect' means language . Thus , Idiolect specifically means the individual variety of language that has been used in socio-literary sphere . The term can be primarily attributed to the authors whose use of language through his/her characters create an identity for him . LalmohanGanguly , alias Jatayu, a fictional character created by Satyajit Ray , has used so many variations in his conversations to attach a silent comic with his dialogues . For example , 'নারায়নীরৌপমুদ্রাস' and ' কেলেঙ্কারিous' are two examples of this process that has been used by him in his novel *Royal Bengal Rahashya* the film version of which was released in 2011 by his son Sandip Ray . Similarly , the word 'Horrendous' was used by Satyajit Ray in his short story " Feludar Goendagiri" but whether any such term has any epistemological orientation in British English Dictionary prior to Ray or not is an area of research. The word is basically a hybrid as Ray puts it:

" 'Horrendous' বলে আসলে কোনো কথা নেই। 'Tremendous'মানে সাংঘাতিক , আর 'Horrible'মানে বীভৎস। এই দুটো এক সঙ্গে বোঝাতে নাকি কেউ কেউ ' Horrendous' ব্যাবহারকরে। " (Ray).

These are very common variations that are popularized under Glocalization. The American forms –'gonna' for going to , 'Yeah' for Yes , 'Nah'for No etc. Are also some examples that are glocalized not only within the territory of US but also in India as well . One of the reasons of this universal phenomena can also be attributed to the use of 'Emoji' as well that we get to see in different social sites . What are these 'Emojis' ? The Emojis are nothing but a consolidated representation of different meanings . It is highly pragmatic in a sense because now a days it is also thought to be a 'paralanguage' that can be used in teaching grammar and vocabulary in classrooms , as my learned friend Nirajana Bardhan puts it :

" With the ever-increasing popularity of the social media , the digital natives [...] of the 21st century have taken a great leap in communication and gradually started preferring non-verbal digital communication to be traditional verbal communication . Consequently , emoji has taken the role of almost paralanguage that has extended its range in various fields of modern life – from social media to even ESL classrooms. " (Bardhan 3) .

All the humanly emotions and the language have been consolidated and substituted through emojis . The language that has been used in conversation has become visual signs through which the coded message can be transmitted .

Glocalization is a worldwide process and a topic for research where all the tentative arguments can be inconclusive. The use of English globally has earned the language a universal

importance. As I have already mentioned , that the Modern assumptions of Linguistics does not focus on which one is 'good' or 'bad' language because we do not know who the authority is ; who sets the parameters . That is why the learners must be aware of the variations and they must not intermingle these variations. If anyone writes an answer in American English , then that should be accepted on the ground that the learner is aware of the variations . One of the crucial facts about this process is that in some way, it hampers the process of acquisition of Second Language . The spontaneous production of language can only take place if it is operated from the Acquired System , as Stephen Krashen , the notable linguist claims : "Our ability to produce utterances in another language comes from our acquired competence , from our subconscious knowledge ."(Krashen). It is true that in some extent localization of language has made the language production fluent , but whether it is spontaneous or not and can we at all call this a 'language' production or not , is a thing can be contested. One can only hope for a day in future where the use of English, both globally and locally, will be accepted , only linguistically where there won't be any domain of operating any power-structure .

Works Cited

Bardhan , Nirajana . "Popular Culture in an ESL classroom : Teaching English Grammar and Vocabulary Through Emoji."*International Journal of English Language , Literature in Humanities.*Volume 7 , Issue 5 . May 2019. Web. 22 June 2019. https://www.ijellh.com/OJS/index.php/OJS/article/view/8446/7035.

Ghosh , Rituparno.*First Person* . Vol. 1. Ed. NilaBandyopadhyay . Kolkata : Dey's Publishing , 2013 . Print .

Ghosh , Tanmay . "Language Acquisition Vs. Language Learning." Faculty Development Programme on Linguistics and ELT. Department of English , Bhawanipore Education Society College . 29 oct 2018. Seminar-Lecture .

Jones , Daniel. *Cambridge English Pronouncing Dictionary* . Eds. Peter Roach , Jane Setter and John Esling . 18th Edition. India : Cambridge University Press , 2011. Print.

Krashen , Stephen D. *The Input Hypothesis :Issues and Implications* . London : Longman Group UK Ltd. , 1985 . Print .

Ray , Satyajit . "FeludarGoendagiri." *Sunday Suspense* . *Mirchi Bangla* . 20 Mar 2018 . Youtube. https://youtu.be/OSh_TkJF6zQ.

---. *Royal Bengal Rahasya.* Perf. Sabyasachi Chakraborty , Bibhu Bhattacharya , Saheb Bhattacharya and others . Shri VenkateshFilm , 2011 . Film-Youtube . https://youtu.be/k4wldgd41Vg.

Robertson , Roland. "What is Glocalization?". *Searchcio.techtarget.com.* 03 Sept 2013 . Web. 23 June 2019. https://en.wikipedia.org/wiki/Glocalization. .

Ramanir Kartavya: Exploring 19th Century 'Women's Question' through Conduct Books

Nibedita Paul
Research Scholar
Centre for Comparative Literature and Translation Studies
Central University of Gujarat, Gandhinagar
nnibeeditapaul@gmail.com

Abstract:

The study intends to probe into the much argued domain of the 19th century 'women's question' with the prime focus being on Bengal. The theme being an expansive field of research would be limited to the analysis of the domestic manual, *Ramanir Kartavya* (Duties of Women), by Giribala and Jaykrishna Mitra which was published in 1890 and translated by Judith Walsh in her anthology in 2005. The outpouring focus on domesticity not only commenced in India but became a worldwide concern in the nineteenth century. In the quest of imitating the British society the educated Bengali *bhadralok* turned their attention onto their private sphere. English women writers who chanced to visit India, like M.M. Urquhart in her book, *Women of Bengal* and Mary Carpenter had showered words of contempt on the Bengali household for being unhygienic, dingy and the birthing chamber being absolutely incongruous for any use, let alone the welcoming of a new life (Urquhart, *Women* and Carpenter, *Six*). These were taken seriously and necessary actions were promulgated. However, the conduct books culture was heralded by two unprecedented events which enabled the domestic manuals to prosper – the establishment of the printing press at Battala and the concernment over women's education, *Streesiksha*.

Key Words: Domestic Manuals, Bengali Women, *Streesiksha*, print culture, *srinkhala*.

> "Sweet dreams will come more readily when everything's in its place."
>
> (Walsh, *How 16*)

Reformist minded Bengali authors had produced almost forty domestic manuals between 1860 and 1900, specifically for the Bengali Hindu women. By the end of nineteenth century the number of conduct books had reached its zenith as there were available two copies of advice manuals for every Bengali literate woman. This paper intends to analyse the women's question of Bengal in the nineteenth century through the conduct books and tries to trace the need for the emergence and later success of this genre within the periphery of Bengali literature. To corroborate the arguments historical and sociological approaches have been implemented with the prime focus on the manual *Ramanir Kartavya* (Duties of Women), 1890 by Giribala and Jaykrishna Mitra, translated by Judith Walsh (Walsh, *How*).

With the advent of the nineteenth century came the issues regarding women which had been avoided till then. The Victorian society in England was going through a transformation with the household or the domestic sphere becoming the cornerstone of concern. The 'home' became a matter of social position and as such work took off to set the household in order. Varied number of conduct books began to be published which advised women on managing the household. The domestic trivia took a wider scale and later into the century emerged manuals for men, as to how they must advise and educate the women in household tasks. Apart from lecturing on household business, the etiquette books also tutored the women on how they must dress, behave in public, entertain guests in a social gathering and their husbands when he came back from work, child rearing, cooking, gardening and the like. Among the many, Mrs. Humphrey's *A Word to Women* (1819) and Emily Thornwell's *The Lady's Guide to Perfect Gentility* (1856) were well known works (Humphrey, *A* and Thornwell, *The*). In Britain these books became popular in the eighteenth and nineteenth century while they reached America in the latter half of the nineteenth century, however the proliferation was scarce as the American society feared that these writings might divert mankind from traditional Christian values.

These conduct books brought internal discipline to the European home which led to its political prosperity, the success of the hearth reverberated in India, then under the British hegemony. Soon conduct books began to be written by both men and women to make the women more conscious and aware of their duties. The home was thought to be a place where harmony and discipline reigned with the women holding its rein. Dipesh Chakrabarty in his essay quotes Nagendrabala Saraswati who said in *Grihasthadharma ba Naridharmer Parishista,* (The Best of Household Dharma and Woman's Dharma) how in comparison to the clean, attractive and orderly European home, the Indian household was disorderly, unclean and unhealthy (Chakrabarty, 'The' 56). In *Streesiksha* (Teachings for a Woman) the author advocates that for any improvement for the nation, there must be amelioration of the household as obedience in political and domestic spheres is a fundamental aspect which must come from the rudimentary levels of home (Chakrabarty, 'The' 56).

Home was imagined to be a place of *srinkhala* (order and discipline), hygiene, solace and harmony. That this world wide awareness for the domestic space had been recognised by the Bengali intelligentsia was understood when zealously the translation of the English manuals took place in Bengali. However, the manuals that were written by the *bhadrolok* (the respectable people who were the Bengali middle class/bourgeois intellectuals) were not imitations of the English books but they spoke about the indigenous issues as did the Gujarati magazine, *Stribodh* (1886) and the Anglo-Indian manual *The Complete Indian Housekeeper and Cook* by Flora Annie Steel and Grace Gardiner. *Stridharmapadhati* (Guide to the Religious Status and Duties of Women or The Perfect Wife, as popularly known) by Tryambaka of Tanjavore is an eighteenth century treatise which looks at conformity of women and perceives women not as individuals but as part of the dharma notion (Walsh, *How* x-xii). The text describes the lives of women from the highest ranking group and land holding group, though one finds no mention of the working class women. It advocates as to how everything is lost if the woman becomes corrupt, once more making chastity the linchpin

of a woman's existence. These manuals emerged not only to educate the women on their household duties but also to enable the smooth running of the British hegemony. Numerous jobs required the men to stay apart from their families so in this case the wife must be apt in her duties to ensure that her husband can be hard-working, punctual, neat, orderly and efficient in the office. To maintain this harmony the domestic atmosphere had to be in order, without which there would be disturbance in the larger working of the colonial setup.

The seventeenth and the eighteenth century was an age of decrepitude in India, the western colonisers came with the greed of land, money and army and left the country burning in fitful embers. The spirit and zeal for life receded with the intellectuals contributing to the havoc. The light of enlightenment advanced in the nineteenth century with Rammohan Roy, Derozio, Sister Nivedita,Vidyasagar, Kesub Chandra Sen, Vivekananda and the like. The women's question was one of the crucial issues to have been broached during this time as the previous age had left the women in a position of utmost misery. Widow re-marriage, abolition of Sati, female education and property rights for women were the results of these renaissance campaigns. As the country, 'Bharat mata', was in chains so were its women bound in fetters. The notion of the 'Bharat mata' is that of perceiving the nation within the construct of the female entity, an impression of this idea is extensively found in Bankim Chandra Chattapadhyay's *Anandamath* (Chattopadhyay, *Anandamath*). The major volte-face came when education began to percolate into the 'antahpur' or 'andarmahal' (inner quarters of the house reserved for the women) which for so long was sunk in darkness and ignorance. Until 1912, Calcutta was the capital of British India as a result there developed many European styled buildings and to the north was the 'black town' which was for the Indians. Bengal was the seed bed of nationalism and the hot spot for missionaries and British officials, factors which fostered its printing works. First came William Carey's Mission Press in Sreerampur in the 1880s and later came the Sanskrit Press in Kidderpore which laid the foundation for the commercial printing and publishing business at Battala. (Ghosh, 'An' 23-55)

The book trade flourished rapidly at the indigenous presses at Battala, located in the black town of the city. Cheap printing technique and growing reading public boosted the book market and soon prices of books fell at rapid growth as the number of copies produced began to increase. With emphasis on education, women readers increased enormously in the middle class houses. With the influences from Brahmo Samaj and Ramkrishna Mission the liberal fathers, brothers and husbands began to educate their women folk, schools and colleges also began to be founded. Bethune School was the first women's college in Asia, to be found as a school in 1849 which later became a college in 1879. The Hindu Mahila Vidyalay (School for Hindu Women) and Banga Mahila Vidyalay (Bengali Women's College) were some of its kind. The education was however, limited to keeping accounts, learning the basics of reading and writing, primarily to enable them to deal with letters and managing the household (Bagal, *Women's* 57). Education for women was perceived as a luxury which must not hamper their domestic duties however, the domestic manuals that emerged during this time had chapters devoted to education. The authors asked the husbands to educate their wives and also advised the women to pick up some fundamental knowledge as they would be helpful for running the house. The anomaly of the Bengali women's life was that, on one

hand the advice manuals and their husbands urged them to be educated while the elder female members of their family saw education as a curse and stuck to the age old belief of the educated woman becoming an early widow.

Walsh in her work looks at the extraordinary cases of women learning by their sheer will, Rasashundari Devi learned the letters by stealing pages from the copy of her son while Shanta Nag learned the alphabets upside down. The stories of the wives being tutored by their husbands behind closed doors at night was a common event in the nineteenth century. However, after the days hectic household chores which started from daybreak very few women would have the ability to sit through the lessons at night (Walsh, 'What' 6). Another reason for making the advice manuals so popular was to save the conjugal relation by making the wife a compatible partner for her English educated husband. This was also the need of the 'new patriarchy' who wanted to create a 'new woman' who would be suited to the life and needs of the then contemporary British India. All the prattle on the emphasis for education did not say what methods should be implemented or how should the women be educated. The primary concern was to make her literate and appropriate for the society and to re-establish the patriarchy in the new form with the husband as the supreme. The household manuals had a "compulsive, almost obsessive probing of tension spots" (Sarkar, 'Hindu' 102) which were often uncomfortable for women to read. The issues ranged from the eavesdropping manners of women, cracking illicit jokes on newlyweds, the biological differences in male and female, traumas of child birth and widowhood, menstruation and diseases, of patrilocality and relations with in-laws- scrutinising every minute aspect of the woman's life and not leaving anything to chance.

This paper would now probe into Giribala and Jaykrishna Mitra's authored instruction manual, *Ramanir Kartavya* (Duties of Women), 1890 (Mitra, 'Ramanir'). The couple belonged to Brahmo Samaj and other than this manual nothing more is known about their writings. Jaykrishna Mitra was a prominent Brahmo and he was quite actively involved with the organisation, one can see how this manual is written under the heavy tones of Brahmo law. The first edition of the manual carried only the name of Jaykrishna Mitra and it is only later that Giribala Mitra's name was etched. *Ramanir Kartavya* originally appeared as series in *Bamabodhini patrika* between 1886 to 1888, later these small chapters were enlarged and reissued in book form in the 1888 and 1890 editions. The book follows the typical style of imparting advice as was done by other such texts around the world. Through this conduct book the home is once more reordered and re-imagined to be a haven of security, hygiene efficiency and discipline. The manual becomes a compendium as it includes recipes of various Bengali dishes and pickles, this inclusion of the traditional culinary secrets was to unconsciously construct the *bhodrolok* identity as a superior one to the British colonialist's meat-obsessed cuisine. The book was a work of collaboration as the 'how to do' chapters are very minutely sketched and could have been only the work of a woman. More than advising the women the manual focuses on hygiene and order of the hearth. Reviewers of the nineteenth century praised the book for its simple language and clarity of thought and said that the text could be easily read by anyone who knew the basics of the language. The 1890 edition, through the efforts of Giribala Mitra, was accepted as an important text for girls in middle school

by Bengal's Director of Public Instructor. (Walsh, *How* 166) The most striking feature of this conduct book is that it does not speak anything about the education of the women which was then a much talked about issue. One can suppose that as it came out in the cessation of the nineteenth century so the author takes into consideration that education had become a necessity for women. However, it has two poems by Ishanchandra Basu, a member of the Adi Brahmo Samaj and also the author of two advice manuals.

The chapters have been divided as, 'The Woman', 'The Home', 'Food', 'Making Useless Things Useful', 'Handicrafts', 'Child Rearing', 'Nursing the Sick', 'Three Families' and at the end are the two poems, 'The Signs of Lakshmi' and 'The Daily Duties of Women'. The first chapter theorises on what are the duties of a woman and what constitutes a woman. It says that the household needs its *ginni* (senior most female member of the family who is the in charge of the household and its order) without whom there would not reign any serenity, so too the husband needs his wife to share his practises of dharma. Family is portrayed in a nuclear sense in this chapter and also later on, however the then Indian families were still under the system of living together with the extended family under the same roof. The only explanation of this exists in the fact that, members of religious reformed organisations like Brahmo Samaj were often ostracised from the traditional Hindu family and society as a result of which, they had to settle down as a nuclear family. The first chapter is in the prayerful tone where the author invokes the Almighty and asks Him to bless the housewife who would be able to fulfil her duty and work towards being the ideal woman. The next chapter, 'The Home', is divided into smaller segments like, 'The Bedroom', 'The Larder' or *'bhandhar ghar'*, 'The Cooking Room', 'The Reading Room', 'The Cowshed' and 'The Latrine'. Each of these chapters gives a detailed account on how to keep these rooms clean and each of the methods are different from the other and so are the things used in the cleaning process.

The house was supposed to be a place where there was a "place for everything and everything was in its place". (Walsh, *How* 171) The most spacious, ventilated and sunny room was considered best to be a bedroom with minimal furniture and a wooden bed. The manual lays importance on the circulation of air, as does the manual for Anglo-Indian ladies by Steel and Gardiner (Coppin, 'The'). Bedsheets, pillow and quilts were advised to be put out in the sun and the covers to be rinsed every alternate day. Cooking items were prohibited in the bedroom and so was the *pan* (beetle leaf) making arrangements due to the fear of soiling other things. The Larder was expected to be dry as it was the place to store the cooking items and damp rooms could easily spoil the things. It was also expected to be well organised, clean and to have a particular place for a particular thing. The mistress is advised to arrange the things in a systematic way so that the room has both beauty and convenience. Instructions ranged from the containers to be of clay or wood for storing to using larger potatoes before the others as they spoil faster. The store room is given importance and scrupulously every detail has been penned down.

The Cooking Room was ideally thought best if situated next to the store room as it would be easy to carry things. The kitchen was advised to have proper outlets for evicting water and smoke. Cooking utensils were asked to be cleaned before use and appropriate amounts were to be used

for cooking so as to avoid wastage. A separate reading room was mandatory in a house, however, in some cases the sitting room or *baithakhana* was used as a makeshift room for study. The author gives instances of how the child gets distracted due to the visitors coming in the sitting room which was also the only room in the house for him to study. The children are advised to be responsible for their academic materials and not to leave them hay way. The cowshed was an important part of the houses in rural area and feeding the cows, who in Hindu customs is worshipped as the *go-mata* was seen as auspicious. The cowshed was supposed to be clean as the cow's health depended on it and it was expected to be dry with the use of ashes sprinkled on the floor. Apart from the lessons of cleanliness, the author gives advises on gardening for beautification and fencing to enhance the security of the home.

The chapter on food gives various recipes regarding vegetables, pulses and fishes, though no meat dishes have been illustrated. From the rags and left over things the author asks the women to learn to make useful things and the manual precisely explains the art of quilt making, socks making with diagrams and such other items of need and decoration. A note on handicrafts also gives information on where to get items for embroidery and decorations from and urges the women to practise and master theses skills in the afternoon when household chores are put to rest. Chapter on child rearing provides suggestions of food for a baby *boy* older than six months, along with this, the author advices on how the parents must be patient and loving towards the child and the child must also be taught proper manners and customs. Similarly, methods, symptoms and diseases have been discussed in 'Nursing the Sick'. 'Three Families' is a chapter much like a case study where the author discusses his opinions on the three families he had happened to stay with. The various strengths and pitfalls of the families have been analysed to help the readers grasp the domestic situations better. The most frequent fact of the three families is that there is no mention of elders and so the young wife becomes the *grihini*. She is too young to learn to manage the workings of the household on her own and the absence of the elders can only be supplemented by the fact that they were the Hindu outcast Brahmo families.

The detailed advice of the manual took every corner of the house within its corpus, however, it bound the women more within the walls of the *antahpur* making the clear distinction between the public and the private. The home was the only space which was not tainted by the foreign rule and as a result it was considered sacred. The public or world or *baire* was the realm of the men which constituted of his work and the private or home or *ghor* was under the responsibility of the woman. Preserving the home (*ghor*) was upon the duties of the women folk as it was thought that through this they would keep the tradition and culture of the nation intact. The private space was a created space whose purity had to be maintained by resisting the sabotage of the foreign rule. Partha Chatterjee in his momentous work is of the opinion that, the nationalist need of the time engendered the redefinition of the women who must be different from the men of their society and the Western women. To bring about this there was a need to revise the social habits, eating manners, spirituality and dressing ways of the women. (Chatterjee, 'The Nationalist' 70) With education becoming important, there was a need to adjust to the new and unfamiliar situations outside home. A clear distinction was made between the liberation of the men and the women by the manual writers, who

said that the women must not drink, smoke or behave like men in public, but should continue to observe religious rituals, "maintain the cohesiveness of the family life and solidarity with kin." (Chatterjee, *The Nation* 130) This implies that though education was then a need and the only cause for the women to move out of the *antahpur*, yet the new patriarchy did not want her to jeopardise her situation in the domestic setup.

The poem 'The Signs of Laksmi' emphasises on the feminine virtues that must be possessed by the women, this reiteration for the need to be *Grihalakshmi* (Lakshmi of the Home, Goddess Laksmi signifies abundance and prosperity) is from the old patriarchy which saw qualities like uncleanliness of body and mind, disorderly, being sharp tongued, hastily walking, not being able to cook, eating more than the men as sinful for women. This association between womanhood and pleasantness was harped by manual writers, the horror of treading on the line of becoming *Alakshmi* was so strong that the manuals advised the parents to give pleasant names to their daughters and told the future mother-in-laws not to entertain any girl with names that evoked negativity for their sons. Dipesh Chakravarty is of the opinion that these pleasant names were the ones that ended with vowels like, *grihalakshmi, grihini,sadharmini* and such. (Chakrabarty, 'The' 50)

The second poem, 'The Daily Duties of Women' is a stoic resolution of a devoted woman who vows to fulfil her duties with care. From morning till night she vouches to work hard and says that if she goes wrong anywhere then "fie on my life!" (Walsh, *How* Appendix). The fictional lady's hard work would produce sweet results for her family to enjoy while she stays engaged in executing her chores, the poem ends as a prayer to the Providence so that she may gain inner strength to fulfil her duties meticulously. This exaggerated prayer written in first person narrative was to inspire the women who read the manual and to make them believe as to how there existed real women who were such selfless devotees to domestic commitments. Walsh in her article highlights another alternative reading in which she reads these hyperbolic self described devotions of the Bengali woman as a choice and not as an evidence of femininity or false consciousness. The Bengali women had two patriarchal alternatives to choose from, one was the older orthodox dictum transcribed in the Sanskrit texts and specifically in the *Manusmriti* while the other was the new patriarchy which was inscribed within the nationalistic discourse and came in the form of advice manuals (Chakrabarty, 'The' 25). The new system gave them greater freedom as the devotion to home or husband transformed from being an obligation and unlike the new order the older codes had a greater hold on the lives of the women. (Walsh, 'What' 7-8)

The ideology of *Ramanir Kartavya* is selfless devotion which is an ideal condition, the message that the book tries to drive home debunks Giribala Mitra's efforts to make the book a compulsory one in middle school. Even if one take the book's guidance fit for the young wife and not for the school girl, there lies a huge obstacle between Mitra's act and the book's message. No mention of education or of reading or writing letters takes place instead she thinks it fit for the women to recycle useless things in the afternoon when work pressure was low. Another major striking point of this manual is that it does not advice the women to learn any form of music or instrument, Dhirendranath Pal's manual, *Swami Stri* (Husband Wife) has a whole chapter devoted to music

and instrument called, '*Songit o Baddo'* where Pal instructs how the wife must entertain the husband when he comes back after work (Pal, *Swami*). This could be easily seen as a weak mirage of the *babu baiji* culture of the previous century when the *barir bou* (literally, house wife) was not allowed to learn how to sing or play instruments and so for recreation the men often resorted to the courtesans, a habit which later gets subsumed into the societal framework as the 'babu culture'. To prevent the men from seeking pleasure outside home and to maintain the conjugal harmony conduct books laid an equal important emphasis on music.

Many authors wrote in the narrative style while some penned the manuals in the form of dialogues or conversations between the husband and the wife where the latter gets educated about her duties from the former. The tone remains that of instruction and order and through a lot of examples the household duties are explained, the title of the chapters in *Ramanir Kartavya* are formal though throughout the text the author uses the colloquial speech form. Home in the migrating worlds of the twentieth and twenty first century is a much more problematic idea with the concern lying in where it belongs but in the nineteenth century, the manual authors were trying to locate the materiality of home and whether it could be disciplined. When the home was threatened by the chaos of the outside world, the responsibility to repel fell on the women, who were the *grihalakshmis* or goddesses of the household. In this process to defend the home and execute her duties, the woman's body becomes a site for war which she resolves through the system of education. The most important thing that happened due to the emergence of the patriarchally inscribed conduct books was that the women learned to read, she had the alternative to choose between the old patriarchy symbolised through the mother-in-law and her orthodox customs and the new patriarchy where the husband is her god and teacher, much more relaxed a form than the former. Maybe the men saw the lax in the system as dangerous and yet could not stop it, as a result the manuals are careful to guide the women on what they must choose which is done through a convincing tone of first person narrative and through varied range of examples and illustrations. The devotion towards the husband in the nineteenth century is seen as the only tactic to deflate the customs and orders of the past. The emergence of the conduct books and that too being written mostly by men validates that the men realised the vulnerability of their position.

The domestic manual as a genre gave a clear and holistic picture of the Bengali and Indian society. The manuals worked majorly on binaries - on one hand it emphasised on education to liberate women while on the other hand education is used to enable the women to read the manuals and stay chaste and disciplined. The woman's question is at times blatantly broached where the author sympathises with the conditions of women in the medieval era, while occasionally the issue is camouflaged under the advice of being a devoted wife. The husband teaches the wife at night behind closed doors so that the elders of the family stayed ignorant of such acts nonetheless, later it is he who berates the wife during the lessons and has the dominating attitude. Education becomes a paramount focus in the nineteenth century through which the women can rewrite both the old and the new patriarchy, heralding for a world where burdens, roles and pleasures would be shared, in ways unknown to the cognition and perception of our ancestors.

Reference

Bagal, J.C. *Women's Education in Eastern India: The First Phase.* Calcutta: The World Press Pvt. Ltd. 1956. Print.

Carpenter, Mary. *Six Months in India.* Vol. 1. California: Nabu Press. 2012. Print.

Chakrabarty, Dipesh. 'The Difference-Deferral of a Colonial Modernity: Public Debates on Domesticity in British India. In Arnold, David and David Hardiman Ed. 1994.*Subaltern Studies VIII.* Essays in Honour of Ranajit Guha. New Delhi: Oxford University Press, 1994. Print.

Chatterjee, Partha. 'The Nationalist Resolution of the Women's Question' In *Recasting Women: Essays in Indian Colonial History,* ed. Kumkum Sangari and Sudesh Vaid. 233-53. New Delhi: Kali for Women. 1989. Print.

— *The Nation and Its Fragments: Colonial and Postcolonial Theories*. Princeton: Princeton University Press. 1993. Print.

Chattopadhyay, Bankim Chandra. *Anandamath*. Mumbai: Orient Paperbacks. 2005. Print.

Coppin, Liesebeth. 'The British-Indian experience: Flora-Annie Steel as an unconventional 'memsahib'. Diss. Ghent University, 2010. Web. 14 May 2019.

Ghosh, Anindita. 'An Uncertain "Coming of the Book": Early Print Cultures in Colonial India'. *Book History.* John Hopkins University Press. 6. (2003), 23-55. Web. 21 Aug 2016.

Humphry, Mrs. C. E. *A Word To Women*. Montana: Kessinger Publishing. 2010. Print.

Mitra, Jayakrishna and Giribala Mitra. 1890. 'Ramanir Kartavya' (The Duties of Women). trans. *How to Be the Goddess of Your Home, An Anthology of Bengali Domestic Manuals* by Judith E. Walsh. India: Yoda Press, 2005. Print.

Pal, Dhirendranath. *Swami Stri.* (Husband and Wife). Calcutta: Vaishnav Charan Vasak. 1883. Print.

Sarkar, Tanika. 'Hindu Conjugality and Nationalism in Late Nineteenth Century Bengal'. *Indian Women:Myth and Reality.* Ed. Jasodhara Bagchi. Hyderabad: Sangam. 1995. Print.

Thornwell, Emily. The Lady's Guide to Perfect Gentility. California: Huntington Library and Art Gallery. 1973. Print.

Urquhart, M. M. *Women of Bengal*. Delhi: Gyan Publishing House. 2014. Print.

Walsh, Judith E.'What Women Learnt When Men Gave Them Advice: Rewriting Patriarchy in Late Nineteenth Century Bengal'. *The Journal of Asian Studies.* 56.3. (1997), 641-77. Web. 14 Sept. 2016.

— How to Be the Goddess of Your Home, *An Anthology of Bengali Domestic Manuals.* India: Yoda Press. 2005. Print.

RAKTA KARABI -TOTA KAHINI : THE PARADOX OF THE DISCIPLINARY POWER

Pallama Ghosh
P.T, Department of Political Science
The Bhawanipur Education Society College, Kolkata.

Guest Lecturer (Post Graduate Section)
Basanti Devi College, Kolkata.
pallamaghosh@gmail.com

ABSTRACT:

Disciplinary Power manifests itself in a form of the daily practices of routinized activities through which the individuals are seen to have been engaging themselves in a kind of self-surveillance and self-monitoring or self-disciplining and thereby subjugating themselves to this invisible power mechanism. This essay tries to encapsulate the writing of Rabindranath Tagore to that of the understanding of disciplinary regimes of power. The major domain of enquiry of this piece is to restrospect the operations of the disciplinary power which is preassumed to be different from that of the earlier regimes of Sovereign power. The two major writings of Tagore that will be focused is RaktaKarabi and TotaKahini and in it how the invisible gaze operates and how disciplinary actions dwell throughout the two writings of Tagore is also the major theme that this piece of work tries to retrospect.

KEYWORDS: Disciplinary Power, Self-surveillance, gaze, Panopticon, normalization.

Dinciplinary society and disciplined society are not the same, which is reflected when we allude to the Tagore's writings like Raktakarabi (The Red Oleander), Tota Kahini (The Tale of a Parrot) and Tasher Desh (The land of Cards). RaktaKarabi and Tota Kahini exemplifies the disciplinary regimes of power in society where as Tasher Desh reflects of the disciplined society where by every atomic individual abide by certain rules and regulations. A disciplined society is more of a restrictive, rule bound societal paradigm. But disciplinary society is deviant to such kind of an understanding, which is well articulated in the first two writings of Tagore. 'Disciplinary Power' refer to a way in which power can manifest itself in a form of daily practices and routinized activities through which the individuals are seen to have engaged themselves in a kind of self-surveillance and self-monitoring or self-disciplining and thereby subjugating themselves to this invisible power mechanism. It is what is referred to as a dominant kind of a system of social control such as that of the military forces, and an increase in the form of social control through which the atomic individual's self-discipline themselves. This conception of modern power was better than the contrasting model of power which existed and which generally conceptualized power as domination that is, where one group exerts force over another. The force which is

exerted is centralized and repressive It is a possession which could be acquired and imposed on others through the application of physical coercion. Rather power in this form can be espoused as dispersed throughout society and is inherent in social relations which are embedded in a network of practices, institutions, and technologies which are seen to have been operating on all the micro levels of everyday life. This was mentioned in the last lectures of the Society must be defended where Foucault writes,

> "After the anatomo–politics of the human body established in the course of the eighteenth century, we have, at the end of that century, the emergency of something that is no longer an anatomo- politics of the human body, but I would call a biopolitics of the human race."[1]

RAKTA KARABI AND THE INVISIBLE DISCIPLINARY GAZE

The play which started as Yakshapuri during a trip to Shillong in 1923 was later changed and renamed to Nandini and finally it was published in 1924 as Red Oleanders in the Pravasi journal. This text is a criticism of the colonial rule like many of the other writings of Tagore but the most unique feature of this play is its possible attempts to subvert the conceptual frameworks of sovereign authoritarianism moving beyond the British imperialism and it is a work which manifests a protest against the instrumentalist dominations of the so called human race after the advent of the industrial modernity age. The description of Yakshapuri is completely dark, gloomy and kind of claustrophobic. This city is inhabited by several miners who are brought from outside to and are forced to dig out gold from gold mines.[2]

> Professor: All creatures fear an eclipse, not the full sun. Yaksha Town is a city under eclipse. The shadow Demon, who lives in the gold caves, has eaten into it. It is not whole itself, neither does it allow anyone else to remain whole." [3]

There is a kind of disciplinary power structure which is involved in the city and therefore the city is always kept under strict and constant surveillance focused mainly on the domination of one group by another. In contrast to this view point,If we reflect upon the perspective of Foucault in the domain of 'Disciplinary Power' it is a power which does not benefit any particular kind of class, he is not of the view that class matrix is embedded in society as Karl Marx's projects. Whereas for Foucault, disciplinary power does not benefit any particular class but a coalition of classes is beneficiary. 'Disciplinary power' for him is like a wave or a network in society, it is cobweb of relations. 'Disciplinary power' is implicated in the relations and he says no one designs this relation, it is present. Relations are cast in a particular web therefore the relations get designed. Take for example; if we look at the technology of governance it does not benefit any single class. 'Disciplinary power' exists in a grid, a grid through which power is supplied. Disciplinary power exists independent of any class or ethnic community. So, in this play also such stereotypes are visible in a cobweb of relations. The disciplinary power further dehumanises the individuals by allotting them with numbers in Yakhapuri.This allotment of numbers actually creates the docile body.'Disciplinary power', Foucault exerts one which operates on the very body which is a docile body, where a docile body is the one which listens to command or a body which is conditioned to

commands which is regulated through a self-disciplinary practice which each of us adopt, thereby subjugating ourselves that is to say the disciplining of the body or disciplining the docile body.[4]

> Bishu : In Yaksha Town figures follow one another in rows and never arrive at any conclusion. That's why we are not men to them, but only numbers –
>
> Phagulal : I' m No 47 V.[5]

Its forces derive the ability to function through knowledge and desire through the production of scientific knowledge which results in a discourse of norms and normality to which individuals desire to confirm. This knowledge produces truth and this truth is the utterance of the privileged. Power is required to produce truth. Foucault, political order is maintained through the production of docile bodies mentioned earlier which is a passive, subjugated and productive individual. This process takes place through many institutions like schools, hospitals, prisons, the family, the state which brings all aspects of life under its controlled gaze. Such kind of a situation is visible in Yakshapuri which functions and operates through an invisible disciplinary gaze. The surveillance creates a control over the individual. Whereby the individuals are careful while revealing any act.[6]

Nandini: Do you know, my men, where they kept Ranjan?

> First Man: Hush, Hush!
>
> Nandini : I am sure you know. You must tell me.
>
> Second Man: What enters by our ears doesn't come out by our mouths, that's why we are still alive".[7]

The institutional disciplining, surveillance, and punishment of the body creates bodies that are habituated to the external regulations that works to discipline the body, optimize it capacities and extort its forces, increase its usefulness and docility, integrate it into a system of efficient and economic controls and thus by doing all this, produces the body that the society requires. Bio power involves certain aspect of disciplinary power. Disciplinary Power is about training the actions of the body; discipline is a kind of mechanism of power which helps to regulate the behaviour of individuals in the social body. This is done by regulating the organizations of space (architecture, etc), of time (time tables) and people's activities and behaviour (drills, posture, movement). It is enforced with the kind of complex system of surveillance. For Foucault, power is not symbolic of discipline rather discipline is simply one possible way through which power can be exercised. While embarking on this point he focuses on the term of disciplinary society in the due course while discussing its history and that of its origin and disciplinary institutions such as prisons, hospitals, asylums, schools and army barracks. Foucault also specifies that when he speaks of a disciplinary society he does not mean disciplined society which means that disciplinary society is not an unitary structure, thus this discipline is important. In his magnum opus, *Discipline and Punish: the birth of Prisons* Foucault projects that discipline creates docile bodies which are ideal during the eighteenth and the nineteenth century new economies of the industrial age, new bodies (docile bodies) which

functions in factories, ordered military regiments and school classrooms were produced. But in order to create such kind of a docile body which is conditioned to command can be created by constant observation and record keeping so, it is disciplined which is created not by excessive force but through careful observation and moulding of the bodies into correct shape through this kind of controlled surveillance. Foucault therefore says that this in prisons were done by panopticon whereby the architecture of the prison were such that there was a tendency or possibility that you are been constantly observed so, this kind of surveillance creates disciplinary docile bodies. Precisely the conceptual framework espoused by Foucault is clearly portrayed in the city of Yakshapuri which operates through what Foucault calls for Panopticon.

> "The major effect of the Panopticon: to induce in the inmate a state of conscious and permanent visibility that assures the automatic functioning of power."[8]

In the book *Discipline and Punish: the birth of Prisons* Foucault focuses on the themes of the docile body, normalization gaze and surveillance and in this text he also focused on a concept like Panopticonism for which he relied on the Jeremy Bentham who gave a prison structure where all the prisoners lived with a fear that they are being observed at every point of time by the prison guard and if the prisoners were seen to deviate then they were punished so this fear lead them to police and self-monitor their own behaviour. Whereas the entire city of Yakshapuri is under complete control and works as an efficient machine under the disciplinary power structure yet again the one of the characters like Nandini brings about a breeze of freedom. Partha Chatterjee in his analysis says Tagore was a critic of the "disciplinary constraints and collective demands"[9]of the modern political institutions. Like a prison guard in a prison determining the structures of panopticon whereby like the prison guard the Raja is invisible to the population it governs.[10]

> "Nandini : Then again, you hide your king behind a wall of netting. Is it for fear of people finding out that he's a man?
>
> Professor: As the ghost of our dead wealth is fearfully potent so is our ghostly royalty, made hazy by this net, with its inhuman power to frighten people."[11]

This is possibly a world which Rabindranath Tagore defines which is remarkably similar as to how Michel Foucault describes the panoptic apparatus during the age of capitalism. By following the description of the lead character of play Nandini we observe the Foucault's disciplinary power to exhibit. The invisible power exercised by the Raja on the subjects show the invisible surveillance as a kind of disciplinary apparatus of the modern sovereign power structures that exactly what the Foucauldian model projects. Disciplinary power as considered by Foucault is a necessary precondition for the rise of capitalism. The growth of capitalism requires the disciplinary power structures to pervade in a networked way to transform controlled and disciplined individual bodies to productive individuals. The play actually contributed to

> "the regeneration of man from the state of self-imprisonment, self-deprivation and self-isolation, contributing to the obliteration of his humanity."[12]

Despite the fact that Yakshapuri was a monarchic society but Rabindranath Tagore defined it as a city under a modern form of super-ordinate administrative control and concealed observation. The king with the help of a henchmen keeps an eye on the city. The king and the subjects are all caught in a disciplinary regime whereby none of them can escape this power dynamics of normalization. Similarly, we can see how Foucault says that

> "power is not totally entrusted to someone who would exercise it alone, over others, in an absolute fashion; rather, this machine is one in which everyone is caught, those who exercise this power as well as those who are subjected to it."[13]

The milieu of Raktakarabi is nearly a replication of the Foucauldian paradigm. The quote from The Society Must be Defended encapsulates how sovereign power and biopower are different for Foucault

> "this new type of power, which can therefore no longer be transcribed in terms of sovereignty, is, I believe, one of bourgeois society's great invention. It was one of the basic tools for the establish of the industrial capitalism and the corresponding type of society. This non-sovereign is disciplinary power… Power is exercised through both right and discipline, that the techniques of discipline and discourses born of discipline are invading rights, and that normalizing procedures are increasingly colonizing the procedure of law, that might explain the overall workings of what I would call a normalizing society."[14]

This Power which operated throughout Yakshapuri had chained the entire population in an invisible displinary gaze which was backed by power.

TOTA KAHANI AND THE PANOPTICON

The other short story Tota Kahini (the tale of a parrot) Tagore brings to light how education industry or the schools are nothing as such but mere replications of a knowledge factory and also shows how it is inimical of a form of meaningful being where it is time bound with fixed timetables and delivering the students with mechanical knowledge for the basic purpose of examining and grading them for their deeds. This particular opus of Tagore reminds an individual of Foucault's idea of disciplinary regime projected in the *Discipline and Punish: The birth of the Prison* and the Society must be defended. The educational systems as disciplinary regime of Foucaultis observed through the lenses of prisons and factories where by continuous observation and surveillance and self monitoring and self surviallance normalizing, examination and training and punishment if found deviant becames the order of the day. In this story a minister decides that the song bird of the king should be educated properly. So, the bird was surrounded by thousands of pages and was kept in a golden cage at the end the bird could no longer sing the only sound that could be heard was that of the rumbling in its stomach the dry pages of the book. While quoting from Foucault's Society Must be defended,

> "an Important phenomenon occurred in the seventeenth and eighteenth centuries the appearance -one should say the invention of a new mechanism of power which had very

> specific procedure and completely new instruments, and very different equipments. It was, I believe completely incompatible with relations of sovereignty. It was a mechanism of power that made it possible to extract time and labour, rather than commodities and wealth from bodies. It was a type of power that was exercised through continuous surveillance and not in discontinuous fashion through chronologically defined systems of taxation and obligation."[15]

Tota kahini it is needless to say that it is a satire on the uselessness of the mere learning which is very close to Foucauldian model of disciplinary regime. Knowledge and power are both linked to each other in a very strong fashion as knowledge derives the authority of the truth as well as it acquires the power to project itself as truth. So, for receiving the proper kind of education a proper disciplined environment is essential, as a result a proper golden cage was constructed for the bird. [16] Correct training is also a key feature of the disciplinary power for the major success is observed in the disciplinary power is through that of the simple instruments used like the observation, normalization and examination of any deviance.

> "They decided that the ignorance of birds was due to their natural habit of living in poor nests. Therefore, according to the pundits, the first thing necessary for this bird's education was a suitable cage."[17]

Power thus manifests itself to the daily practises and process of disciplining individual to the norms predominant in a society. That kind of a routine practise was forced on the bird and as a consequence of it at the bird the bird lost its very essence as a being only the sound of the pages of the book was audible from the bird. [18] The power of disciplining the body is applied through institutional framework or though scientific discourses or norms in a society where it projects how thing ought to be and then individuals are monitored, examined and properly trained to normalize them and to enforce a kind of self-control."The Raja poked its body with his finger. Only its inner stuffing of book- leaves rustled."[19]

So in short disciplinary power skills and shapes as well as normalizes the individuals and those who are found deviant are then exposes to corrective modes or therapeutic techniques.

> Social conditioning and normalisation become the rule of the day. Culture is made body as Bourdieu puts it "beyond grasp of consciousness… [untouchable] by voluntary, deliberate transformations."[20]

For Foucault docile bodies are regulated by the norms of cultural life. This domain of disciplinary power operates both through the production of knowledge and by the creation of desire to conform to the norms that this knowledge establishes. Individuals feel compelled to regulate their bodies to conform to norms, but also to talk about what they should and should not do and confess any deviation from these norms. The norms that are so much elaborate that the individual ceases to exist. The bird was a negligible entity in front of the elaborate arrangements.[21] The biggest strength of the disciplinary power is that it is masked and hidden and invisible and made to appear positive and desirable.

"The method was so stupendous that the bird looked ridiculously unimportant in comparison. The Raja was satisfied that there was no flaw in the arrangements."[22]

Power or bio power for Foucault is life, human wellbeing it is the skilling and deskilling of the body. It is how human body survive. Power for Foucault is survival. Power does not shackle or lash individuals but power is enabling but the major point is it needs to be disciplined the one who is not obliged and deviant. For Foucault power is not imposed from above by a dominant group but rather comes from below we are all the vehicles of power dynamics because it is embedded and imbrewed in discourses and norms that are part of the minute practises, habits and interactions of our everyday lives. The bird was chained a norm to normalize to and the deviation was not excepted and so its wings were also clipped.[23]

The blacksmith, with his forge and hammer, took his place in the Raja's Department of Education. Oh, what resounding blows! The iron chain was soon completed, and the bird's wings were clipped.[24]

Thus, power is everywhere. For Foucault power is productive, not repressive. It operates by producing knowledge and desire. This knowledge is not objective or not neutral. This type of knowledge has a controlling effect on the bodies. In society, must be defended Foucault points out a few key features of disciplinary power. Firstly, he says one who is disciplined derives pleasure rather than pain from being disciplined. We love something and we hate something because body is conditioned to it. And we get pleasure through it. Secondly, discipline is internal it comes from within. The desire within ourselves which creates discipline. Discipline is awarded and it is not condemned nor corporal punishment is given but instead of that social and cultural punishment is given. Thirdly, discipline is not only for benefits like incentives, tangible benefits and discipline is sometimes meaningless also. This matrix of discipline is always there one should not cross that bar as well as discipline is an act. "There is no need for arms, physical violence, material constraints. Just a gaze." [25]

From the above deliberation it is quite evident that disciplinary invisible gaze operates within the societal fabric. The above two writings that have been deliberated were observed in an own degree to apply such kind of an invisible disciplinary gaze.

"But the personal man is not dead, only dominated by the organised man. The world has become the world of Jack and Giant- the Giant who is not a gigantic man, but a multitude of men turned into a gigantic system" [26]

These two Tagore's writings also project as to how the self-surveillance operates and self- monitoring is injected in the minds of the characters for the uniformity in the operation of the invisible power mechanism.

NOTES

[1]Michel Foucault, *Society Must Be Defended: Lectures at college De France* (New York:

Picador, 2003)243.

[2]Rabindranath Tagore, *Raktakarabi* (Kolkata::Viswabharati, 2019) 15.

[3]Rabindranath Tagore, *Red Oleander* (New Delhi:Peacock Books,2017)6.

[4]Rabindranath Tagore, *Raktakarabi* (Kolkata::Viswabharati, 2019) 35.

[5]Rabindranath Tagore, *Red Oleander* (New Delhi: Peacock Books,2017)15.

[6]Rabindranath Tagore, *Raktakarabi* (Kolkata:Viswabharati, 2019) 95.

[7]Rabindranath Tagore, *Red Oleander* (New Delhi: Peacock Books 2017)46.

[8]Michel Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, (New York:Pantheon,1977)201

[9]Partha Chatterjee, *Lineages of Political Society*, (Ranikhet: Parmanent Black,2011) 122.

[10]Rabindranath Tagore, *Raktakarabi* (Kolkata:Viswabharati, 2019) 12.

[11]Rabindranath Tagore, *Red Oleander* (New Delhi: Peacock Books ,2017)4.

[12]Utpal K. Banerjee, "Symbols and Metaphors in Tagore's Drama". *Sahitya Akademi* 54(2010):134.

[13]Michel Foucault,*The Eye of Power,* in C.Gordon (ed. and trans.) *Power/Knowledge*, (New York: Pantheon,1977)156.

[14]Foucault,36-39.

[15]Foucault, 35-36.

[16]Rabindranath Tagore, *Lipika* (Kolkata: Viswabharati,2017)87

[17]Rabindranath Tagore, *Rabindranath Tagore: More Stories* (Kolkata: Projapoti,2017)375

[18]Rabindranath Tagore, *Lipika* (Kolkata: Viswabharati,2017)94.

[19]Rabindranath Tagore, *Rabindranath Tagore: More Stories* (Kolkata: Projapoti,2017) 379.

[20]Pierre Bourdieu, *Outline of a theory of Practise*,(Cambridge: Cambridge UniversityPress,1977)94.

[21]Rabindranath Tagore, *Lipika* (Kolkata: Viswabharati,2017)92.

[22]Rabindranath Tagore, *Rabindranath Tagore: More Stories* (Kolkata: Projapoti,2017) 377.

[23]Rabindranath Tagore, *Lipika* (Kolkata: Viswabharati,2017)93

[24]Rabindranath Tagore, *Rabindranath Tagore: More Stories* (Kolkata: Projapoti,2017)378.

[25]Michel Foucault,*The Eye Of Power*, in C.Gordon (ed. and trans.) *Power/Knowledge*, (New York: Pantheon,1977)155.

[26]Rabindranath Tagore, *Raktakarabi* (Kolkata:Viswabharati, 2019) 115.

REFERENCES:

Banerjee, Utpal K. "Symbols and Metaphors in Tagore's Drama." *Sahitya Akademi* 54(2010): 134.

Bourdieu, Pierre. *Outline of a theory of Practise*. Cambridge: Cambridge University Press, 1977.

Chatterjee, Partha. *Lineages of Political Society*. Ranikhet: Parmanent Black, 2011.

Foucault, Michel. *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. Trans. Alan Sheridan. New York: Pantheon, 1977.

—. *Society Must Be Defended: Lectures at College De France*. Ed. Mauro Bertani and Alessandro Fontana. Trans. David Macey. New York: Picador, 2003.

—. *The Eye of Power*. Ed. C.Gordon. Trans. C.Gordon. New York: Pantheon, 1977.

Tagore, Rabindranath. *Lipika*. Kolkata: Viswabharati, 2017.

—. *Rabindranath Tagore: More Stories*. Kolkata: Projapoti, 2017.

—. *Raktakarabi*. Kolkata: Viswabharati, 2019.

—. *Red Oleander*. New Delhi: Peacock Books, 2017.

NARRATIVE, GENDER AND MARGINALISATIONS IN THE *MAHABHARATA*: COLONIAL AND POSTCOLONIAL PERSPECTIVES

Dr. Ralla Guha Niyogi
Associate Professor
Department of English
Basanti Devi College, Kolkata
guhaniyogi_ralla@rediffmail.com

Abstract

The inter-related issues of narrative, gender and marginalisation contribute significantly to the dynamic structure of the *Mahabharata*.. The unique feature of the epic narrative lies in the telescoping technique of concentric narrative frames that display a strange fluidity in extending within and outside of the story of the Pandavas, while imparting to the text an intra- commentarial character. The 'synthetic- analytic' disjunction in the epic greatly influenced colonial and post colonial studies on the origin and development of the *Mahabharata* and its narrative structure.Outstanding epic women in the epic demonstrate striking features of femininity in the classical Indian context, chief among these women being the *Pancha- Kanya* or five virgins. Instances of marginalisation in the epic are numerous, and many of the marginalised characters are outstanding personalities and contribute significantly to the dramatic unfolding of events in the epic . Interestingly, marginalisations in the epic, be it in the royal family, the 'upper castes', women or among tribals, often cease to matter in the face of outstanding merit, thus showing how human action and human achievement in ancient times – as in modern times – are far superior to narrow discriminations of class, colour, gender, caste and creed.

Key words: **'synthetic-analytic'disjunction, orientalism, 'female culture',** ***Anima and Animus, Pancha Kanya.***

Krishna Dvaipayana Vyasa is traditionally regarded as the most important author and editor of sacred texts in India. He is credited with arranging the Vedas into four texts, composing the longest epic in the world, the *Maharabharata,* many *Puranas*, and other works. However, Vyasa has been regarded by many critics as mythical (Sukhtankar, 1959,1:ciii) since his existence is referred to in the epic's myths and legends that have existed in India for over two thousand years. The first critical edition of the epic, brought out by the Bhandarkar Oriental Research Institute in Poona between 1919 and 1959 contains over 73,000 verses, while the Vulgate edition of the seventeenth century commentator, Nilkantha, has around 84,000 verses; some South Indian

versions are even longer. The narrative structure of the *Mahabharata* is fascinating, and finds perhaps no parallel in the literatures of the world. In my article, I shall focus on certain colonial and postcolonial perspectives regarding the narrative structure of the epic sand some of the epic's gender- related issues. I shall also analyse specific instances of marginalisation in the epic's narrative that occur at all levels of ancient Indian society irrespective of gender and social class. These inter-related issues of narrative, gender and marginalisation within the epic contribute significantly to its fluid and dynamic structure, making the *Mahabharata* a text that projects the diachronic progress of Indian thought.

1

The *Mahabharata* consists of eighteen books or *parvans* of varying length. Originally there were 24,000 verses or *jaya,* of which 8800 were abstruse and tightly knotted verses that Vyasa composed, known as the *Vyasa kuta* .These are composed by Vyasa as a result of his pact with Ganesha, who agrees to act as the great sage's amanuensis on condition that his pen would not stop even for an instant. Vyasa's terms were that Ganesha must stop wherever he did not understand. In this way, Vyasa cleverly gives himself breathing space! Episodes and stories that were consequently added, comprised almost 1,000,000 *slokas*.

\One of the most important constituents of the epic's narrative structure is the *Anukramanika,* (literally meaning 'an index') that may be regarded as an introduction to the *Mahabharata*, consisting of a summary of the main events of the epic, namely, the birth and childhood of the Pandavas, their polyandrous marriage to Draupadi, and the deepening antagonism between them and the Kauravas, their cousins, that culminated in the violent and bloody Kurukshetra war in which, as Yudhishthira states, an astounding 1,660,020,000 warriors die, 24,165 warriors go missing and all 100 cousins of the Pandavas are killed. The *Anukramanika* projects:

> 'a moral universe within which Vyasa places his tragic story of the end of a Yuga, the passing of the era of heroes. … it lists the eighteen major divisions (*parvas*)… in terms of an organic image: that of a tree… The epic itself is an Yggdrasill upholding the entire ethos of puranik Bharata in its massive trunk and all-encompassing branches, or like the mystic *ashvattha* tree of the Upanishads with its roots in heaven and its branches interleaving the universe. For, what is not in the *Mahabharata* is not to be found anywhere. (Bhattacharya, 2012, 1).

The epic's narrative, however, is not a continuous one, but is interrupted by many sub-stories and didactic passages which are related by characters within the narrative. These sub-stories are termed as *upakhyanas*, and include tales of the ancestors of the Pandavas, stories of gods and demons, kings or distinguished *brahmins* of the past. The tales are in the form of an interpretative commentary, addressed not only to the characters within the text, but also directly to the audience. Significantly, the Pandava narrative is itself a sub-story, for in the epic it is related by Vaisampayana to King Janamejaya, great- grandson of the Pandavas, during Janamejaya's snake sacrifice or *sarpasatra*; which in turn is heard there by Ugrashrava,(awesome- voiced), popularly called

Sauti, and re-told, together with the story of the snake- sacrifice and other tales, to Shaunaka and other *brahmins* who have assembled in the Naimisa forest for a ritual *satra*. In each case the narratives represent dynamic interactions between speaker and listener, and the latter frequently interrupts with queries. The unique feature of the epic narrative lies in the telescoping technique of concentric narrative frames that display a strange fluidity in extending within and outside of the story of the Pandavas, while imparting to the text an intra- commentarial character. The authorial voice of Vyasa is masked and unobtrusive, often speaking as a character within his own narrative. As the great- grand-father of the Pandavas and the biological father of Pandu, Vyasa appears on numerous occasions to advise and help his grandsons; he later rearranges the story for future generations, relating it to his pupils and being personally present at Janamejaya's snake sacrifice where Vaisampayana enacts the story. Although the *Mahabharata*_and the *Ramayana* are generically similar, the former is traditionally regarded as *itihasa* (Heiltebetel, 1) while the latter is a store of didactic matter, providing deep insights into the four *purusarthas*, namely, *dharma ,artha, kama* and *moksha* – i.e. propriety, finance, pleasure and liberation of the spirit. (Biardeau, 1989, 12).

A study of the varied critical approaches to the epic's narrative structure reveals several interesting features. Growth of interest in the epic followed British presence in India, and consequently, the *Mahabharata* began to be studied in universities in the West. In 1786, William Jones drew attention to the close genetic ties between Sanskrit, Greek, Latin, Gothic, Celtic and Persian. Much of the study on the epic was undertaken by nineteenth century German scholars like Christian Lassen, the younger and elder, Adolf Holtzmann, Albrecht Weber, Alfred Ludwig , Oldenberg, Weber and Joseph Dahlmann. The first important critical work on it was by E. Washburn Hopkins in the late nineteenth and early twentieth centuries. Hopkins repudiates Dahlmann's ' synthetic ' view that the *Mahabharata* was written by a single author and analyses that the text of the epic developed over several centuries, the core narrative structure accommodating within it numerous sub-stories and didactic accounts in keeping with the changing times. This view echoes the 'analytic' approach of a majority of scholars and focuses on the intra- textual representation of the story of the Pandavas at Janamejaya's snake sacrifice many generations after the Kurukshetra war, and then again its retelling in the Naimisa forest before Shaunaka and other *brahmins.*

This 'synthetic- analytic' disjunction greatly influenced studies on the origin and development of the *Mahabharata* _and its narrative structure. The 'analytic' approach pre-dominates modern twentieth century postcolonial studies and may be regarded as an example of the 'diachronic development of Indian ideas' (Proudfoot, 41) taking into account the fluidity of social factors relating to *dharma*, *varna*, marriage practices and family relationships. However, it must be remembered that, above all, the world of the *Mahabharata* is a literary world, not always representing the transient reality of 'ancient' Indian society. Herein emerges the interesting disjunction between myth and reality in the epic for it is not possible to assert the extent to which the story of the *Mahabharata* is true. Hirst commented in 1998 that it was 'a story about self- perception and identity' (Hirst, 109) while Madeleine Biardeau says about Vyasa: 'His mythic character does not exclude his historical reality; it simply keeps it out of reach'(Biardeau, 1968, 18).Recent scholarly

work on the *Mahabharata* indicates the selective approach to the study of specific aspects of the text and its narrative structure. These micro- studies on particular characters, groups of characters, or specific narrative episodes or ideas within the text are invaluable to the emergence of holistic theories on the narrative structure of the epic that already exist or that may be formulated in future.

This dynamic interaction between the text of the epic and modern interpretations of and responses to it contradicts the concept of Orientalism that had existed in Western societies in colonial times. Western scholars had traditionally applied their theoretical conceptions to interpret anthropological and ethnological sciences as well as myths and folklore. In the process, they often depicted the technologically less developed societies, like Asia and Africa, for example, as 'primitive', for the latter did not reflect either in their appearance or behaviour the culture and traditions of the more 'civilised' European societies. Western societies studied these 'inferior' societies from their 'superior' perspective and tried to understand and interpret the historical and mythological traditions of these 'primitive' societies, aiming to transform them into 'civilised' ones. (Tylor, 2). European thinkers were influenced by Descartes's 'new vision' of the universe and this enabled 'Western civilization to achieve an unparalleled domination of the Earth and nature.' (Willis, 274). As K. Thomas observes:

> Descartes's explicit aim had been to make men 'lords and possessors of nature'… he…
>
> portrayed other species as … inert and lacking any spiritual dimension… (Thomas, 34-35).

The Cartesian vision placed the 'non- European, pre- industrial, tribal societies in the realm of 'other species' which lacked 'spiritual dimension', and brought into force ' "the first scientific colonialism" in which non- European peoples and their cultures were assimilated to the world of objects to be controlled and manipulated at will.' (Handoo, 14). Consequent to the Industrial Revolution in the West, and the development of modern science, technology, modern medical sciences and later, social and anthropological sciences, the colonial paradigm gradually took shape, reinforcing the Cartesian world view (Willis, 248) and this in turn led to the emergence of the new concept of Orientalism, by which the Orientals were regarded as the 'other species' and the Orient as a fixed text, 'frozen' and stagnant. (Said, 40-41). Western scholars, while being fascinated by frozen forms of Hindu tradition, often overlooked the manifestation of this tradition that was embedded in the mythological narrative as a dynamic phenomenon , unconsciously, sub-consciously or deliberately reflecting various aspects of ancient and modern Indian society.

The myths of the *Mahabharata* that evolved over generations, as contemporary micro-studies and research on its narrative structure show, reassert the essentially dynamic nature of the epic's fluid, diachronic structure so that it ceases to be a 'frozen' text. These myths, that form an integral part of the narrative structure of the *Mahabharata*, have been revisited and analysed by writers in the nineteenth century, who explore the potential and relevance of the epic so that instead of becoming stereotypes, the myths emerge as meaningful in modern times. These ancient myths, through a continuous process of re-interpretation and re-invention, thereby retain their dynamic nature.

Twentieth century critics have sharply different views on the narrative structure of the myths in the epic. The French scholar, Georges Dumézil held that the epic was a literary exercise undertaken by skilful technical writers who interpreted Indo-European myths to suit the demands of history (Dumézil, 1973, 3). Dumézil and the French structuralist writer, Madeleine Biardeau regard epic events as pure myths, but the latter traces these myths to Puranic stories, as developing from Vedic sources. (Biardeau, 1995, 5). Sanskritists of the late twentieth century like Wendy Doniger, David Gitomer and James Fitzgerald have provided fresh insights into the social, political and historical themes of the epic; Nick Sutton highlights the complex religious doctrines found in it; George Bailey, David Shulman and James Laine compare the epic to other instances of Sanskrit literature, referring to various regional stories that were based on the themes in the *Mahabharata.*

In colonial and postcolonial India, the *Mahabharata* has been a primary focus of Indian scholarship, and scholars have variously analysed the symbolism and social relevance of the epic. Modern scholars gradually imparted to the *Mahabharata* various levels of symbolism. V.S. Sukhthankar gives multiple levels of meaning to the narrative of the epic. (Sukhthankar, 1957, 124). He refers to a violent fratricidal war between two warring families at the first level which is interpreted as an ethical battle between *dharma* and *adharma* at the second level; at the third level is provided a transcendental, allegorical interpretation of the war as the eternal battle between good and evil as symbolised by Arjuna, the Super-Man's struggle against the Kauravas. Arjuna is guided by Krishna who represents the supreme Soul, analyzing and commenting enigmatically on the mystery of creation.

One other significant branch of scholarship analyses the general 'Indo- European' tradition in the epic and its similarities with classical literatures of Greece, north-western Europe and Japan, which reflect the close interaction among old civilisations of the ancient world. Evidences left behind by sailors, armies, merchants, as well as by the records of Megasthenes and a host of other historical evidence in the shape of loan words and coins further substantiate this cultural proximity and interchange of ideas. Consequently, myths of Sita and Helen have many striking similarities that may have resulted from contact between Greek and Indian cultures; comparisons may also be drawn between the myth of Saranyu and the Kojiki of ancient Japan, which is the oldest extant chronicle of that country. The *Kojiki* (Record of Ancient Matters) contains mythological stories focusing on the creation of various deities. In the myth of Saranyu of the Rig-Veda, Saranyu disguises herself as a mare and escapes from her husband Surya, leaving behind a double or shadow- wife. As a mare (or horse, which symbolises freedom), Saranyu is symbolically free to live life on her own terms, while her shadow-self performs wifely duties as Surya's wife. This 'splitting' of Saranyu into two personalities or selves may be related to modern psychoanalysis which states that splitting often occurs consequent to a trauma, when the false self surfaces to protect the 'real' or inner self. A similar instance of 'splitting' may be found in the myth surrounding Sita whom the god of Fire replaced by an illusory Sita, unknown to all except Rama. This illusory Sita was later taken away by Ravana, while the 'real' Sita remained in Agni's protection. Eventually, Rama regained the 'real' Sita after her ordeal by Fire, and the 'shadow' Sita was reborn as Draupadi, who emerged fully grown from fire. (Doniger, 15).

One of the most important trends pertaining to the mythological narrative of the *Mahabharata* in recent times is the focus on gender- related issues and significantly, gendered roles of different characters specifically contribute to the development of the epic's narrative :

> … gender is of fundamental importance throughout the *Mahabharata*. Indeed … along with *dharma* and *varna*, gender is one of the most central and one of the most contested issues in the text. … The *Mahabharata* is one of the definitive cultural narratives in the construction of masculine and feminine gender roles in ancient India, and its numerous tellings and retellings have helped shape Indian gender and social norms ever since.
>
> (Brodbeck and Black, 10).

Micro- studies based on individual female characters in the epic, as discussed in 'Epic women: east and West – some observations' (Bhattacharya, 1995, 67-83), for example, have thrown light on many interesting features of classical Indian feminism in this male- authored text. Both the *Ramayana* and the *Mahabharata* relate instances of outstanding women, who demonstrate striking features of femininity in the classical Indian context. Chief among these women are the *Pancha-Kanya* or the five virgins. The *Ahinik Sutravali* regards the *Pancha-Kanya* as *pratah smaraniya* : 'to be invoked at dawn', in order to destroy one's greatest failings:

Ahalya, Draupadi, Kunti, Tara, Mandodari tatha/

Pancha – Kanya smarennityam mahapataka nashaka// (Sharma, 11)

[*"Ahalya, Draupadi, Kunti, Tara and Mandodari*

Invoking daily the virgins five

Destroys the greatest failings,"] ((Bhattacharya, 2005, 11)

Questions are often raised as to why these women, who either had extra-marital affairs or more than one husband, were referred to as 'virgin' or *Kanya* and why at all they have been considered to have redemptive qualities, thereby being revered as the *Pancha Kanya*. The answers to these questions lie in the ancient concepts of morality and femininity – a woman could simultaneously be considered. 'fallen' and 'virtuous' at the same time, and could be regarded as 'one-in-herself', an autonomous entity, as Dr. M. Esther Harding observes. (Bhattacharya, 2005, 64). Furthermore the term K*anya* has deeper connotations than merely its etymological meaning (Bhattacharya, 2005, 9). of a very young, unmarried girl :

> Being a *Kanya* has nothing to do with the physical status of 'virgo intacta' or sexual experience … The boon of virginity is not just a physical condition but refers to an inner state of the psyche that remains untrammelled by any slavish dependence on another, on a particular man. She is 'one-in-herself ', an integrated personality. (Bhattacharya, 2005, 63)

This impeccable analysis connects the ancient implication of the word to the concept of new feminism that swept over Europe and America in the late 1960s, and the feminism of the pre-twentieth century writers of the inter-war years, when it was felt that:

> … if one is a woman, one is often surprised by a sudden splitting off of consciousness … when, from being the natural inheritor of [a] civilization, she becomes on the contrary, outside of it, alien and critical. (Lodge, 346).

Epic women in the *Mahabharata* like Satyavati, Kunti and Draupadi all display this modern concept of a strikingly individualistic feminine consciousness or,'female culture' that, as Gerda Lerner states, exists within the 'general culture'of men and women' :

> Women live their social existence within the general culture and whenever they are confined by patriarchal restraint or segregation into separateness (which always has subordination as its purpose), they transform this restraint into complementarity (asserting the importance of woman's function, even its 'superiority') and redefine it. Thus, women live a duality – as members of the general culture and as partakers of women's culture. (Lerner, 346).

Kate Millet similarly states that gender distinctions simultaneously imply differences in behaviour between men and women as well as cultural differences: '…male and female are really two cultures and their life experiences are utterly different.' (Millet, 31). Furthermore, the personality of the *Kanya* is complex, being a combination of the Anima and the Animus, as C.G. Jung analysed:

> The Anima represents the feminine aspects of the male psyche, e.g. gentleness, tenderness, patience, receptiveness, closeness to nature [and] readiness to forgive …. . The Animus is the male side of a female psyche : assertiveness, the will to control and take charge [and a] fighting spirit (Jung, 198).

These qualities are found simultaneously in the five *Kanyas* for they individually display masculine and feminine characteristics within the literary and, to a certain extent, the social context of ancient India (Guha Niyogi, 91-108). Of course, it must be remembered that :

> Gendered roles in narrative literature are not merely reflections of or instructions for the real world; they are always also artistic and metaphorical literary devices, and sometimes gendered symbolism in the text gives added meaning at a textual level without necessarily referring to a social reality. (Brodbeck and Black, 14).

Gender- related issues pertaining to ancient South Asian society were addressed for the first time in *The Position of Women in Hindu Civilisation* by A. S. Altekar where the author asserted that women in ancient India were more respected than their contemporaries in ancient Greece and Rome, but this changed with the beginning of the Christian era:

> Women once enjoyed considerable freedom and privileges in spheres of family, religion and public life; but as centuries rolled on, the situation went on changing adversely.
>
> (Altekar, 335).

However, this idyllic picture of women in the Vedic age has since been questioned by later critics who feel that this 'Altekarian paradigm', while 'influenc[ing] and even dominat[ing] historical writing', has 'virtually crippled the emergence of a more analytically rigorous study of gender relations in ancient India,' (Chakravarti, 80), for there was 'an abrupt decline in the status of woman which takes place as Draupadi replaces Kunti as the central female character in thepic.' (Bhattacharya , 1995, 73).

3

This marginalisation of women as well as those born of low caste or who were uneducated in ancient Indian society as reflected in the *Mahabharata* is clearly implied in the epic as well as in *Bhagavata Purana*, 1.4.25 which records that Vyasa composed the epic, also called 'the fifth Veda', out of compassion for women , *sudras* and the uneducated *brahmanas* or twice borns (*dwija*). Modern critics like James Fitzgerald assert that some *Mahabharata* versions that contain the legend of Ganesha writing the entire text as recounted to him by Vyasa, 'came to be the Veda of women and sudras'. (Fitzgerald, 185).

Instances of marginalisation in the epic are numerous, and interestingly, many of the marginalised characters are outstanding personalities and contribute significantly to the dramatic unfolding of events in the epic . The mythical composer of the *Mahabharata* himself belonged to the marginalised community, being the dark- skinned illegitimate son of Satyavati, of the Nishada race, the daughter of a fisherman. Satyavati agrees to the demands of the sage Parashara for sexual union on condition that her 'virginity' would remain intact, that she would lose her fishy odour, and be blessed with eternal youth, like Helen, and that her illegitimate son Vyasa, would be a renowned man:

> Satyavati said, "Best of twice-born,
> Ever you honour others.
> Act that neither my father nor anyone
> Knows anything. Act that
> My virgin status isn't ruined.
> May your son be
> like you wondrously gifted.
> May my body be
> forever fragrant;
> May my youth be
> forever fresh, ever new." (Lal, 126-7)

The qualities that Satyavati depicts are those of a true K*anya* as well, yet, curiously, her name is not mentioned among those who may be 'invoked at dawn'. Satyavati's liberated femininity in making no further emotional demands on Parashara, makes her emerge as a strikingly mature individual, despite the fact that she has just reached puberty, and is of low-birth. She later marries Shantanu, King of Hastinapura, on condition that her heirs would inherit the kingdom instead of her stepson, Devavrata. Later, when Vichitravirya dies without an heir, she unhesitatingly commands

her son, Vyasa ,to impregnate Vichitravirya's widows in accordance with the custom of *Niyoga*. Thus the aristocratic Kuru dynasty is replaced by the Nishada race propagated through Satyavati and Vyasa. Satyavati transcends the limitations of her birth as a low-caste woman and displays an exceptional shrewdness, keen sense of diplomacy and political acumen in emerging triumphant over the ruling Kurus to secure for herself and her descendants the right to the throne of Hastinapura. Interestingly, in an obvious effort to negate her marginalised origins and to endow her with royal hues befitting a queen, later insertions in the epic's *Adi parva,* depict Satyavati , found in the stomach of a fish, as the daughter of King UparicharaVasu of Chedi, whom he gave away to fishermen, presumably overcome by her fishy odour, though he accepts the male child found along with her. This is a clear instance of gender- bias that prevailed in ancient Indian society.

Ironically, though the Nishadas are the ancestors of the Pandavas, the former continued to live a marginalised existence and were considered dispensable, as is seen in the deliberate cruelty shown towards the Nishada community when Kunti ruthlessly engineers the deaths of the five Nishadas and their mother in the House of Lac in order to save herself and the Pandavas from the conspiracy of the Kauravas. In fact, many events of the epic are set against the burning up of the marginalised: for instance, forest –dwellers of Khandava-vana and every living creature there are burnt by Arjuna and Krishna to create Indraprastha, the new palace of the Pandavas:

> Some with burning limbs, some scorched,
> Some with eyeballs bursting into flame,
> Some reduced to ashes,
> Some wildly fleeing…
> Some jumped high up,
> Biting their lower lips,
> But dropped instantly back
> Into the raging fire below. (228, 7-8)

Instances of cruelty towards and exploitation of tribals are found in the myth surrounding the brave Ekalavya who willingly cut off his thumb as per the demands of his *guru,* Dronacharya, who feared that the tribal would supercede Arjuna as an archer. To this day, as a mark of respect to their tribesman, tribals use their second and third fingers and not their thumb, while shooting an arrow. Similar to the exploitation of Ekalavya, Bhima's son Ghatotkacha, born of the *Rakshasa* Hidimba, is ruthlessly sacrificed in the war by being made to combat with Karna, who is forced to use his javelin, *Shakti,* gifted by Indra, on the young and otherwise invincible *Rakshasa*, to kill him. Thereby, Arjuna, for whom Karna had been reserving his terrifying weapon, is saved. Again, in Vana-parva, towards the end of the epic, *Rakshasas* are projected as villains for trying to protect their territory and are killed by Bhima for attempting to abduct Draupadi. Throughout the epic, tribals are restricted and exploited and remain either literally or symbolically on the fringes of society.

Marginalisations occur within the royal family as well, at multiple levels. When Vyasa reveals to Satyavati that his sons by Vichitravirya's widows, Ambika and Ambalika, would be born blind

(Dhritarashtra) and sickly (Pandu), Satyavati, in desperation, commands him to impregnate Ambika again. The latter takes recourse to subterfuge and sends in her maid-servant in her place and Vidura is born of her. Being of low birth, Vidura is unfit to be the King of Hastinapura, and instead remains the wise counsellor of Dhritarashtra and the Pandavas.

Vidura is thus deprived of his rights of kingship due to his marginalised status. In death, too Vidura is depicted as marginalised, for though he is shown as the *avatara* of Dharma, he runs wild in the forest, is emaciated from fasting and his corpse is not cremated. His death from fasting is reminiscent of the similar death of Chandragupta Maurya after the latter abdicated and embraced Jainism. It must be remembered that the *Mahabharata* is supposed to have been written down as text (with Ganesha as scribe) to counteract the prevalence of Buddhist and Jain thought. These sects are referred to disparagingly in the epic as *paashanda*(cruel) and *kshapanak*(beggar). Vidura's death by fasting , reminiscent of the Jain tradition may well be an attempt to portray the marginalised status of Vidura as well as these emerging sects of Hinduism that were non- vedic, and did not conform to vedic practices. Furthermore, Vyasa, born of a low- caste woman and a Brahmin sage, is a '*varna- shankara'* or 'mixed –caste '; possibly, on account of his vast learning, he was socially accepted and revered as a great sage. Vidura, born of this 'mixed- caste' sage and a maid-servant is removed another step from Brahminism and is referred to as *kshatta*(son of a female slave). Purely on account of being Satyavati's grandson, he is given an almost princely status , though he is deprived of any claim to the throne as his mother is not one of the widowed queens. Perhaps for this lack of status, Duryodhana treats him with contempt. Strangely, despite being vastly learned like his father, Vidura is not accorded social recognition as a sage. Such discrimination may raise queries in our mind – was this because his father was not a 'direct' Brahmin? Why did Vyasa not take Vidura with him to the *ashrama* to bring him up as a Brahmin sage as his own father, Parashara, had done? Did Vyasa have ambitions of his son becoming the Grey Eminence of Hastinapura, the power behind the throne on which a blind king sat?

Just as the marginalised Vidura becomes the chief advisor of the King, Karna, regarded as the son of a charioteer, is the mainstay of Duryadhana . Karna is apparently the son of Kunti and Surya, the Sun-god, but actually, as Kunti herself confesses, the fathers of her sons were men, not gods. The ancient myths valorised the unknown fathers of princes to be gods, which increased their sense of nobility and majesty, arousing awe in the minds of common man. For instance, Alexander proclaimed himself to be the son of Zeus, though Philip of Macedonia was his father.

As an unmarried princess, Kunti yields to the temptation of testing Durvasa's boon and when Surya, the Sun-god, appears before her she capitulates to his demand for sexual union on condition that her 'virginity' or purity of spirit will be reinstated and that her son would resemble him. Karna, however, is marginalised at birth, being cast away by Kunti.

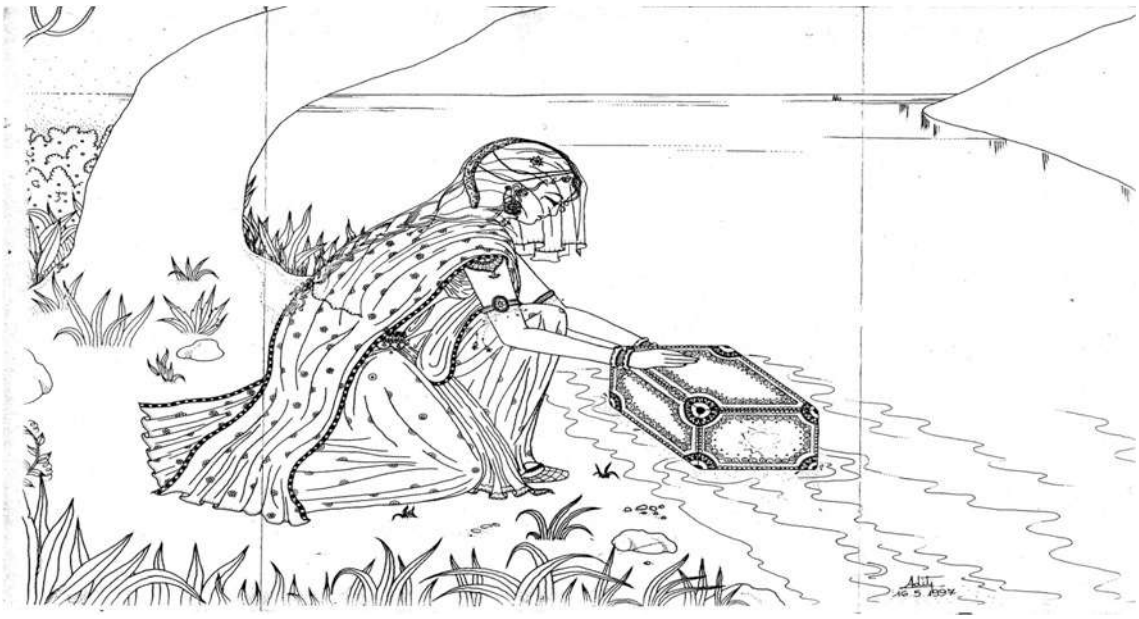

Kunti sets Karna adrift

Like Thetis who had been indirectly responsible for the death of her son Achilles, by leaving his heel vulnerable, Kunti later leaves Karna, her first-born son, vulnerable by making him promise not to kill any Pandava other than Arjuna, thus making him emotionally weak through his knowledge that he was fighting against his brothers in the Kurukshetra war - a fact that the Pandavas were unaware of. Buddhadeva Bose's modern verse-drama, Pratham Partha, displays an evocative treatment of Karna's mental agony at his own marginalised status, as he envisages the inevitability of combat with Arjuna in the forthcoming Kurukshetra war:

Karna

No one knows, Krishna, no one but I know

What the forceful pull of kinship is, what the strong attraction for one's own brother implies.

For ages for ages,

Blindly, unknowingly I have yearned

To touch, to enfold in embrace

Arjuna

Who has been nourished at Kunti's breast,

Who has been elated by Panchali's kisses.

Krishna

I have observed your heart split in two:

One part yearns to love, the other part inflexible in animosity.

Karna

Animosity? Pleasure, Krishna, the most intense pleasure!

The most intimate feeling of brotherhood, the most profound union.

Lacerated skin

Ripped flesh

Crimson surge of blood

Perspiration, trembling, fainting, agony, rejoicing –

Slaughter in ecstatic stupor uniting us.

My imprisoned wish liberated,

My thwarted passion gratified,

My private aspiration achieved –

And finally

Cessation

Of either Arjuna, or Karna. (Guha Niyogi, 2009, 239).

Married to the impotent Pandu, Kunti uses her boon to give him three sons through three different 'gods' – taking resort to the ancient, socially accepted custom of *Niyoga* which was used to propagate the family line. Duryadhana, however, resents the Pandavas, for he regards them as 'outsiders,' since they are not the direct descendants of Pandu.

Marginalisations specially occur on the basis of skin-colour. Those who are dark-skinned are considered to be outside the Brahmanical community and therefore marginalised. Interestingly, chief among the dark skinned in the epic are, of course, Vyasa, Krishna, Arjuna, Draupadi and Satyavati, the latter also having the name Kali because she is black; all these characters play important parts in the dramatic unfolding of events in the epic's narrative structure. Krishna, belonging to the *Yadava* clan, in his early youth, leads the marginalised forces of cowherds to rise against the *Kshatriya* clan of Mathura, and overthrows and kills the tyrant ruler, Kansa. Later he

leads the five Pandavas – who are'outsiders'- against the Kauravas Thus, repeatedly, Krishna leads the marginalised people to uproot the ruling class.

Draupadi, married to the five Pandavas, depicts multiple marginalisations, being dark- skinned, a woman and the only one in the epic with five husbands, for which Karna calls her a prostitute, fit to be disrobed in public. Yet, she is one of the strongest characters in the epic, emerging fully grown from a sacrificial fire.

Draupadi's emergence from sacrificial fire

Indeed, the gods ordain that she would bring about destruction to the Kshatriyas and there is a heavenly announcement on her appearance at Drupada's *yajna*:

Loveliest of ladies,

This dark-skinned beauty Krishna

Will be the cause of the destruction

Of the Kshatriyas. (169. 48)

What Oscar Wilde exclaims about Helen is equally applicable to Draupadi:

For surely it was thou, who, like a star

Didst lure the Old World's chivalry and might

Into the clamorous crimson waves of war! (Wilde, 733)

Similar to Ahalya's silent acquiescence to Gautama's wrath, Draupadi silently accepts the five Pandavas as her husbands, perhaps recalling Maudgalya's curse on her in a previous birth. (Bhattacharya, 2005, 90). Polyandry, though not common, was accepted in Vedic society, but Draupadi is unique for her purity of spirit or 'virginity' which is indestructible. Similar to the seventeen *rishikas* or *brahmavadinis* to whom the hymns of the Rig Veda were revealed, Draupadi later displays her exceptional intelligence, wisdom and amazing presence of mind when, in the face of the intense humiliation of disrobement after being dragged by her hair into open court, she challenges the very precepts of *Dharma* as she conceived it, before her elders. Draupadi's initial silence and subsequent assertiveness recalls Lopamudra's initial acquiescence to the sage Agastya and her consequent self-assurance in firmly demanding that he deck her in royal splendour if he wants a son by her. Similar to the Goddess Kali, Draupadi is revengeful and bloodthirsty, tirelessly urging her husbands to avenge her humiliation. Like Helen, she is surrounded by violence, bloodshed and war. She stands apart from other epic women in her immense psychological strength and courage which make her emerge as a sophisticated and elite woman, a fit partner for her five husbands. She displays a keen knowledge of her duties in the palace of the Pandavas, admitting to Satyabhama that not only did she strictly control the retinue of the one hundred thousand serving maids and an equal number of horses of the king and regulated their activities, but she also attended to and served the thousands of visiting Brahmins, *snatakas* and *yatis* who all ate their food from gold plates. Moreover, it is she alone who knew the income and expenditure of the king's revenue and supervised the treasury; she also displays great protectiveness towards her five husbands. Thereby she asserts an ultimate power over her husbands, her household and her kingdom (Brodbeck and Brian Black, 103-04) and displays ' a profound awareness of being an instrument in bringing about the extinction of an effete epoch, so that a new age could take birth'. (Bhattacharya , 2005, 92). Draupadi's desire for revenge on the Kauravas and Karna, however, is not limited by narrow selfish interests, but, as the *sakhi* of Krishna, she has a far nobler aim of ultimate regeneration of society, through destruction of the Kauravas. In this ability to transcend her ego in order to achieve

a higher goal through wisdom and ultimate serenity of spirit, she emerges as one of the most outstanding women figures in classical mythology. Indeed, Draupadi may be regarded as the embodiment of *Stree Shakti* that triumphs over formidable obstacles to reinforce her femininity and individuality. We must remember that Draupadi is not the only outstanding instance of *Stree Shakti* in Indian mythology. The *Vedas, Manusamhita, Nineteen Samhitas* and *Kautilyam Arthashastram* all advocated equality of women. The *Rig Veda* recounts the names of seventeen *rishikas*, women of exceptional intelligence and abilities, namely, Aparta, Devyani, Ghosha, Indrani, Jarita, Juhu, Kadru, Lopamudra, Paulomi, Romasa, Savitri, Sharanga, Shraddha -Kamayani, Urvashi, Vak-Ambhrini and Vishvavara. The Sama Veda refers to four more women – Akrishtabhasha or Purvaschhika, Ganpayana, Nodha and Shikatanivavari or Utararchchika – all revered and held in high esteem for their wisdom and independence of spirit. They reinstated one aspect of ancient Indian femininity, namely, equality in education and public life, which continues to be a source of inspiration to modern women.

It is interesting that epic characters like Vyasa, Satyavati, Vidura, Karna, the Pandavas, Ekalavya, Ghatotkacha, Draupadi and above all, Krishna – all stand out in society because of their individual abilities and merit. Does the *Mahabharata,* then, representing an austere Brahmanical society, send us this message that human action and human achievement in ancient times – as in modern times – are far superior to narrow social discriminations of colour, gender, caste and creed? Marginalisations in the epic, be it in the royal family, the 'upper castes', women or among tribals, often cease to matter in the face of outstanding merit, towering personality, courage and strength of character.

This 'message' of the *Mahabharata,* while pertaining to ancient Indian society, is equally relevant in postcolonial times. An analysis of the epic from these perspectives of gender, narrative and marginalisation, reveals interesting features that continue to make the *Mahabharata* socially and culturally relevant in the modern age, influencing and moulding the evolving multiplicities of human responses and human behaviour.

———————————————————————————

Works Cited

Altekar, A.S. *The Position of Women in Hindu Civilisation: from prehistoric times to the present day,* (Delhi: Motilal Banarsidass, 1938, rpt.1959). Print.

Bhattacharya, Pradip. 'Epic Women: east and west – some observations', *Journal of the Asiatic Society of Bengal,* (1995, 4th series) 37.3. Print.

—- *Narrative Art in the Mahabharata* (New Delhi: Dev Publishers and Distributors, 2012). Print.

— *Pancha Kanya, The Five Virgins of Indian Epics: A Quest in Search of Meaning* (Calcutta: Writers Workshop, 2005). Print.

Biardeau, Madeleine. *Hinnduism: the Anthropology of a Civilisation,* trans. Richard Nice, Essay on

Purana, 'Some more considerations about textual criticism',1968. (Delhi: Oxford University Press,1989). Print.

Brodbeck, Simon and Black,Brian. 'Introduction', *Gender and Narrative in the Mahabharata*

(Routledge: London and New York,2007) . Print.

Chakravarti, Uma.'Beyond the Altekarian Paradigm: towards a new understanding of gender relations in early Indian History' in Kumkum Roy (ed.)_*Women in Early Indian Societies*(New Delhi : Manohar, 1999) . Print.

Doniger, Wendy. Brahmavaivarta Purana 2.14.1-59 in *Splitting the Difference, Gender and Myth in*

Ancient Greece and India (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1999). Print.

Dumézil, Georges._*The Destiny of a King,* trans. Aif Hiltebeitel. (Chicago: University of Chicago Press, 1973). Print.

Fitzgerald, James L. 'India's fifth Veda: the *Mahabharata's* presentation of itself' in Arvind Sharma (ed.)_*Essays on the Mahabharata*_(Leiden: Brill. 1991) Print. (First published in *Journal of South Asian Literature,*22. 1, p. 185).

Guha Niyogi, Ralla. 'The Magic Suggestiveness of *Pancha Kanya* : An Exploration into Some Aspects of Classical Indian Feminism' pub. *Jadavpur University Essays and Studies,* Kolkata, Vol. XIX- XX, 2005- 06, pp.91- 108. Print. In this essay, I have provided a detailed discussion of the responses and actions of the five 'virgins' of the Indian epics.

——.'The First Partha', trans. of 'Pratham Partha' by Buddhadeva Bose. *Romanticism and its Legacies,* ed. Ralla Guha Niyogi,(Kolkata: Fine Prints, 2009). Print.

Handoo, Jawaharlal. 'Epic Metaphor in the Modern Context of Indian Society', from *The*

Mahabharata in the Tribal and Folk Traditions of India, ed. K.S. Singh (Shimla: Indian Institute of

Advanced Study, 1993) . Print.

Harding, M. Esther. *Woman's Mysteries,* (London: Rider, 1971) . Print.

Heiltebetel, Alf. *The Cult of Draupadi*,_volume 1,_*Mythologies: from Gingee to Kurukshetra,* (Chicago

and London: University of Chicago Press, 1988). Print.

Hirst, Jacqueline. 'Myth and History' in Paul Bowen (ed.) *Themes and Issues in Hinduism,* London:

Cassell, 1998. Print.

Jung, C. G. 'The Development of Personality'. *Collected Works,* Vol. 17. From Pradip Bhattacharya, *Pancha Kanya* op.cit. p. 20 ff, where the author provides an extensive analysis of the psychoanalytical theories of C.G Jung and Emma Jung, and relates these to the psychology of the K*anya[s].*

Lal, P. *The Mahabharata, the complete Adi Parva,* (Calcutta: Writers Workshop,2005). Print. All references from the epic are from this edition and are included parenthetically in the text.

Lerner, Gerda. 'The Challenge of Women's History', *The Majority Finds its Past : Placing Women in History* (New York : Oxford University Press, 1979). Print.

Mill, J.S. *A System of Logic,* (London: John Murry 1843). Print.

Millet, Kate. *, Sexual Politics,* (London: Abacus, 1972).Print.

Patton, Laurie L. 'How do you conduct yourself?' in Simon Brodbeck and Brian Black, *Gender and*

Narrative in the Mahabharata . (Routledge: London and New York, 2007) . Print.

Proudfoot, I. 'Interpreting *Mahabharata* episodes as sources for the history of ideas' 1979,

Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute, (Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute,

1933-59). Print.

Said, Edward W. 'Introduction' to *Orientalism* , (New York: Vintage Books, 1979). Print.

Sharma , Liladhar Parvatiya. *Ahinik Sutravali,* (Delhi: Rajpal and Sons, 1996). Print.

Showalter, Elaine. 'Feminist Criticism in the Wilderness', from David Lodge,(ed) *Modern Criticism and*

Theory (England : Longman Group, 1988, rpt. 1991). Print.

Sukhthankar, V. S. *On the Meaning of the Mahâbhârata* (Bombay: The Asiatic Society of Bombay, 1957). Print.

——'Prolegomena', *The Mahabharata,* ed. V.S. Sukhtankar,(Poona: Bhandarkar Oriental Research

.Institute., 1933-59) . Print.

Thomas, K. *Man and the Natural World : A History of Modern Sensibility*, (New York: Pantheon

Books,1983) . Print.

Tylor, E. B. *Primitive Culture,* 2 vols. (London: John Murry, 1871). Print. This contains a detailed

discussion on Evolutionary Theory.

Wilde, Oscar. "The New Helen", *Complete Works,* (Collins: London and Glasgow, 1948, rpt. 1977). Print.

Willis, R 'The Meaning of the Snake' in R.G. Willis (ed.) *Signifying Animals : Human Meaning in the*

Natural World (London :Unwin Hyman, 1990) . Print.

Woolf, Virginia. *A Room of One's Own.*. From David Lodge,(ed) *Modern Criticism and Theory*

(England : Longman Group, 1988, rpt. 1991). Print.

সমাজবিজ্ঞান মূলক

On Social Science

সমসাময়িককালের সদ্‌গুণসংক্রান্ত দার্শনিক মতবাদ

ডঃ অপর্ণা সাধু,
সহকারী অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ,
বাসন্তী দেবী কলেজ
ই-মেইল—aparnaphils73@gmail.com

সারসংক্ষেপ

এ্যারিস্টটলের সদ্‌গুণসম্পন্ন জীবনযাপনের ধারণা আধুনিককালের দর্শন চিন্তায় ক্রমশ গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছিলো। আমরা লক্ষ্য করি যে, আধুনিককালের দর্শন ভাবনায় ব্যক্তির বিচারকে বা তার চরিত্র গঠনের উপর কোনরূপ গুরুত্ব আরোপ না করে ব্যক্তির কর্ম এবং কর্মের উদ্দেশ্য বিচারের প্রতিই মনোনিবেশ করা হয়েছিলো। সমসাময়িককালের কোনও কোনও নীতিদার্শনিক আধুনিককালের বস্তুগত, নীতি-নির্ভর, ব্যক্তিনিরপেক্ষ নৈতিকতার বিরোধিতা করে এ্যারিস্টটলের চরিত্রসংক্রান্ত আলোচনাকে পুনরায় নৈতিক আলোচনার কেন্দ্রে স্থাপন করতে আগ্রহী হলেন। এঁদের মতে, নৈতিকতার চরমলক্ষ্য হলো মঙ্গলময় জীবনযাপন করা। তাঁরা মনে করেছেন, ব্যক্তির চরিত্র যদি মহৎ হয় সেই ব্যক্তি যে কর্ম সম্পাদন করবেন তা মঙ্গলময় বিষয়কেই প্রতিফলিত করবে। ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে দার্শনিকেরা পুনরায় চরিত্রে সদ্‌গুণ অর্জনের উপর গুরুত্ব আরোপ করলেন। এঁরা সদ্‌গুণ অর্জনকে প্রয়োজনীয় বলে মনে করলেও এবং ব্যক্তির চরিত্রকে গুরুত্ব দিলেও তাঁদের মতের মধ্যে বহু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কোনও কোনও সদ্‌গুণসংক্রান্ত নীতিদার্শনিক নৈতিকতায় কর্মের বিচারকে গৌণ বলে মনে করে চরিত্রে সদ্‌গুণ অর্জন করাকেই নৈতিকতার মূল বা প্রধান লক্ষ্য বলে স্বীকার করলেন। আবার কোনও কোনও নীতিদার্শনিক যেমন, জন রলস ব্যক্তির চরিত্রে সদ্‌গুণ অর্জনের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিলেও কান্টকে অনুসরণ করে ব্যক্তির কর্মকে এবং কর্তব্যবোধ, বাধ্যতাবোধ ইত্যাদি ধারণাগুলিকেই মূলত গুরুত্ব দিলেন। প্রথম প্রকার দার্শনিকদের মতবাদকে নীতিদর্শনে সদ্‌গুণ বিষয়ে চরমপন্থী মতবাদ এবং দ্বিতীয় প্রকার মতবাদকে নরমপন্থী মতবাদ বলা যেতে পারে। আমি আমার আলোচনায় সমসাময়িক সদ্‌গুণ সংক্রান্ত নীতিদার্শনিকদের মতবাদ আলোচনা করে তাঁদের মতবাদের মধ্যে কি পার্থক্য তা তুলে ধরব।

সূচক-শব্দ— বাধ্যতাবোধ, চরিত্র, সদ্‌গুণ, আদর্শ ব্যক্তি।

এ্যারিস্টটলের সদ্‌গুণসম্পন্ন জীবনযাপনের ধারণা আধুনিককালের দর্শন চিন্তায় ক্রমশ গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছিলো। আমরা লক্ষ্য করি যে, আধুনিককালের দর্শন ভাবনায় ব্যক্তির বিচারকে বা তার চরিত্র গঠনের উপর কোনরূপ গুরুত্ব আরোপ না করে ব্যক্তির কর্ম এবং কর্মের উদ্দেশ্য বিচারের প্রতিই মনোনিবেশ করা হয়েছিলো। সমসাময়িককালের কোনও কোনও নীতিদার্শনিক আধুনিককালের বস্তুগত, নীতি-নির্ভর,

ব্যক্তিনিরপেক্ষ নৈতিকতার বিরোধিতা করে এ্যারিস্টটলের চরিত্রসংক্রান্ত আলোচনাকে পুনরায় নৈতিক আলোচনার কেন্দ্রে স্থাপন করতে আগ্রহী হলেন। এঁদের মতে, নৈতিকতার চরমলক্ষ্য হলো মঙ্গলময় জীবনযাপন করা। এঁরা নৈতিকতায় ব্যক্তির কর্ম অপেক্ষা ব্যক্তির চরিত্রকেই গুরুত্ব দিতে ইচ্ছুক। তাঁরা মনে করেছেন, ব্যক্তির চরিত্র যদি মহৎ হয় সেই ব্যক্তি যে কর্ম সম্পাদন করবেন তা মঙ্গলময় বিষয়কেই প্রতিফলিত করবে। ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে দার্শনিকেরা পুনরায় চরিত্রে সদ্‌গুণ অর্জনের উপর গুরুত্ব আরোপ করলেন। ১৯৫৮ সালে এলিজাবেথ এ্যানস্কোম্ব তাঁর "Modern Moral Philosophy"[১] নামক প্রবন্ধে প্রথম কর্মকেন্দ্রিক নৈতিকতার বিরোধিতা করে ব্যক্তির চরিত্র, আবেগ, ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদিকে গুরুত্ব দানের কথা বললেন। পরবর্তীকালে ফিলিপা ফুট, ম্যাকিনটায়ার প্রমুখেরা চরিত্রকেন্দ্রিক নৈতিকতার আলোচনার উপর গুরুত্ব প্রদান করলেন। তবে অনেকেই সদ্‌গুণ অর্জন করাকেই নৈতিকতার মূল বা প্রধান লক্ষ্য বলে স্বীকার করলেন। আবার কোনও কোনও নীতিদার্শনিক যেমন, জন রলস ব্যক্তির চরিত্রে সদ্‌গুণ অর্জনের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিলেও কান্টকে অনুসরণ করে ব্যক্তির কর্মকে এবং কর্তব্যবোধ, বাধ্যতাবোধ ইত্যাদি ধারণাগুলিকেই মূলত গুরুত্ব দিলেন। প্রথম প্রকার দার্শনিকদের মতবাদকে নীতিদর্শনে সদ্‌গুণ বিষয়ে চরমপন্থী মতবাদ এবং দ্বিতীয় প্রকার মতবাদকে নরমপন্থী মতবাদ বলা যেতে পারে। প্রথম প্রকার দার্শনিকেরা কর্ম এবং কর্মের ফলকে নৈতিক অবধারণের বিষয় বলে গণ্য করতে রাজী না। তাঁরা সেগুলিকে সম্পূর্ণভাবে অপসারণ করে ব্যক্তির চরিত্রকে এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, আবেগ, ইচ্ছা প্রবণতাকে নৈতিক আলোচনার বিষয়বস্তু বলে মনে করলেন। এককথায় বলা যায় তাঁরা নৈতিক মনস্তত্ত্বের আলোচনায় মনোনিবেশ করলেন। এই দৃষ্টিভঙ্গিটি Replacement Theory[২] বলে অভিহিত হয়। কিন্তু দ্বিতীয় দলের দার্শনিকেরা কান্টের তত্ত্বের বিশুদ্ধতা ও যৌক্তিকতা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন বলেই কান্টের কর্মসংক্রান্ত মূল্যায়নগুলিকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করার পক্ষপাতি ছিলেন না। অথচ নিছক নীতি অনুসারে কর্মসম্পাদনের ফলে উৎপন্ন সমস্যাগুলি সম্পর্কে অবগত ছিলেন বলেই ব্যক্তির চরিত্র গঠনের প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করেছিলেন। তাই কর্মের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গেই চরিত্র গঠনের প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করেন। তাই তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে Reductionist View[৩] বলা হয়, যেহেতু তাঁরা কর্মের বিচারের সঙ্গে সঙ্গেই ব্যক্তির মনোভাব বিচার করার গুরুত্বও অনুধাবন করেছিলেন।

নরমপন্থী সদ্‌গুণসংক্রান্ত নীতিদার্শনিকদের অভিমত

নরমপন্থী সদ্‌গুণসংক্রান্ত নীতিদার্শনিকদের অভিমত অনুসারে, ব্যক্তির চরিত্র গুরুত্বপূর্ণ হলেও, নীতিনির্ধারিত কর্মই নৈতিকতার মূল বিষয়। কর্মকর্তা নীতিকে অনুসরণ করে নৈতিক কর্ম সম্পাদন করবেন। তবে সেক্ষেত্রে ব্যক্তির চারিত্রিক সদ্‌গুণ অর্জন প্রয়োজনীয়। ব্যক্তি সৎ চরিত্রের অধিকারী না হলে নৈতিক কর্মে নীতিকে অনুসরণ করতে সক্ষম হবে না। প্রতিটি নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সদ্‌গুণ ব্যক্তির চরিত্রে বর্তমান থাকলেই নীতি অনুসরণ করা সহজ হয়। সমসাময়িককালে উইলিয়াম ফ্রাংকেনা, গ্রেফরী ওয়ারনক প্রমুখের মতে, ব্যক্তি যদি সৎ চরিত্রের অধিকারী হয় তাহলে 'সদা সত্য কথা বলা উচিত'-এই নৈতিক নিয়মকে কর্তব্য বলেই গণ্য করবে। ব্যক্তি পরোপকারিতা নামক সদ্‌গুণের অধিকারী হলেই পরোপকার করাকে উচিত কর্তব্য বলে গণ্য করবে। ফলে কর্তব্যকর্ম ব্যক্তির সৎ চারিত্রিক প্রবণতা থেকেই নিঃসৃত হবে। এই সকল দার্শনিকেরা নৈতিকতায়

কর্তব্য, দায়বদ্ধতা, বাধ্যবাধকতা এগুলির গুরুত্বকে অস্বীকার করেন না। এঁরা কর্মকেন্দ্রিক নৈতিকতাকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ না করে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে নৈতিক কর্মের ব্যাখ্যা দানে উদ্যোগী হলেন। গ্রেফরী ওয়ারনক মনে করেন, নৈতিকতায় সঠিক কর্ম সম্পাদনের জন্য সৎ চরিত্রের অধিকারী হওয়া গুরুত্বপূর্ণ। তিনি মহৎ চরিত্রের অধিকারী হওয়ার লক্ষ্যে চারটি সদ্‌গুণকে প্রধানত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছেন। সেগুলি হলো সংযম, পরোপকারিতা, ন্যায্যতা এবং উদারমনস্কতা। তাঁর মতে, অন্যকে আঘাত করা, অপরকে দুঃখ দেওয়া সঠিক কর্ম নয়। আমাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অন্যকে আঘাত করা হলেও সদ্‌গুণ অর্জনের দ্বারা আমরা এমন মনোভাবকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। সদ্‌গুণ চরিত্রে অর্জন করলে ব্যক্তি অপরকে আঘাত করা অনুচিত বলে মনে করবে, সেই কর্ম করা থেকে বিরত থাকবে। ন্যায্য মনোভাবের কারণেই সকলের মঙ্গল আমাদের নৈতিক লক্ষ্য হবে, ব্যক্তি সকলকে সহযোগিতা করবো। পরোপকারিতা নামক সদ্‌গুণ অর্জন করলে আমরা অপরকে সাহায্য করা উচিত বলে স্বীকার করবো। আমাদের সাধারণ প্রবৃত্তি অনুসারে আমরা প্রিয়জনের প্রতি অধিক মনোযোগ, আগ্রহ প্রকাশ করি এবং পক্ষপাতমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। তবে সকলের ক্ষেত্রে একই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কর্তব্যরূপে বিবেচনা করবো যদি ন্যায্যতা অর্জন সম্ভব হয়। কেননা ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি নিরপেক্ষ বিচারে সমর্থ। নিরপেক্ষ বিচারের জন্য স্পষ্ট মন বা উদার মনের অধিকারী হওয়া প্রয়োজন। ফ্রাঙ্কেনাও মনে করেন, নৈতিকতায় মহৎ কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে নৈতিক নিয়ম এবং সদ্‌গুণ উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ। তবে তিনি নৈতিকতার ক্ষেত্রে সদ্‌গুণ অর্জনকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করলেও সদ্‌গুণ অর্জনকে মুখ্য বলেননি। তিনি নীতি অনুসরণ করাকেই মুখ্য বলে মনে করেছেন। কেননা তাঁর মতে, কর্মের প্রকৃতি দ্বারাই কর্মকর্তার বিচার করা যায়। ব্যক্তির উদ্দেশ্য, তার প্রেষণা মহৎ কিনা তা যাচাই করার ক্ষেত্রে ব্যক্তির কর্মটি নীতি অনুসারী কিনা—তা বিচার করতে হয়। ফ্রাঙ্কেনা একটি কর্মবাদী তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছেন। তিনি সদ্‌গুণগুলিকে কর্মের সাথেই যুক্ত করেছেন। তিনি মনে করেন, কর্মই আমাদের নৈতিক অবধারণের মুখ্য বিষয়বস্তু। কর্মের উদ্দেশ্যটি বিচার করলেই ব্যক্তির মনোভাব জানা সম্ভব হবে। নীতির প্রয়োগ সম্পর্কে সদর্থক মনোভাবের কারণেই তিনি মনে করেছেন কর্মের উদ্দেশ্যটি নৈতিক হবে যদি আমরা নীতি অনুসরণকেই কর্তব্য বলে মনে করি। কিন্তু তিনি একথা স্বীকার করেছিলেন যে, নীতি অনুসরণের মনোভাব যদি না থাকে তবে নীতি পালন করা সম্ভব হয় না। ফলে সদ্‌গুণ অর্জনের মাধ্যমে আমাদের মনকে প্রস্তুত করার প্রয়োজন আছে। আমাদের ইচ্ছা, প্রবণতা ইত্যাদি যদি নৈতিক কর্ম পালনে আমাদের উদ্বুদ্ধ করে তবেই নীতিপালন সম্ভব হবে, তাই তাঁর মতে, '...principle without traits are impotent and traits without principle are blind.'[৪] তবে একথা স্পষ্ট যে, তাঁরা সদ্‌গুণের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করলেও তাকে লক্ষ্য বলে স্বীকার করেননি। আবার তাঁরা সেই সকল সদ্‌গুণগুলিকেই প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছেন যেগুলি নীতি পালনের জন্যই কেবল সহায়ক। অর্থাৎ চরিত্র গঠন তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁরা সদ্‌গুণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন কেবলমাত্র সৎ কর্ম পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য।

চরমপন্থী সদ্‌গুণসংক্রান্ত মতবাদ

এলিজাবেথ, এনস্কোম্ব, ফিলিপা ফুট, রোসালিণ্ড হার্স্টহাউস প্রমুখ চরমপন্থী সদ্‌গুণসংক্রান্ত দার্শনিকেরা

এ্যারিস্টটলকে অনুসরণ করে ভালো জীবনযাপনকেই জীবনের লক্ষ্য বলে মনে করেছেন। ফলে তাঁরা চারিত্রিক উৎকর্ষের প্রতি দৃষ্টি আরোপ করতে উদ্যোগী হলেন। সমসাময়িককালের এই সকল দার্শনিকদের মতে, নৈতিকতায় ব্যক্তির কর্মকে বিচার করার পরিবর্তে ব্যক্তিকে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। ব্যক্তির সৎ মনোভাব, তার ইচ্ছা, প্রবণতা ইত্যাদিকেই তাঁরা গুরুত্ব দিলেন; ব্যক্তিসাপেক্ষ বিষয়, পরিস্থিতির মূল্যায়নকে নৈতিকতায় গুরুত্বপূর্ণ বলে দাবি করলেন। তাঁদের মতে, কেবলমাত্র বস্তুনিষ্ঠ নিয়মকেই কেবলমাত্র অনুসরণ করা নয়, ব্যক্তির ব্যক্তিসাপেক্ষ বিষয়গুলিকেও গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। কেননা নৈতিকতায় কেবলমাত্র বুদ্ধিকে গুরুত্ব দিলে এবং ব্যক্তির আবেগ, ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদিকে অপ্রয়োজনীয় মনে করলে নৈতিকতা আংশিক বিষয়কে প্রতিফলিত করবে। এঁদের মতে, আমরা ব্যক্তির কর্মকে মূল্যায়ন করি না, বরং ব্যক্তিকেই মূল্যায়ন করে থাকি। ব্যক্তিকেই প্রশংসা বা নিন্দা করে থাকি। যে মনোভাবগুলি প্রশংসিত হয় সেগুলিকেই আমরা অনুশীলন করি। এরজন্য তাঁরা সদ্‌গুণ অর্জনকে নৈতিকতায় গুরুত্বপূর্ণ বলে দাবি করেন। ব্যক্তি যদি সৎ চরিত্রের অধিকারী হয় তবে ব্যক্তি স্বতঋস্ফূর্তভাবে নৈতিক কর্ম সম্পাদন করবে। সেখানে কোন বাধ্যবাধকতা অনুভব করবে না, স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে ন্যায়সঙ্গত কর্ম সম্পাদন করবে। রাষ্ট্র সমাজকে সুন্দরভাবে পরিচালিত করার লক্ষ্যে কতকগুলি নিয়ম নাগরিকদের মান্য করতে বাধ্য করে। কখনও কখনও নাগরিকদের ইচ্ছার সঙ্গে সেই রাষ্ট্রপ্রণীত নিয়মের সংঘাত দেখা যায়। তথাপি সকল ব্যক্তি সেই নিয়ম মান্য করতে বাধ্য থাকেন। কেননা নিয়ম লঙ্ঘন করলে লঙ্ঘনকারীকে শাস্তি পেতে হয়। অর্থাৎ ব্যক্তির উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ম আবশ্যিকরূপে ধার্য হয়। সেরূপ ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে নীতির আবশ্যিকতা অনুভূত হয়। "Compulsion occurs where man is prevented from realizing his natural desire."[৫] কিন্তু সৎ চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তির ইচ্ছা, প্রবৃত্তি নীতিবিরুদ্ধ নয়। এরূপ ব্যক্তির মানসিক ইচ্ছা সর্বদা মঙ্গলময় বিষয়কে প্রতিফলিত করে। অর্থাৎ মহৎ ব্যক্তির ইচ্ছার সঙ্গে নৈতিক কর্মের কোন বিরোধ নেই। সদ্‌গুণজাত ইচ্ছা থেকেই নৈতিক কর্ম সম্পাদিত হয়। সুতরাং সৎ চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তির ইচ্ছাকে সংযত করার লক্ষ্যে নীতি প্রয়োগের প্রয়োজন নেই। মহৎ ব্যক্তি তার ইচ্ছার বিপরীতে কোন কর্ম সম্পাদন করে না। এরূপ ব্যক্তি আবশ্যিকভাবেই ন্যায়সঙ্গত কর্ম সম্পাদন করে। যে ব্যক্তির মানসিক ইচ্ছার সঙ্গে সম্পাদিত কর্মের বিরোধিতা থাকে তাকে Continent[৬] ব্যক্তি বা অসংযত ব্যক্তি বলা হয়। চরমপন্থী সদ্‌গুণসংক্রান্ত নীতিদার্শনিকেরা ব্যক্তির চরিত্রের উপর এতটাই গুরুত্ব আরোপ করেছেন যে, তাঁরা মনে করেন যে নীতি পালনের জন্য বলপূর্বক চারিত্রিক সংযম বজয় রাখা নৈতিকতার বিরোধী। যে ব্যক্তি নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেবলমাত্র ন্যায়সংগত কর্ম পালনের জন্য নীতি অনুসরণ করেন তিনি হলেন Continent বা সংযমী ব্যক্তি। এরূপ ব্যক্তিকে তাঁরা নৈতিক ব্যক্তি বলে অভিহিত করবেন না। চরিত্রকে মুখ্য গুরুত্ব দেওয়ার ফলেই তাঁরা সেই ব্যক্তিকেই নৈতিক ব্যক্তি বলে মনে করবেন যিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে নৈতিক কর্ম সম্পাদন করেন। সেই অর্থে তাঁদের মতে, মহৎ ব্যক্তিই একমাত্র নৈতিক ব্যক্তি বলে গ্রাহ্য হবে। কান্ট সংযত ব্যক্তিকে নৈতিক ব্যক্তি বললেও সদ্‌গুণসংক্রান্ত নীতিতাত্ত্বিকেরা ইচ্ছাকে দমন করার কথা স্বীকার করেন না বলে বাধ্যতাবোধে কর্তব্য পালনকারী ব্যক্তিকে তাঁরা সৎ চরিত্রের অধিকারী বলে স্বীকার করবেন না। সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্যক্তি সংযত ব্যক্তি সদৃশ নয়। এরূপ ব্যক্তির ইচ্ছা চরিত্রে উপস্থিত মহৎ গুণগুলি থেকে নিঃসৃত হওয়ায় তার ইচ্ছা কখনই ক্ষণস্থায়ী ইচ্ছা হবে

না। এই কারণে মহৎ গুণাবলিসম্পন্ন ব্যক্তিকে আমরা আদর্শ ব্যক্তি বলে অভিহিত করি। "...the one who does good out of habit and from the inner resources of good character... is the morally superior person."[৭]

এই আলোচনা থেকে বলা যায়, বুদ্ধিনিষ্ঠ নৈতিক মতবাদের বিপরীত চিন্তাধারা লক্ষ্য করা যায় সদ্‌গুণসংক্রান্ত নীতিদার্শনিকদের নৈতিক মতবাদে। আমি সদ্‌গুণসংক্রান্ত নীতিদার্শনিকগণের মতবাদ এই কারণে সমর্থন করছি যে নৈতিক আচরণের জন্য ব্যক্তির মনকে প্রস্তুত করার প্রয়োজন আছে। সুষ্ঠু সমাজ গঠনের জন্য কেবলমাত্র ন্যায্য কর্ম সম্পাদনই যথেষ্ট নয়। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সুন্দর সম্পর্ক স্থাপনও প্রয়োজন। সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব হয় বক্তির মনে, এবং অপর ব্যক্তির প্রতি যথাযথ আবেগ সৃষ্টির মাধ্যমে। ফলে ব্যক্তির চরিত্র গঠন অত্যন্ত জরুরী। চরিত্র ভালো হলে তার কৃতকর্মও ভালো বলে গণ্য হবে। সুতরাং ব্যক্তির মনে সঠিক আবেগ থাকা এবং সঠিক সময়ে সঠিক আবেগের ব্যবহার বাঞ্ছনীয়। ব্যক্তির উদ্দেশ্য, প্রেষণা, প্রবণতাগুলি যদি সৎ না হয় তাহলে ব্যক্তি কেবলমাত্র বুদ্ধিপ্রসূত নৈতিক নিয়মকে অনুসরণ করতে সক্ষম হয় না। ব্যক্তির সৎ মনোভাবই ব্যক্তিকে নৈতিক কর্ম সম্পাদনে সমর্থ করে। একে অপরের প্রতি ভালোবাসা, সহমর্মিতা, সহযোগিতার বোধে চালিত হলে তবেই উৎকৃষ্ট জীবনযাপনের দ্বারা ন্যায়সঙ্গত, ভালো সমাজ গঠন সম্ভব। এই সকল আবেগগুলি নৈতিক ক্ষেত্র থেকে বর্জন করার অর্থ ব্যক্তির আংশিক প্রকৃতিকে গুরুত্ব প্রদান করা। নৈতিক জীবনের উৎকর্ষের জন্য কতগুলি সংযত আবেগ বা সদ্‌গুণ অর্জন করা গুরুত্বপূর্ণ। যার দ্বারা ব্যক্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবে নৈতিক কর্ম পালন করবে, কোন দমন বা অনুশাসনের প্রয়োজন হবে না। ফলে নৈতিক কর্ম সম্পাদনের জন্য আবেগের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

তথ্যসূত্র

১. এনস্কোম্ব, জি. ই. এম, ১৯৫৮

২। স্টাটম্যান, ডানিয়েল, ১৯৯৭, পৃ ৮

৩। ঐ, পৃ ৮

৪। ফ্রাঙ্কেনা, উইলিয়ম. কে, ২০০৩, পৃ ১২৬

৫। শ্লিক, মরিৎ, ১৯৬২

৬। হার্মান, গিলবার্ট, ১৯৯৯

৭। পোজম্যান, লুইস, পি, ১৯৯০, পৃ ১১৯

সূত্রনির্দেশ

১। এনস্কাম্ব, জি. ই. এম (জানুয়ারী, ১৯৫৮), 'মডার্ন মরাল ফিলোজফি', ভলিউম-৩৩, নং-১২৪, পৃ. ১-১৯

২। পোজম্যান, লুইস. পি (১৯৯০), *এতিক্স, ডিসকভারিং রাইট এণ্ড রঙ*, ওয়াডসওয়ার্থ পাবলিশিং, বেলমেন্ট ক্যালিফোর্নিয়া

৩। ফ্রাঙ্কেনা, উইলিয়ম. কে (২০০৩), *এথিক্স*, প্রেন্টিক হল অফ ইন্ডিয়া, নিউ দিল্লী

৪। শ্লিক, মরিৎ (১৯৬২), *প্রবলেম অফ এথিক্স,* (ট্রান্স) রেনিন, ডিভিড, ডোভার পাবলিকেশন, আই, এন, সি, নিউ ইয়র্ক
৫। স্টাটম্যান, ডানিয়েল (১৯৯৭), *ভারচু এথিক্স,* এডিনবার্গ ইউনিভার্সিটি প্রেস, এডিনবার্গ
৬। হার্মান, গিলবার্ট (১৯৯৯), 'মরাল ফিলোজফি মিটস্ মরাল সাইকোলজিঃ ভারচু এথিক্স এণ্ড ফানডামেনটাল এ্যাট্রিবিউশান এরর' ভলিউম-XCIX, পার্টি-৩

'USE OF NATURAL COLOURS IN TRADITIONAL ART (PATACHITRA PAINTINGS) IN WEST BENGAL

Dr. Amrita Mondal, Asst. Professor,
Basanti Devi College, Kolkata- 700029, India
amrita.ju@gmail.com

Abstract

Patachitra, an ancient folk art of Bengal , is appreciated by art lovers all over the world for its effortless style of drawings, colours, lines and space usage. Patuas do not just paint, they also sing as they unfurl the painting scroll to show it to the audience. These songs are known as "Pater Gaan". The songs are of wide variety ranging from traditional mythological tales and tribal rituals to stories based on modern Indian history and contemporary issues like protecting forests and preventing spread of HIV/AIDS. Patuas generally use natural colours, which they procure from various trees, leaves, flowers and clays.

Traditionally, only five colours were used for patachitra i.e. white, black, blue, red, and yellow. Nowadays, many other colours like green, brown are also used. The colours used are all natural rather then synthetic colours. Like Red- (Segun/Teak), Red- (Jafran / Saffron), Blue- (Aparajita), White -(Kusum Mati), Red- (Pan/Betel leaf, Chun/Lime, Khayer/Catechu), Green -(Barbati/Runner beans), Green -(Seem/flat beans), Bheranda (Jatropa), Kesut (Bottle Green), Yellow -(Turmeric), Black (soot). To get a darker colour the pure juice is left more days in the sun, but if a bright colour is needed then the mixture has to be kept out of the sunlight. Before the painting a cup full of gum (made from Bel fruit/wood aple) is added to each crushed colour and mixed with the finger. The coconuts shells containing the colour are then left in the sunlight to deepen the colour, the amount of sun exposure equates to the darkness of colour. The final step is the painting of the scroll.

These colours which are called natural colours are eco-friendly and non-toxic. During this modern age when use of chemical is increasing in every field it is them who are still going with the nature making natural colours and saving our tradition. Hence it is the demand of time to save these art forms from threats of being lost and to use more of natural colours.

Key words: Patachitra paintings, Natural colours, Traditional art, eco-friendly, Bengal

Patachitra[1] is a special technique of painting which was developed and perfected in the cloth (Pata is a Sanskrit word meaning canvas, cloth or veil and chitra means picture.)Patachitra, an ancient folk art which spreads in some parts of Bengal and Orissa. It is appreciated by art lovers all over the world for its effortless style of drawings, colours, lines and space usage. Patuas do not just paint, they also sing as they unfurl the painting scroll to show it to the audience. These songs are known as "Pater Gaan". The songs are of wide variety ranging from traditional mythological tales and tribal rituals to stories based on modern Indian history and contemporary issues like

protecting forests and preventing spread of HIV/AIDS. Patuas generally use natural colours, which they procure from various trees, leaves, flowers and clays.

The colour used in Patachitra Paintings are all organic in nature. They all extracted from natural ingredients. The term eco friendly is used because all the materials are biodegradable and not harmful for the environment. Also no synthetic dyes or chemicals are used to prepare them. As a result the end product and the side products are both ecofriendly. Traditionally, only five colours were used in Bengal for patachitra i.e. white, black, blue, red, and yellow all from different types of flowers, leaves, bark, seeds etc. Nowadays, many other colours like green, brown are also used.

The final step is the painting of the scroll.

Fig 1: A Patachitra Painting

Origin of Patachitra Paintings of Bengal (West Mednipur)

Patachitra is well known for its dazzling play of colours is a traditional folk art form of rural Bengal[2] that has been an experience for centuries. There are various opinions about the history and origin of Patachitra, some claims date back to the Pre-Pala period from the days of Mohenjodaro whereas other historians are inclined to believe that it originated during the the 9th century A.D.. In Buddhist literature there is reference of pata in lst century A.D. in Haribansha in 2nd century, in Abhijnynasakuntalam and Malabikagnimitra in 4th century; in Kaya Khondasanjukta in 6th century, Harashacharit and Uttaramcharit 6th and 7th - 8 th centuries. These literatures speak about certain types of Pata which were exhibited to educate and to entertain the people.[2,3] The Patachitra industry comes under the wider definition of micro scale industry, the patachitra form of workly art is a stereotypical representation of such a folk and conventional medium of mass communications, especially from eastern India. This form of folk art is practiced in small villages of Midnapore, Bankura, Purulia, Howrah, Hooghly and 24 [1]Parganas

Through centuries- the patachitra has been a platform where assorted methods of communication have to coincide- including visual messages, oral traditions, and music- all of which helped to consolidate, involve and illustrate nature, society, and culture co-existing through a lucid conversation.

The patuas or the chitrakaars were primarily gallivant artists- who would travel from place to place with painted scrolls of different patachitra embossed in the design of various deities and other moral stories. Though their accurate date of origin as a profession is unknown, yet from different oral folklore and oral traditions- they can be roughly calculated to have begun as a profession from around 10th-11th century AD in Bengal. In India folkart is being generally formed by the illiterate or semi-illiterate people living in rural areas and semi-urban areas, their economic condition is very poor and do not have any modern technological concept of art.The process of painting Patachitra begins with the preparation of canvas (pata). Traditionally, cotton canvas was used; now, both cotton and silk canvas are used for paintings. They use old used sarees or cotton cloth for making canvas, as it is much softer and free from starch unlike the new cotton from the mill. Processing of cotton canvas is a tedious task which starts from dipping of cotton in a solution of crushed imli seeds and water for 4-5 days .The cloth is then taken out and sun dried. Thereafter kaitha (wood apple) gum is applied over the layer of cloth.

(a) (b) (c)

Fig 2a: Wood Apple Gum, 2b: Stone Rubbing over the cloth 2c: Chalk Powder

Another layer of processed cotton is placed over the previous layer and gum paste is applied on it, this is done to stick two layers. The layered cotton is then sun dried. After cotton is dry, a paste of chalk powder, imli and gum is applied on both side of the layered cloth and it is sun dried. Raw material used in Orissa Paintings: After drying, stone is rubbed on the cloth several times for smoothening the canvas. There are two types of stones which are used: Khadar stone is used for smoothening the canvas, which is whitish-pinkish in colour. Chikana stone is used for shining the canvas. This stone is yellow- brown in colour.The canvas is ready for painting and can be stored and cut into required sizes for painting.

Raw material used in Bengal Paintings: The following are the most important natural colours used by the patuas:

Red colour (Pan/Betel leaf, Chun/Lime, Khayer/Catechu)

These are mostly bought from the market to make a red colour. The ingredients are crushed

together and the colour extracted.The colour is collected in a coconut shell and left to dry in the sun. Natural gum is added thereafter.

Fig 3: (a) &(b) Catechu (c)Betel leaf

(a)

(b)

(c)

Green (Kundri)

The leaves of Kundri are used to make the green paint. The leaves are collected and crushed by a pestle. The colour is squeezed out and collected in a coconut shell. The colour is dried in the sun and then natural glue is added to it.

Green (Barbati/Runner beans)

Green (Seem/flat beans), Bheranda (Jatropa), Kesut (Bottle Green). Green is also extracted from the leaves of Seem (or flat beans), Bheranda and Kesut.

Fig: 4 (a) Green kundri (b) Runner beans

Brown (Teak/Segun)

The matured leaves of Segun are collected. The stalks are removed. The leaves are crushed using a pestle. The colour is extracted and collected is a coconut shell. It is dried in the sun before natural gum is added to it.

Black (soot)

Previously a source of black soot was from oil lamps, cooking fires, burnt rice grains or burning bamboo. Now a more modern method is from scraping the soot out of dirty lorry exhaust pipes with a stick.

The soot is collected in a plastic bag.

(a) (b) (c)

Fig: 5 (a) Black soot (b) Black colour (c) Stalks of Teak

Red (Saffron)

The seeds of saffron are used to extract colour. The seeds grow in spiky pods which grow in clusters at the top of the tree. The seeds are removed from the dried fruit pods. The seeds are rubbed by hand and the colour is collected in a dried coconut shell. The colour is dried in the sun and then natural glue is added to it.

Fig:6 Red (Jafran / Saffron)

Blue (Aparajita)

The blue flower whose name means 'Lady who cannot be defeated' grows prolifically as a creeper and the petals are plucked.

The flower is sometimes rubbed directly onto the paper to transfer the blue colour. Another method is petals are crushed in a coconut shell and then a cap full of gum is added to make a paste.

Purple is from black plum or blackberry

Fig 7. Aparajita Flower and colour

Yellow (Turmeric):

Turmeric is a plant in the ginger family. Its roots are the source of a bright yellow spice and dye. The Patuas use this plant to produce the yellow colour. In the next step the turmeric is crushed into small pieces using a pestle stone.

Then the small pieces are gathered and squeezed and the yellow juice is poured into a coconut shell. This liquid is left to dry for a few days and then the gum is added. Different shades of yellow can be obtained using direct sun light. To get a darker colour the pure juice is left more days in the sun, but if a bright colour is needed then the mixture has to be kept out of the sunlight.

Fig: 8 powered Turmeric

White (Kusum Mati)

Kusum Mati is a special type of clay and only the whiter stones are used in order to produce the white colour.

White stones are collected and then rubbed onto a plain surface forming a white paste. Then white paste is collected, kept in a pot and left to dry. A small amount of gum is added to the paste. This gum is added to the paste. This gum is used to ensure that the paint stays on the scrolls.

Fig:9 powdered kusum mati

Natural Gum

A cup full of gum (made from Bel fruit/wood apple)is added to each crushed colour and mixed with the finger. The coconuts containing the colour are then left in the sunlight to deepen the colour, the amount of sun exposure equates to the darkness of colour.

(a)

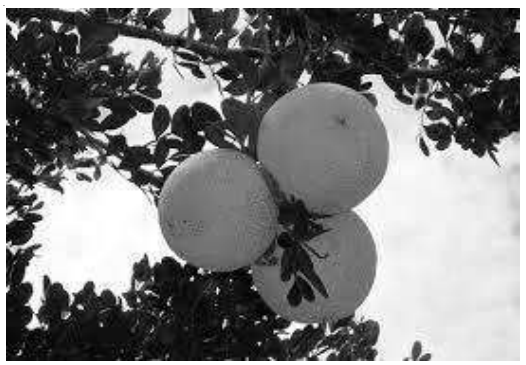

(b)

Fig 10: (a) & (b) Wood Apple

Fig: 11 Making of Colours

To get a darker colour the pure juice is left more days in the sun, but if a bright colour is needed

then the mixture has to be kept out of the sunlight. Before the painting a cup full of gum (made from Bel fruit/wood aple) is added to each crushed colour and mixed with the finger. The coconuts shells containing the colour are then left in the sunlight to deepen the colour, the amount of sun exposure equates to the darkness of colour. Over time, however, interest in this art form faded out. To ensure that their art form remained relevant in the contemporary world, the patuas adapted their skills and themes to changing times. As a part of this effort. a group of innovative patuas established a patachitra village at Naya. Slowly, their efforts to revive their artistic heritage started paying off.Today, after a period of decline, the patachitra art is flourishing again in the village, with village youngsters taking up the traditional art form as a passion and profession.

Chemical composition of few colours used:

Green Colour: Chlorophyll is the green pigment[4-5] found in plant leaves and we all know extracting the green pigment chlorophyll from plants and using is not harmful.

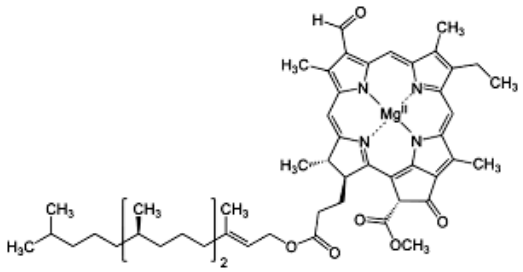

Fig 12. Structure of Chlorophyll resulting in green colour

Yellow colour: used is extracted from turmeric. **Turmeric's** main ingredient is '**curcumin**' which exhibit a wide range of medicinal activities. **Turmeric** is useful for **its colour**, flavor, cosmetic and medicinal properties. The **yellow colour**6 of **Turmeric** is due to **Curcumin** and related compounds, Curcuminoids present in rhizomes of **turmeric** in the range of 3 to 6%.

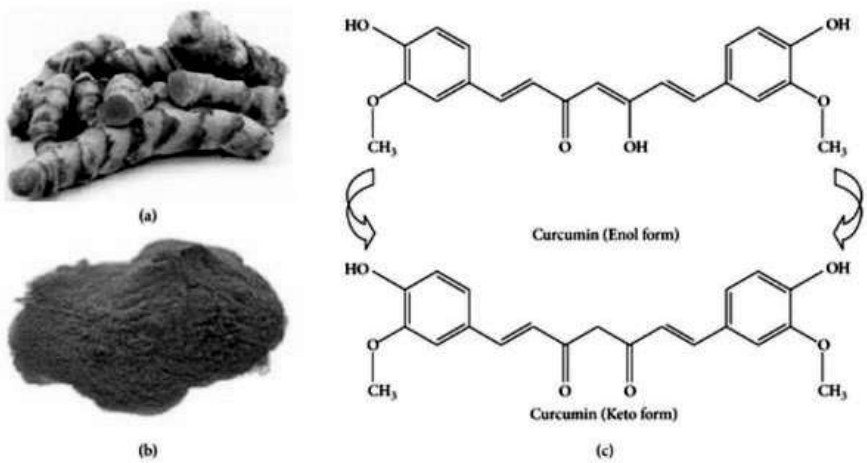

Fig13. Structure of Curcumin

Brown Colour: In Teakwood both the rootbark and the young leaves have Tannin[7] or dyestuff which produce a yellowish-brown or reddish dye, which is used for colouring paper and clothes.

Condensed tannins are probably the most ubiquitous of all plant phenolics, and presented exceptional concentrations in the barks and heartwoods of a variety of tree species. They are oligomers or polymers of flavonoid units (flavan-3-ol) linked by carbon-carbon bonds not susceptible to cleavage by hydrolysis[8].

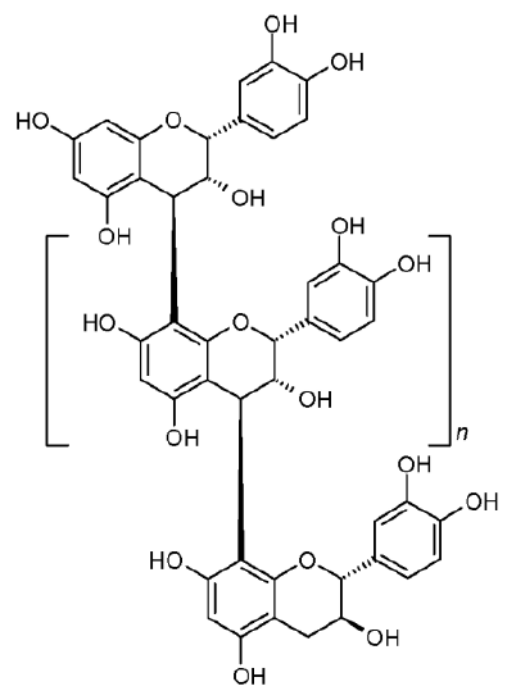

Fig14. Structure of condensed tannins

Blue colour: Flowers of butterfly pea (Clitoria ternatea Linn) contain anthocyanins. Flowers of butterfly pea contain anthocyanins. Anthocyanins are plant pigment, which are responsible for red violet-blue color in plant flowers[9,14].There are six major anthocyanins ternatins (A1, A2, B1, B2, D1 and D2)[10] which were characterized as malonylated delphinidin 3,3',5'-triglucosides having 3',5'-side chains with alternating D-glucose and p-coumaric acid[11]. The various shades of flower color are due to a very small number of different pigments. These pigments contain the same carbon skeleton, and different only in the nature of the substituent groups[12-13] The color of anthocyanins change according to the pH solution.

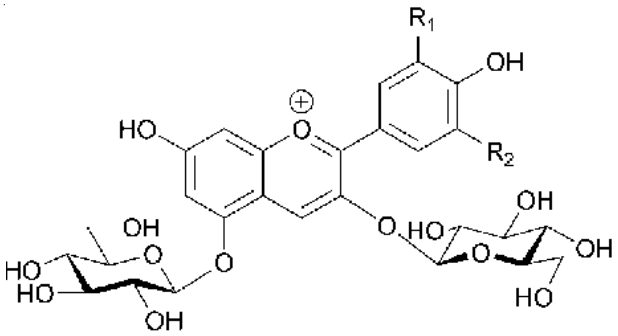

R_1	R_2	anthocyanin	aglycon
H	H	pelargonin	pelargonidin
OH	H	cyanin	cyanidin
OCH_3	H	peonin	peonidin
OH	OH	delphin	delphinidin
OCH_3	OH	petunin	petunidin
OCH_3	OCH_3	malvin	malvidin

Fig15. Structure of anthocyanin

Conclusion:[15, 16]

Today in this modern world all we see around are the material and things made by man but there are lot of things which nature has given us and we can use them. They might not be so gorgeous but they are colorful and beautiful. Patachitra Paintings prepared from natural colours are one of these art which uses the natural colours. These colours which are called natural colours are eco-friendly and non-toxic. During this modern age when use of chemical is increasing in every field it is them who are still eco friendly with the nature making natural colours and saving our tradition. Hence it is the demand of time to save these art forms from threats of being lost and to use more of natural colours.

References:

1. L.M. Bajpai,International Journal of History and Cultural Studies (IJHCS) Volume 1, Issue 1, PP 1-13, 2015
2. Subhamoy Banik "Patachitra-A Micro Scale Industry: Overview and Challenges" IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM) 20.2 (2018): 24-29.
3. a) Craft council of west Bengal (1985-86), The JaranaPatachitra of Bengal-Mahamaya, Page number 112.

b) Roy Niranjan (1973), The Patas and Patuas of Bengal. Indian Publications Calcutta, Page number 54-55

4. Willstater, Stoll. (1928) Investigations on Chlorophyll. Science Press.

5. Structure and Reactions of Chlorophyll. JAMES STEER [online]. [cit. 2013-04-17]. Available online: http://www.ch.ic.ac.uk/local/projects/steer/cloroads.gif.

6. P.Joshi, S.Jain, V.Sharma, International Journal of Food Science and Technology 2009, 44, 2402–2406

7. Agroforestry Database 4.0 (Orwa et al.2009)

8. SirmahP. K2009 Valorisation du "Prosopis juliflora" comme alternative à la diminution des ressources forestières au Kenya. Thesis-Université Henri Poincaré, Nancy I.

9. JB Harborne. Phytochemical Methods: A Guide to Modern Techniques of Plant Analysis. 3rd ed, Thompson Science, London, 1998.

10. N Terahara; N Saito;T Honda;K Toki;Y Osajima.Phytochemistry, 1990, 29, 949-953.

11. FJ Francis. Miscellaneous colorants, in Natural Food Colorants, GAF Hendry and JD Houghton, Editors. Blackie and Son Ltd., New York,1992, 242-247.

12. IL Finar. Organic Chemistry: Stereochemistry and the Chemistry and of Natural Products, Vol. 2, 5th ed., Longman, London, 1988.

13 Yoshida, Kumi et al. "Blue flower color development by anthocyanins: from chemical structure to cell physiology." *Natural product reports* 26 7 (2009): 884-915 .

14. Nyi Mekar Saptarini et al, J. Chem. Pharm. Res., 2015, 7(2):275-280.

15. Report on Patachitra of West Bengal, Statement of case

16. Bajpai.L.M. (2013), lntangible Heritage Transform alions- Patachitra of Bengal exploring Modem New Media, lnternational Joumal of History and cultural Studies (IJHCS) Volume I, lssue l, PP l-13

ILL EFFECTS OF INTERNET ON THE CHILD AND ROLE OF PARENTS TO ENSURE THEIR ONLINE PROTECTION:

Debopriya Mukherjee,
Student, Amity University, Kolkata
mukherjeedebopriya1997@gmail.com

Abstract

The parents of this generation are bringing up a new breed of kids. We can usually witness toddlers and teenagers using mobile phones or any device with internet access most of the times and even to communicate. It is the parent who is giving them the access and they are generally unaware of the ill-effects of it. Internet is both a boon and a bane and to many children growing up now getting access to it without proper precaution can turn it into a bane. The challenges that are faced today is that parents are unable to measure the pros and cons of providing their children digital freedom. They think that limiting children's access to the Internet could impact their ability to learn and develop and often forget that it could give them access to such information which they are not capable to handle or which misleads them and compels them to get into any such circumstances which are inherently dangerous in nature. Even though it is difficult, a constant vigilance at your child's online activity is required. So the question posed before all the parents now is how to teach the children to use the internet with utter safety. Educating yourself as a parent about the internet before providing your child the access to it is essential.The child is generally unaware of viruses, online privacy, phishing, social networking etiquette, and any other internet safety and/or security issue which a parent might think of only if a parent has adequate knowledge about internet. Identifying the signs before your child is actually in trouble and has gone very far and deep is also important. Recovering the child before it is too late is the responsibility of the parent. Educating children the way they should talk to strangers online rather than not to talk to them at all is probably a better approach. The paper deals with this modern issue of the internet and how a parent should deal with it to protect his or her child from the abuse of the internet.

Key Words: Child, Online Protection, Internet, Parenting, Education, Cyber Crime

1. Literature Review

The hike in Internet and social media usage constitutes a significant risk to the wellbeing of children. Even the most otherwise secure environment such as their own house is not anymore that safe due to easy and quick access of internet to the young ones which in some cases might be psychologically and emotionally harmful though might not *prima facie*[1] appear to be so. There are a number of dangers that are poised by social media on today's youth which generally was no of much concern

to the previous generations. Threats including cyber bullying, cyber predation and the posting of private information by children are some which tends to damage them both immediately and in the future. Teenagers and kids may also be vulnerable to '*phishing*' which are basically the spam fraudulent emails that try to trick people to click on malicious links or attachments. They often are the victims of fraud scams which in some instances turn out to be life threatening.

1.1. Statements of the Problem

The speed at which the Internet has evolved and, particularly, the use of social media platforms, by the young children and teens has seen huge leaps over the past decade or so. The proportion of time that children spend engaged daily in online activities has hiked tremendously in a decade or so. Researchers, educationalists, and policy makers often struggle to keep up with these developments, especially in regard to the effect that social media and exposure to imagery, which can be of an extremely violent or sexual nature, on young minds. Entirely new forms of risk have arisen for children, to avoid which the parents of the child plays a vital role.

1.2. Study Aim

This study aims to examine the academic literature that is published on the psychological and social risks to young people, up the age of about 18, of exposure to the Internet and social media. And the role of the parents in safeguarding the child at their homes to keep them away from falling prey for those threats. It will summarise the findings in terms of the risks in various categories and then discuss these findings.

1.3. Methodology

There are two main types of literature review, narrative and systematic. For this paper, the researcher has chosen to use a narrative review as these are generally more comprehensive than the systematic variety and cover a wide range of issues within a given topic. Summarising different primary studies, the narrative review enables conclusions to be drawn into a holistic interpretation. A narrative review can provide up-to-date knowledge about a specific topic or theme, although without a discussion of the methodological limitations of the primary studies.

There are, however, two notable weaknesses of this type of review. First, there is no rule on how to obtain primary data and how to integrate results: this is a subjective criterion of the reviewer. Second, the narrative reviewer does not synthesise quantitatively the data found in the different publications; therefore, these revisions are susceptible to inaccuracies and biases.

1.4. Sources

The following search engines will be used by the researcher for the purpose of this paper:

- Books
- PhD thesis and M.Phil dissertations
- Online Journals.
- International organisations study reports.

1.5. Inclusion and Exclusion Criteria

The method employed in this study is a narrative review. This began by determining the selection criteria for inclusion and exclusion based on the central aim of the research, i.e., to establish what is known about the nature and extent of the problem, and secondary aims, including to ascertain what official steps have been taken to address the issue.

1.6. Geographical/ Territorial coverage

The whole of the World is considered to be the geographical area of study for the purpose of this research.

1.7. Potential Risks to the children

In due course of this research many articles were found addressing the issue of ill effects of internet. However, those mainly kept its focal point on identifying generalized ill effects of the internet in different countries around the world. This research not only aims to identify the risk children are open to but also points out a parent's role in curbing the ill effects of the same. The researcher will discuss the latter issues from several angles.

2. Introduction

The definition of the word parent cannot be defined exhaustively under any law. Neither any scholar can probably put forward a concrete way to define what actually come inside the arena of this six letter word most important in a child's life. If we still try to understand the concept of a parent we can understand that a parent is an individual who has the custodial rights in regards to a child and also corollary obligations to financially support the child who he has the custody of. If we see the common law definition of a parent, a parent simply means the father or the mother of a child of only those children born within wedlock[2]. Nevertheless, the definition of the term "parent" has been amended substantially by variety of statutes only to widen the meaning and to include certain other persons other than biological father and mother. The term parent is ever evolving and cannot be exhaustive and has taken new forms only to include "individuals who cause a child to be born through a surrogate mother; those who adopt a child, those who have care or control of a child through a foster care arrangement; and those who, though being of a same-sex union, have the care or custody of a child, or some combination of the above."

With being a parent, comes immense responsibility to render towards the child and its upbringing. Most of the parents are always in a dilemma of choosing what is the best suitable for their child. Their mind is overpowered by thoughts of capacitating themselves to do justice to the role they are to play.And, in this ever advancing society other than facing social difficulties they also have to cope up with the technological advancement happening throughout. Drawing balances between all the tasks and putting the correct measurement of everything for the benefit of the child becomes a challenging task. Parents have traditionally warned their children of the physical dangers they face, be that pickpockets on the street or strangers in the park but now among all these one of the

most concerning issue for the parents is the World Wide Web.. And to come up with a solution to this they should be able to understand their role to measure the pros and cons of providing their children digital freedom. The need to create space to connect with the children regularly in relation to how life online is impacting them and making them feel is predominant.

3. Internet: More of a Bane than a Boon for the child.

Internet has always had a great influence in our lives. We are surrounded by mobile phones, computers and many other electronic devices all the time.Actually sometimes we might actually feel being a slave of these devices. These changes are both advantageous as well as not so much advantageous for us.Not a single child who has been introduced to technological gadgets is unaware of the usage of internet now a days. Rather the parents seem handicapped in matters of the usage of the web in front of their children. They can rather adopt the usage of the same on a much faster pace because their brain is at the developing stage. The parents are the one to introduce them to the internet and they tend to surpass the knowledge of the parents regarding it. That is where the real problem begins. As even they gain much knowledge about the internet they are unaware how to distinguish the fair and unfair usage of the same. Internet is like two sides of a coin. Where on the one hand it is all good on the other hand the picture is the worst. It is a pity that the children are mostly allured by the worst face of the internet as it is a human nature to find pleasure in doing something which they are prohibited to do. Internet even if it provides the children with a basket of knowledge, it is also a dumped bin of too much incorrect information. The internet reduces the thinking capacity of the child as the child knows all the information it wants is just two clicks away already lying there to be used. The overuse of internet by the children does not only have these problem but is also making the child a couch potato and is claiming the physical fitness of the child. The internet drug and the children are falling prey to it. They have lost the eagerness to go out and play and has much restricted themselves to their room to cross levels of the games caged in the square screen. Believe it or not, the children now days enjoys playing PES and FIFA on the internet rather than kicking the football with their legs to goal. This is also affecting their eyes high time. Almost every kid we notice around us takes external aid to even see their surroundings. The role of the parent to keep their children digitally safe arises here. While internet is both a boon and a bane it is on the parents to keep as much as surveillance on the kid so that they are not tangled too much in the World Wide Web. The parent should be equipped with adequate knowledge of the internet along with the risk can to the child both mentally and physically

4. Ill-effects of the internet on the child

The early 21st century have seen a blast in the Web use. The fame of this worldwide arrangement of interconnected system continues developing constant from the day it showed up in human life.[3] Clearly, with an inclusive access to data and an intuitive system to convey that Web offers, it is not difficult to comprehend why individuals all around the globe get dependent on it. Web based business, E-Business and E-Promoting are marvels that show up as the consequence of the Web attack. There is certainly no uncertainty about the advantages given by the utilization of Web in day by day

life. There is a rising concern about the development of this worldwide framework.[4] It is about the negative impacts of Web. The absence of authority over data sources, security spilling or web habit is referenced more much of the time than any other time in recent memory. Never in the past did the negative impacts of Web get as much as consideration in contrast with this century. In this way, what precisely are these issues and how would they influence our general public.is becoming very important[5]

The present well informed kids apparently have the world on the tip of their hands. With only one touch or one slide, youngsters approach data about anything ,anywhere anyplace.[6] From internet based life destinations, for example, Facebook and Instagram to others like YouTube, youngsters are presented to a heap of data. Also videogames that has them continually snared to the computer monitors even late during the evening.

Sexual grooming is a particularly malicious behaviour engaged in by some adults, which typically involves winning the confidence of a child through misrepresentation over a period of time, with the goal of arranging a secret meeting. The child may then fall victim to sexual abuse, physical violence, or participation in pornography. Another form of manipulation, which again involves a process of building trust through deception, has as its goal persuading the child to disclose information such as credit card or bank details of, for example, parents, either to steal from accounts or tempt the child into online gambling[7].

Child sex trafficking and commercial sexual exploitation of children, which are major public health problems throughout the world, increasingly involve the grooming and recruitment of adolescents via the Internet and social media. Children and adolescents may also be persuaded to reveal confidential information about themselves or others, including their parents, which may lead to them being the victims of various forms of cyber-crime, such as fraud and credit card scams.[8]

Internet addiction has been recognized as a disorder in many countries, and rehabilitation centers have been created to help people to get over it. The sad part of this whole phenomenon is that a large proportion of Internet addicts are youngsters, who are extremely vulnerable to its ill-effects.

4.1. Internet Addiction Disorder

Despite the fact that research on this issue are in fundamental stages, it has been set up that young ones who invest the greater part of their energy in the Internet, demonstrate a peculiar sort of conduct which is set apart by a desire to be on the Internet constantly, so much that the tyke may avoid all exercises and become submerged in the virtual world.[9] Studies led throughout the years have discovered that a great many people who experience the ill effects of Internet addiction issue is mostly the young kids and teens, who effectively fall into the draw of investigating everything that is accessible on the Internet.[10]

4.2. Reduced Physical Activity

There are a variety of games that are accessible on the Internet and this has made most kids to avoid all open air outdoor activities. Without physical movement, kids can undoubtedly fall prey to

a great deal of way of life related sicknesses, for example, obesity, aside from neglecting to create relational aptitudes. Aside from these variables, sitting persistently before a PC screen can genuinely harm our eyes, and put a strain on our neck and shoulders. Kids are in their creating years and these components can make deep rooted issues for them.[11]

4.3. Easy Access to Pornography

This is one of the worst dangers Internet postures to kids. Web has given a simple medium to kids to access sex entertainment and this can make them either become explicitly freak or explicitly addictive. This marvel has likewise caused another issue, and that is the expansion in pervasiveness of explicitly transmitted sicknesses (STD)[12] in kids. As indicated by reports, one out of each four young people gets tainted with a STD consistently. The grown-up substance that is available on the Internet advances untrustworthy sex and makes false thoughts in the psyches of understudies.

4.4. Cyber Bullying

Digital tormenting essentially means to harass the utility of the Internet. This detriment can be considered as one of the evilest negative impacts of Internet[13]. It is never simpler for haters to give monstrous words toward an individual. Famous people or a few sorts of individuals in ensured class are regularly the casualties of digital harassing.[14]This sort of badgering is more secure and simpler than physical tormenting on the grounds that there is not really any guideline or law to control the issues. Casualties of digital harassing may feel offended or humiliated on account of the fiendish remarks or suppositions.[15] The negative impacts will be more awful on youngsters, particularly on the individuals who are in pubescence with all the defencelessness and affectability. There is a positive relationship demonstrated between digital tormenting and self-destructive endeavours by exploited people. Understudies are viewed as most harassed on the Internet. A few analysis from educators or duping from gatherings of companions can make an understudy resort to suicide.[16]

4.5. Vulnerability to Cyber Crime

. Children have been tricked by paedophiles acting like great Samaritans and have been physically manhandled and attacked. Web has additionally made it simple for deceitful components to connect with youngsters and this has prompted an expansion in the instances of seizing and personality robberies. About 60% youthful adolescents in the United States have confessed to reacting to messages from outsiders. This sort of conduct is incredibly unsafe and has made youngsters amazingly defenseless against become casualties of digital wrongdoing.

4.6. Anxiety, misery and sorrow

Adolescents who invest the majority of their energy in the virtual world step by step move far from this present reality and begin living in a universe of imagination. After a specific period, they become subject to the Internet to feel playful. Furthermore, when they are unfit to get to the Internet, they begin encountering tension, trouble and sadness.

4.7. Unable to keep plans

Youngsters utilize the Internet to complete a great deal of things like searching for data, relating, paying bills, and doing budgetary exchanges. Be that as it may, on account of Internet addicts, they invest a large portion of their energy occupied with perusing, visiting or gaming, rather than doing what they are really expected to do. Likewise, they are unfit to monitor the time they spend in doing such exercises.[17] Therefore, they are not ready to stay aware of their calendars.

4.8. Sleep hardship

Most teenagers these days claim cell phones as well as tablets, which they convey with them any place they go, even to the bed. They likewise utilize these gadgets to snare on to the Internet before resting to get up to speed with what's going on around them. While ordinary youngsters may log off inevitably, those dependent on the Internet continue perusing for extended periods. Therefore, they endure rest related issues like late rest time, inadequate or anxious rest, and late waking time. This lack of sleep/unsettling influence can likewise compound or amplify side effects of uneasiness and discouragement.

4.9. Social detachment

The excessive using of anything always creates side effects. The Internet is not an exception. When students and teenagers use Internet too much, the abandonment of family will occur as one of the negative effects of Internet. The tragedy of a couple in Korea will be the most appropriate example for this effect because they were so busy with their virtual baby and forget about their real baby. Finally, this poor baby died of hunger and of the abandonment of his parents. When people spend most of their time on surfing the Internet, they become insensitive to the real life and people around them, including members of their own family. Obviously, the original purpose of parents when they equip their children with the Internet is to open a door to the new world, not to close themselves in a fiction planet without family. For many students, the Internet is the only friend they have. The time for family, for parents is replaced by hours of Internet browsing. They ignore the family and hesitate to talk or interact with other members.

4.10. Dishonesty and lying

Practically all Internet addicts comprehend that they have an issue. Be that as it may, when faced or addressed by relatives, companions or managers, they attempt to cover their propensity. They attempt to do this by either lying or being untrustworthy about the time they spend on the Internet.

4.11. Mood changes

Web addicts utilize the Internet to lessen their pressure and lift their mind-set. They feel cheerful or euphoric when they are associated with the Internet. Be that as it may, on the off chance that they need to quit utilizing the Internet or are unfit to get to it, they become bleak or aggravated and furious.

5. The Missing Link

Child welfare specialists have cautioned that kids are conceivably passing up imperative online counsel and backing at a vital time in their improvement, and have urged guardians to address the issue. In the NSPCC's report[18], of the 1,000 kids overviewed whose guardians had addressed them about online wellbeing, almost 66% (60 percent) said that they had changed their online conduct thus.[19]

"Without this kind of engagement from their parents, children may find themselves more at risk of online dangers – they simply do not have the skills or knowledge needed. Sadly we know that children up and down the country (UK) are struggling because of difficult experiences online," Peter Wanless, CEO of the charity, commented at the time.[20]

"Thousands of young people contact us about issues such as online grooming, cyberbullying and after viewing sites which encourage eating disorders, self-harm and suicide.We want to help parents recognize that for their children there is often no distinction between the online and offline world."[21]There is clearly a gap between parents and their children on handling the internet safely, as the ESET survey[22]has demonstrated.

ESET reported that while 88 percent of parents[23]were stressed over what their kids can get to on the web, just a couple had found a way to protect their child's online experience using security programming and parental controls on cell phones.The study[24], which was of 2,000 parents across the US and UK, found that 37 percent of children did not have security software on their mobile or tablet, with only 34 percent of parents having installed a parental control app.[25]When asked "What specifically concerns you when your child accesses the internet on a smartphone or tablet?" security concerns came out on top.[26]

81 percent cited their child visiting inappropriate web pages as being the most troubling; 71 percent said it was their children forwarding personal details to strangers; while 61 percent highlighted excessive amounts of times spent on devices as being alarming.[27]

6. Parent's role in Digital Safekeeping

As with the real world, the Internet has its seamy side and it's all too easy for kids to stray into it. Click-click and a Peter Cottontail fan's search for "bunnies" turns up raunchy pictures of women wearing fuzzy white ears and not much else.[28] Porn, questionable characters, hate groups, and misinformation flourish online so much that it has really put the questions in the minds of the parents about how safe their child is even sitting at home.

Raising children can suddenly make the world seem a frightening and dangerous place.[29]While you may have grown up meandering the lanes or visiting companions without telling your parents where you were going, giving your very own kids that sort of opportunity is unbelievable for some guardians today. In the period of cell phones, we're familiar with knowing where our children are consistently. Yet, while cell phones can help protect your kids by keeping them in consistent contact, that innovation can likewise place them in risk on the web.[30]

The bottom line or the key is the communication with the child. Discussions regarding the online activity and knowing the reason behind such activity of the child is an important step. Children mostly tend not to abide by strict rules imposed on them so before setting up rules for them and imposing it them all of a sudden it is necessary to communicate to them the necessity of such rules and also rewarding the child on adequate internet behaviour so that it will make them follow the rules without rebel.

Keeping a check on their online activity becomes much easier with talking about the same. If the child feels comfortable with these conversations, he or she will be more comfortable to open up to you to identify and let you know when he or she faces a problem or stumbles upon any inappropriate content.

While keeping kids safe, being a model for them with your own internet habit is also important, since the child is likely to emulate from the parent's behaviour.[31]

Children and teens today are more tech-savvy than ever as they are growing up with the technology which parents are only seeing to evolve. But even when your kids have as much technical know-how as adults, they don't yet have the experience and discernment necessary to keep them safe online.[32]

No parent can monitor their children round the clock, and it may be tempting to take the easy way out and block access entirely. But the internet is a valuable tool, more integral to our modern lives than ever, and necessary for children to learn to navigate safely.[33] If a child is surfing the web, the most powerful key available to keep their children safe is to observe. Even though as parents their knowledge of the web may be lesser than the children but their power to judge the contents of the screen is definitely much more than the child. While the internet offers goodies galore, it can also pose risks to your child's physical safety and emotional well-being.[34]

There are general guidelines following which claims your child's online safety but the reality is a bit different. The guidelines are basically common-sense and too general to provide for any fruitful results. And, some of them are out of touch with modern technology.

7. Steps to keep your children digitally safe

These are basic guidelines laid down in my opinion after going through a lot of research, if adopted by parents would help the kids become less vulnerable to the Web.

7.1. Discuss the dangers and risks

If the children are mature enough to utilize innovation and the Internet, they are mature enough for a discussion about the risks. You don't have to panic youngsters or be excessively express, yet they ought to comprehend the dangers of cybercrime and web based preparing. Imparting straightforwardly about the Internet implies all individuals from the family build up a sound mentality to its utilization.

7.2. Set limits

Setting a few standards about utilization of the Internet and technology has various advantages for children and families. At a young age, the limits could incorporate confinements on utilization of any online life and speaking with companions. As youngsters get more established they ought to be given more opportunity, however it's a smart thought to confine the measure of time they can spend on the web and the destinations they can get to. Age limitations on diversions ought to be forced. A prohibition on utilization of cell phones, tablets and other gadgets during eating times can empower family connection.

7.3. Install parental controls

The computerized age has extended the world for youngsters, yet there are a few things they ought not to be permitted to see. Parental controls can be determined to broadband and versatile systems, on individual gadgets or on web search tools. They can be utilized to avoid youngsters getting to age-unseemly substance, acquiring applications and changing passwords and security settings. Recent studies show that huge number of kids have seen online pornography and other grown-up substance by the age of twelve, and parental controls are a successful way out to avert this.

7.4. Explore the online world together.

The Internet is an awesome asset for instruction, and children ought to be urged to utilize it for research. Instructive recreations and applications can make learning fun. Investing energy in the Internet with your kids implies they can investigate its potential in a sheltered and controlled way. More youthful individuals from the family will create fundamental IT aptitudes in the event that they see how you use PCs and different gadgets to get to programs and email accounts.

7.5. Raise consciousness of cyber bullying.

Online networking and the Internet have changed the manner in which kids experience tormenting, however it can in any case be annihilating. Cyberbullying can happen by means of email, gaming stages, content and on informal organizations. It takes numerous structures, including provocation, dangers and terrorizing and openly posting individual data about someone else. Have open discussions with youngsters about cyberbullying, and urge them to converse with you in the event that they become an unfortunate casualty. Sharing an excess of individual data online can prompt individual assaults and control.

7.6. Highlight the dangers of making companions on the web.

In their blamelessness, kids assume that individuals they meet online are who they state they are. Gatherings and chat rooms can be hazardous places, and research demonstrates they are a chasing ground for paedophiles and those inclined to hurt youngsters. In extraordinary cases, kids can be prepped online by individuals who at that point mastermind to meet them covertly. It's fine for youths to speak with school companions over the Internet, yet caution them of the potential risks of

structure kinships with outsiders in the virtual world. Improvements in innovation imply that youngsters must become acclimated to living in an associated world. On the off chance that guardians show them how to utilize the Internet securely, there's no need deny access to it.[3535]

8 .Conclusion

Nowadays we witness toddlers and teenagers using mobile phones or any device with internet access most of the times and even to communicate. It is the parent who is giving them the access and they are generally unaware of the ill-effects of it. Internet is both a boon and a bane and to most growing up children getting the access without proper precaution can turn it into a bane. The challenges that are faced today is that parents are unable to measure the pros and cons of providing their children digital freedom. They think that limiting children's access to the Internet could impact their ability to learn and develop and often forget that it could give them access to such information which they are not capable to handle or which misleads them and compels them to get into any such circumstances which are inherently dangerous in nature. Even though it is difficult, a constant vigilance at your child's online activity is required. So the question posed before all the parents now is how to teach the children to use the internet with utter safety. The first and the foremost thing is that the child should never know more than the parent or the carer he is under control of. Educating yourself as a parent about the internet before providing your child the access to it is essential. The child is generally unaware of viruses, online privacy, phishing, social networking etiquette, and any other internet safety and/or security issue which a parent might think of only if a parent has adequate knowledge about internet. Identifying the signs before your child is actually in trouble and has gone very far and deep is also important. Recovering the child before it is too late is also the responsibility of the parent. On the Internet there is always a doubt regarding who is a friend and who is a stranger, due to the absence of visual interaction and mechanisms validating identity. Enforcing advice, such as telling children not to talk to strangers, is as difficult online as it is offline, as children often use the Internet alone in front of a screen, with a smartphone or game console, easily able to install software and click on link. Educating children the way they should talk to strangers online rather than not to talk to them at all is probably a better approach. Only some suggestive steps could be penned down to curb down this issue. The parents hold their child's online safety in their own hands and they are always going to do the best for them which would balance out between progress and the wreck caused by the Web.

References:

[1]based on the first impression; accepted as correct until proved otherwise available at : https://www.bing.com/search?q=prima+facie+meaning&form=EDGNTT& qs=AS&cvid=35d3989559cd45d48ad7863415b6261f&refig=e739f554bdff45e3ca5c68b9890c6474&cc=IN&setlang=en-US&elv=AY3%21uAY7tbNNZGZ2yiGNjfPelN4xeHE6*%215kkRoP7y3R2Je0MKbxhVCYsPPIMsIu6UV41aLJzkamfQxQcAsctMimsmbM3bgwMq3vCOdyw3f7&PC=ASTS(last visited on June 02, 2019)
[2]Duhaime's Law Dictionary available at : www.duhaime.org/LegalDictionary/P/Parent.aspx (last visited on June 02, 2019)

[3]Anonymous " Negative effects of the internet" available at : http://vkool.com/negative-effects-of-internet/(last visited onJune 02, 2019)

[4]ibid

[5] Anonymous " Negative effects of the internet" available at : http://vkool.com/negative-effects-of-internet/_(last visited onJune 04, 2019)

[6]AshwinDewan " Negative effects of internet use on Children" available at: https://www.parentcircle.com/article/negative-effects-of-internet-use-on-children/ (last visited onJune 18, 2019)

[7]reenbaum J, Crawford-Jakubiak JE (2015) Child sex trafficking and commercial sexual exploitation: health care needs of victims. Pediatrics 135: 566-574. (last visited on September 04, 2019)

[8]Gökçearslan Þ, Seferoðlu SS (2016) The use of the Internet among middle school students: Risky behaviors and opportunities. Kastamonu Education Journal 24: 383-404. (last visited onJune 04, 2019)

[10] Anonymous " Negative effects of the internet" available at : http://vkool.com/negative-effects-of-internet/(last visited onJune 04, 2019)

[11] ibid

[12]Sexually transmitted diseases (STDs), or sexually transmitted infections (STIs), are generally acquired by sexual contact. The organisms that cause sexually transmitted diseases may pass from person to person in blood, semen, or vaginal and other bodily fluids. Accessed on 02 September, 2019 Available at https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/sexually+transmitted+diseases

[13]Moessner, Chris. "Cyberbullying, Trends and Tudes." NCPC.org. Accessed 04 June, 2019, http://www.ncpc.org/resources/files/pdf/bullying/Cyberbullying%20Trends%20-%20Tudes.pdf

[14] Graham, PhD, Sandra. "Bullying: A Module for Teachers." Accessed February 10, 2014, http://www.apa.org. http://www.apa.org/education/k12/bullying.aspx#.

[15] "Teen Online & Wireless Safety Survey." Cox Communications. Accessed 04 June, 2019, http://www2.cox.com/wcm/en/aboutus/datasheet/takecharge/2009-teen-survey.pdf?campcode=takecharge-research-link_2009-teen-survey_0511.

[16] Reed, Ed.D, Cindy. "Understanding and Addressing Bullying in Schools and Communities." Auburn College of Education. Accessed 04 June, 2014, http://archives.huduser.org/oup/conferences/presentations/oupcombined/nola12/OUP12-Cindy%20Reed-042612.pdf

[17]Timothy T. Perry, Leslie Anne Perry, Karen Hosack Curlin, (1998) "Internet use by university students:an interdisciplinary study on three campuses", Internet Research, Vol. 8 Issue: 2, pp.136-141, https://doi.org/10.1108/10662249810211593

[18]The NSPCC study "Helping children to stay safe online" is available at https://www.nspcc.org.uk/preventing-abuse/keeping-children-safe/online-safety/ (last visited onJune 06, 2019)

[19]ibid

[20] WELIVESECYRITY by ESET "Why parents must teach their children about internet security" available at https://www.welivesecurity.com/2015/09/25/parents-must-teach-children-internet-security/(last visited on June 06, 2019)

[21] ibid

[22] ESET SURVEY, "disconnection between parent and children on internet safety" available at: https://www.eset.com/uk/ (last visited onJune 07, 2019)

[23] ibid

[24]ESET SURVEY, "disconnection between parent and children on internet safety" available at: https://www.eset.com/uk/(last visited onJune 07, 2019)

[25]WELIVESECYRITY by ESET "Why parents must teach their children about internet security" available at https://www.welivesecurity.com/2015/09/25/parents-must-teach-children-internet-security/(last visited on June 07, 2019)

[26]WELIVESECYRITY by ESET "Why parents must teach their children about internet security" available at https://www.welivesecurity.com/2015/09/25/parents-must-teach-children-internet-security/(last visited on June 07, 2019)

[27] ibid

[28]Anne Ricks " Keeping your child safe from internet"available at : https://www.parenting.com/article/keeping-your-child-safe-on-the-internet (last visited on June 09, 2019)

[29]WhoIsHostingThis Team, "eSafety: How to Keep Kids Safe Online" available at: https://www.whoishostingthis.com/resources/e-safety/ (last visited on June 09, 2019)

[30]WhoIsHostingThis Team, "eSafety: How to Keep Kids Safe Online" available at: https://www.whoishostingthis.com/resources/e-safety/ (last visited onJune 10, 2019)

[31] Anne Ricks " Keeping your child safe from internet"available at : https://www.parenting.com/article/keeping-your-child-safe-on-the-internet (last visited on June 10, 2019)

[32] ibid

[33] Scholastic Parents Staff " Keeping kids safe online " available at: https://www.scholastic.com/parents/family-life/social-emotional-learning/technology-and-kids/keeping-kids-safe-online.html (last visited on 18th June, 2019)

[34] Scholastic Parents Staff " Keeping kids safe online " available at: https://www.scholastic.com/parents/family-life/social-emotional-learning/technology-and-kids/keeping-kids-safe-online.html (last visited on 18th June, 2019)

[35] Parenting Today "How to keep children safe online" available at : https://childdevelopmentinfo.com/children-media-safety/how-to-keep-children-safe-online-in-six-steps/#.XQn0xfZuLIV (last visited on June 18, 2019)

Changing pattern of livelihood: evidences from the Indian Sundarbans and the district of Purulia, West Bengal

Dr. Indrila Guha[1], Principal, Basanti Devi College
and Dr. Atrayee Banerjee[2], Teaching Faculty ,
Departnent of Human Rights
Basanti Devi College
([2] corresponding author)

Abstract

The economy of a group or community is characterized by collection social, cultural, economical and institutional arrangements. In India, the Public Private Partnership started from the year 2006 and the government at present is making effort to modify the Public Private Partnership as a mode of infrastructure generation. The present paper tries to connect the different aspects of Public Private Partnership in the two areas of the Sundarbans and the district of Purulia in We st Bengal and propose it as an alternative towards solving the issues of livelihood challenges, lack of awareness about the basic rights and keeping the local communities at bay in decision making. The paper will take into consideration the man-nature interaction in two most backward areas of West Bengal, namely, the Sundarbans and the district of Purulia. As per the report of the Food and Agricultural Organization (FAO), both the regions depict high incidence of poverty, food shortage and livelihood insecurity giving rise to large scale livelihood shifting and migration. The areas of socio-demographic and economic attributes have been included in the study. Data have been collected using pre-tested schedules. In-depth interviews, case studies, focus group discussion (only in the Sundarbans) and observation were also taken into consideration. The secondary research primarily included the relevant works and scholarly articles. The paper will also make an effort to question whether India requires a migration policy vis-a-vis the concept of ecological refugees by understanding the situation in these two study areas.

Key words: man-nature interaction, ecological refugees, migration, food insecurity.

Introduction

The interdependence between human development and sustainable development lies in the fact that human development embanks upon a long sustaining and healthy life with proper access to education (needed for economic enhancement and financial stability) and the available goods and services. Sustainable development too, emphasizes on a development that will sustain the present without compromising the need of the future generation to access the resources for survival. India, a country of diversity in every possible way, ranks 130 out of 189 countries in the Human Development Index (HDI) enumerated by the United Nations Development Programme (2018). Back in 1972 in the Stockholm Conference, the then Indian Prime Minister, Smt. Indira Gandhi,

spoke at length and emphasized the need of poverty eradication to promote the development process. Now, it has become clear that a true development can be achieved through sustainability and thus the Sustainable Development Goals aim at the eradication of poverty along with other major goals such as gender equality, environment sustenance, etc.

"Focusing on human freedoms contrasts with the more limited visions of development, such as identifying development with the growth of the gross national product, with the increase in the personal income or with social modernization. The GDP growth or that of individual incomes can, of course, be important as a means of expanding human freedoms, just like industrialization, technological or social modernization. But freedoms also depend on other factors such as social and economic arrangements (for example, access to education, health care and social assistance, access to the labor market) as well as civil and political rights (e.g., the freedom to participate discussions and debates)"(Sen, 2004).

Literature review

The Public Private Partnership or PPP or 3P has been defined and described in an interesting way by the Government of India as "a*n arrangement between a government / statutory entity / government owned entity on one side and a private sector entity on the other, for the provision of public assets and/or public services, through investments being made and/or management being undertaken by the private sector entity, for a specified period of time, where there is well defined allocation of risk between the private sector and the public entity and the private entity receives performance linked payments that conform (or are benchmarked) to specified and pre-determined performance standards, measurable by the public entity or its representative*" (www.pppindia.com). The Government has always looked it as a legal relationship between a private entity and the corresponding governmental body. The effect of globalisation was immense upon the Indian Economy when the country jumped into the wave of liberalisation and opened its market to the world. Infrastructure in India is poor when compared to similarly developed nations (Raju, 2011) and thus in August 2012, the Prime Minister of India, Dr. Manmohan Singh, lifted the ban on the transfer of government-owned land, relaxed land transfer policy and did away with the need for Cabinet approval for 3P projects in order to accelerate the building of infrastructure (The Hindu, 2012). In order to develop the infrastructure in India, the Government identified the Public Private Partnership as the best possible way to develop country's infrastructure. The history of PPP dates back to the days of 1980s when countries like UK and Chile gained success through Public Private Partnership in the sectors of transport, communication, schools, and hospitals (NITI Aayog, Govt. of India). During the period of 2004-2012, the Government gave emphasis on laying the foundation for granting major PPP projects in the sectors of transport, energy and so on. As per the latest available data from Ministry of Finance, 1,539 PPP projects have been awarded so far in India. Out of these, about 50 per cent are currently in operational stage, while others are either scrapped or are under different stages of implementation. Sector-wise break-up shows that transport sector accounts for 58 per cent of these projects, followed by energy sector with 24%, while social and commercial infrastructure sector accounts for 9 per cent

and water & sanitation for the balance 8 per cent. However with the absence of a robust PPP enabling ecosystem, i.e., twin balance sheet problem, paucity of credit from alternative sources, lack of a suitable framework for dispute resolution, and with the dearth of bankable PPP projects, a significant number the projects awarded during 2004-12 period failed to take off and the private sector investments witnessed considerable decline thereon, thereby further miring India's PPP ambitions (NITI Aayog, Govt. of India).

Understanding sustainability through the lens of Public Private Partnership

A consistent need to incorporate sustainability in the considerations of developing infrastructure through Public Private Partnership is the new idea around the corner. The Sustainable Development Goals need countries to take a pledge on maintaining a balance between their economic, social, and cultural needs. Incorporating the features of sustainability into the PPP projects require a shift in the working procedures. A good example of a cross-cutting goal is SDG 9: "Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation." It is both an explicit and implicit component of the SDGs. Progress on Target 9.1 ("Develop quality, reliable, sustainable and resilient infrastructure…to support economic development and human well-being, with a focus on affordable and equitable access for all") would enable progress in access to quality education, healthcare, water, and sanitation, among other targets and indicators. It would also focus on those hardest to reach (The World Bank, 2018). The United Nations in general and The World Bank in specific both emphasised the need of PPPs to be tailored according to the need of the local communities. The concept of sustainable environment is to understand the nature and use of the natural resources in a way not to exhaust it. In India the Public Private Partnership programmes have contributed significantly towards stabilising the infrastructure projects. There are scholars who have criticised the different partnership projects with the sole issue that the PPP programmes often fail to address the sustainability goals as ascertained by the SDGs. The features of PPP include stakeholder's participation, environment friendly approach and development through sustainable way. It has often been understood that integrating sustainable development approaches into the PPP procurement process can act as a solution towards a sustaining ecosystem (Patil, 2016).

Objective

The present paper looks into the socio-economic aspects of the two study areas- the Sundarbans and the district of Purulia and would like to propose PPP as one of the ways to solve the ever increasing feature of migration of the local communities and thus stabilizing their livelihood insecurity. The paper will look into the economic and socio-cultural vulnerability of the local communities by taking examples from two regions of West Bengal- the Sundarbans and the district of Purulia. Both the regions being backward and vulnerable in terms of the ecology and livelihood practices of the communities, gave the impetus to choose them as the area of consideration. The decline in purchasing power coupled with lack of food security and the consequent developmental choices in the face of climate vulnerability have posed a serious threat to the economic variability in the Sundarbans. On the other hand, the Santals of Purulia who depended on the forest resources for

both household and commercial basis have been suffering from right deprivation in terms of access, control and use rights of forest resources, thus resulting in severe livelihood challenges. The paper will constantly try to link these areas with the PPP features to understand the alternative situation.

Materials and methods

The present paper focuses on the two study areas- the Indian Sundarbans and the district of Purulia. Sundarbans is considered as the largest mangrove ecosystem of the world, expanding in both the countries of India and Bangladesh. UNESCO has declared it as a World Heritage Site and the inhabitants of this place exhibits low socio-economic status, mainly due to the vulnerable environmental conditions. Climatic conditions coupled with the ecosystem have played a major role in the dynamics of migration, food insecurity and poor development (Roy and Guha, 2017). On the other hand, economically Purulia is one of the poorest districts of West Bengal (State Forest Report, West Bengal 2006-2007) with a high tribal population of 540,652 (18.45 per cent) within the State (Office of the Registrar General and Census Commissioner, India, 2011). The study included the areas of socio-demographic and economic attributes. Data have been collected using pre-tested schedules from both the sexes, with prior consent. In-depth interviews, case studies, focus group discussion (only in the field work in the Sundarbans) and observation were also taken into consideration. In case of land size and distribution, the local unit used has been converted into Bigha as and when needed. The secondary research was carried out by studying the relevant works and scholarly articles along with thorough library work. There will always be an endeavour to understand and link the areas of concern with the dynamics of PPP.

- ***Study area and population***

The Indian Sundarbans is spread across the districts of North and South 24 Parganas in the state of West Bengal with 19 administrative blocks (See figure.1). The study area includes the Sagar block in South 24 Pargana district. Sagar is the largest block in the Sundarbans with initially three inhabited islands- Sagar, Lohachara and Ghoramara. Lohachara got submerged after the Cyclone Aila and two-third part of the Ghoramara Island has been inundated. Inundation is a regular phenomenon around this area. Sagar block has an area of 360 sq km (Sagar Pancyhayat Samiti, 2012). Purulia has a total area of 6559 sq km with a population of 29, 27,965 with a ratio of 912. The tribal population constitutes 18.27% of the total population, ranking second to Jalpaigury (Office of the Registrar General and Census Commissioner, India, 2011). The villages inhabited by the Santal community under the Keshargarh Gram Panchayat of Hura block have been selected for the proposed study (See figure.1). From the villages of the Keshargarh Gram Panchayat (Hura Block) the villages namely, Kaitardih, Dhadkitanr, Dudhpania, Kultanr , Karudoba(south) Karudoba(north),Chargoli,Bandartonga,Rahanda and Karkota under the Keshargarh Gram Panchayat have been selected and surveyed.

Figure.1: Map of the study areas

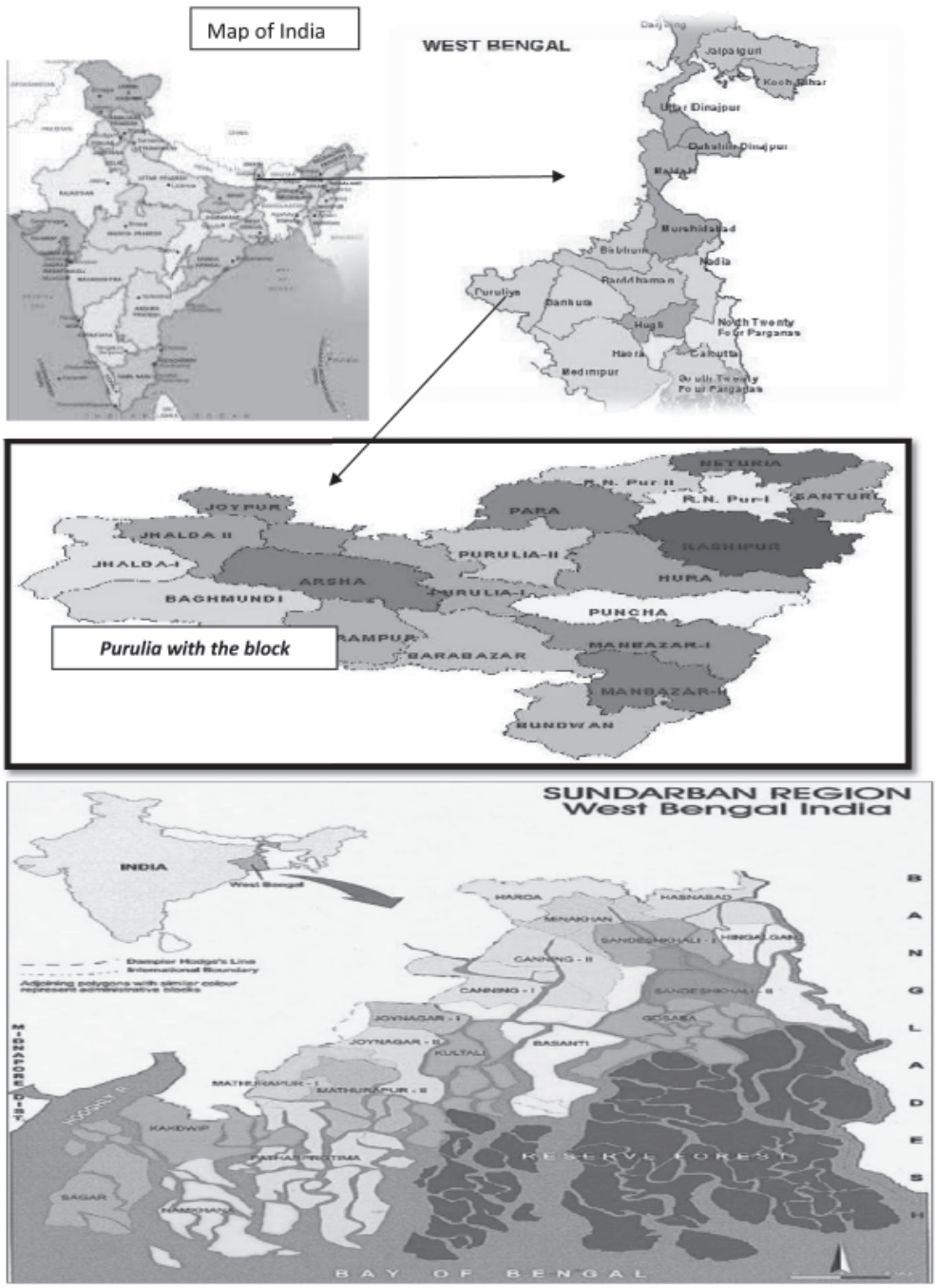

Source: www.mapsofindia.com/maps/westbengal; Indian Journal of Psychiatry.

Relating PPP with the livelihood challenges in the Sundarbans and the district of Purulia

The different aspects of climate change have played havoc on the ecosystem of the Sundarbans and thus moulded the life and lifestyle of the people along with it. There are many scholars like Hazra *et al.* (2010) and, Roy and Guha (2017) who at length discussed the changing ecology and its effect on the livelihood pattern of the local community in the Sundarbans. After *Aila* (cyclone) struck this region the land use pattern has changed completely and since then the loss of agricultural land, either due to high salinity or inundation is on the rise. The obvious result of this consistent loss of agricultural land is migration (See table.1). Climate change with its other adversities affected both the quality and quantity of land and thus resulted in a shift in the livelihood pattern. There are instances in the area where people have shifted from agriculture and fishing to other occupations, like, wage labourer or other opportunistic occupations (See table. 2). People were also engaged in the MGNREGA Scheme or the '100 days work' to earn a livelihood mainly in the lean months. Migration and migratory work only surfaced as an alternative after the cyclone *Aila* hit the shores of Sundarbans. The labour sector, mainly agricultural labour, witnessed a low, post *Aila* which again added impetus to migrate in search of financial stability. The Sundarbans fall in the low economic productivity zone and thus accounts for a high level of malnourished population. Fertility loss due to soil erosion and inundation has led to immense pressure on the small left over resource base and thus the consequent malnourishment and food insecurity. The Planning Commission of India (2013) had given some figures which highlighted the picture of poverty in India.

- 216.5 million of 269.3 million poor live in rural area.
- Approximately, 22.52 per cent (rural) and 14.66 (urban) lives in poverty in West Bengal

Table.1: Land distribution (1Bigha=0.134 hectare) [the Indian Sundarbans]

In Bigha	2009(in per cent)	2013(in per cent)
No land	38.38	60.61
0.10- 3.0	24.75	33.84
3.1-5.0	08.08	03.03
5.1-10.0	18.18	01.52
Above 10	10.61	01.01

Source: Author's calculations

Table.2: Change in livelihood (the Indian Sundarbans)

Sl.No.	Change in livelihood	Percentage in total
1	Agriculture to opportunistic livelihood	22.33
2	Agriculture to fishing	13.67
3	Business, labour, tailor,etc to opportunistic livelihood	11.33
4	Housewife to daily wage labour	09.67
5	Fishing to opportunistic livelihood	05.33

Source: Author's calculation

The tribal economy of the studied Santal villages of Purulia is characterised by unique socio-economic and cultural institutions. The community seeks to attain their social and economic well being through the traditional system of sustaining life. There is always an interaction between the environment in which the community lives and their customary practices that sustain their livelihood. The studied villages too are of no exception. Forest plays a comprehensive role in enhancing livelihood requirements and fulfilling the daily requirements of the studied population (Santals). Their livelihood highly depends on utilising the Non Timber Forest Products for various purposes. The Santals inhabiting these villages are dependent on the nearby Rakhab forest for their existence. Apart from being dependent upon rain-fed agriculture, the economy of the Santal population of the studied area largely depends on the forest resources. The collection of forest products is both exploited on a household and commercial basis. The villages have red soil which in itself is infertile and barely supports single cropping pattern. Almost every Santal household practices agriculture in their small possession of land holdings on a subsistence basis (See table.3). The small agricultural holdings coupled with infertile soil and the absence of irrigation water poses serious problems for the Santals to carry out their subsistence. The number of families with nil or very low land holding faces the worst situation ever. Neither they have the required land to practice agriculture on subsistence basis nor do they get much share while working as sharecroppers. This forces them to migrate to other districts of West Bengal, mainly Bardhaman to work as agricultural labourers. The occupational pattern of the Santals of the studied villages varies right from collection of Non Timber Forest Products to Lac and Tassar cultivation. Tassar cultivation is mainly practiced in the villages of Kaitardih, Karudoba(south) and Rahamda, while Lac farming in only carried out in Kultanr (See table.5). Forest based livelihoods like selling of sal leaves, sal leaf plates, brooms made of grass, fishing nets and selling of kendu leaves have become difficult now-a-days. The Santals are finding it difficult to collect the Non-Timber Forest Products (NTFP) from the Rakhab forest due to the interference of the lower level forest officials and even sometimes from ordinary non-Santal villagers who pose themselves as forest officials. Moreover, the male population who

migrates out of West Bengal finds it difficult to mingle with the outside world and when they starts to adjust themselves their own culture and tradition gets lost. Lack of access and low rate of exploitation of the forest resources have led to this problem of migration (See table.4). The practice of *Tassar* (silk) and *lac cultivation* (resin) are practiced in a few villages (See table.4) but the practice is on a low due to the ever increasing price of the larvae and lack of access to the forest and the consequent absence of use rights of the forest resources.

Table.3: Agricultural Holding (in Bigha) [Purulia district]

Villages	Agricultural holding(in Bigha)						
	nil	1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	Total
A	21	129	74	18	8	8	258
B	4	40	7	1	2	0	54
Total	25	169	81	19	10	8	312

A= villages with only Santals; B= multiethnic village (Rahamda)

Table.4: Occupational pattern with special emphasis on the migratory trends as seen in the villages (Purulia district)

Name of the village	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Kaitardih	33	29	1	5	36	1	10	1	1	1	0
Kultanr	31	25	1	2	21	2	9	3	0	0	1
Dudhpania	23	19	2	1	15	0	3	0	0	1	0
Karkota	27	32	0	0	22	0	21	0	0	0	0
Dhadkitanr	39	28	1	0	24	0	12	1	0	1	0
Chargoli	25	29	3	7	48	4	17	9	0	2	0
Karudoba (south)	17	15	1	1	13	0	5	0	3	2	0
Karudoba(north)	26	22	3	2	23	0	6	0	0	4	0
Bandortonga	49	45	1	7	53	0	21	0	0	7	0
Rahamda	50	52	1	7	47	0	19	2	4	1	0

NTFP- Non Timber Forest Products; Code ***A- cultivation, B-local labour,C-service,D-share croppers, E-selling of NFTP,F-coalmine workers,G-migratory workers,H- brick industry,I-tassar cultivation,J-livestock rearing and K-lac farming***

The study has revealed that, though the two study areas are different in terms of their geographical location and the population structure along with the levels of sustainability, there are basic similarities when it comes to the effects of livelihood challenges and the alternatives chosen by the inhabitants. The researchers have tried to compare the variables and the common results in the following table (table.5)

Table.5: Results at a glance

The Sundarbans	Purulia
Change in livelihood pattern owing to climate change and lack of alternative stable policies	Change in livelihood pattern owing to lack of access right to forest resources
Migration and related work	Migratory work as a way of survival
Women working as labourers	Women as wage labourers (mainly in brick industry)
Lack of awareness and skill development. Denial of right to participate in decision making	Lack of awareness and no or very low participation in decision making

The study areas showed an urgent need of taking into consideration the problems faced by the local communities while addressing the policies-both enactment and implementation. It has often been seen that the Government bodies and the corporate houses fail to take into account the necessities of the local communities while making developmental plans. Here comes the idea of Public Private Partnership (PPP). The present paper aims to propose and put forward PPP as a recommendation tool to address the inequalities and rights deprivation of the inhabitants of the two study areas. Incorporating the critical features of the PPP can come handy in meeting the twin goals of people's participation and nurturing the ecology in a sustainable way. The most important feature of PPP is meeting the challenge of sustainable development through partnership works. The Indian Sundarbans and the Santal villages of Purulia, both exhibits lack of access to the available resource base, low rate of awareness build-up, declining policy infrastructure to meet the climate challenges and absence of local community's participation in the development processes. The United Nations has always emphasised the need of PPP as it takes into its ambit access to capital, transfer of risk and encouraging innovation techniques. The Sundarbans, being a vulnerable ecosystem, poses serious threat to the climate watchdogs to promote and formulate immediate measures to arrest the steady loss of land and embankment failures. The gradual decline in agricultural land forces the people to migrate in search of a stable livelihood. The same situation is with the Santals of Purulia, who are facing the problem of access, use and customary rights of the forest resources, since the Forest officials fail to implement the policies at hand. The obvious result is migration- permanent or seasonal. The PPP can exhibit a coherent policy with strong enabling institutions to look into the matters of rights deprivation and policy implementation. It is imperative to mention that lack of financial stability in the original area of inhabitation gives way to immense

pressure on the existing dwindling resource base and food insecurity. This is evident in the study areas where the loss of productive land and increasing infertility threw the population into utter poverty and malnourishment. The PPP can bring forward a legal framework that is simpler and better with mutual risk sharing and support. Moreover, transparency in the partner section and putting people first can eventually achieve sustainable development. PPP also takes into account the accessibility of the disadvantaged section with the core values and principles directed towards fairness and improved infrastructure. It always stays in contact with the Government body and identifies the correct projects to get started. Another most important aspect is the skill development and training programmes. It has often been seen that in fear of stringent and complicated paper work the backward communities think hard before availing any Government policy. But the PPP has the option of putting up units to make the laws knowable and secure along with helping the local people understand the paper work through simple modes. An example may be cited here that almost nil population in the studied villages of Purulia knows about the Forest Rights Act, 2006, put apart the complications in filling up the application forms. To conclude it can be said that PPP is an acceptable method in the two areas under consideration since it defines the public interest in consultation with the public.

Does India need a migration policy?

The paper analyzed the socio-economic impact of climate change and the consequent implications on ecosystem services in the Indian Sundarbans. Lack of generation of human capital, unavailability of industrial land, improper distribution of food and wealth and regressive occupational choices pose a serious threat to the socio-economic fabric of the population of the Sundarbans. Large investors are not getting the impetus to invest in new ventures due to the instability in terms of economy in this area. The region has flourished as a tourism and eco-tourism hub but with the dwindling ecosystem this is getting even worse. Leaders of this country are thinking about Public-Private Partnership (PPP) but the way to travel is still long. In Purulia, the study also covered the different aspects of the dependence of the indigenous community on the forest and the various practices which directly helps in bio-diversity conservation. It has been an area of concern for many to study and explore the forest rights of the indigenous community but in most of the cases the work centres on computing the Non-Timber Forest Products or understanding the symbiotic nature of the community with the forest; the work being mainly carried out in areas of noted importance. To the best of the researcher's knowledge no such work that deals with the forest rights of the studied villages of Purulia has been carried out earlier. This makes the work a little more sensitive and understanding the situation from a scratch needs extra care. India has neither signed the Refugee Convention. 1951 nor the Optional Protocol, 1967 but that does not relieve India from its international commitments in dealing with the huge influx of migrants crossing the border and settling as refugees on this land. While the Government is much more active on the debate and challenges of the international migrants, it has often failed to realise that the policy guideline to assess and monitor the situation of internal migration within the country is almost nil. Migration is the third aspect in the dynamics of population, the other two being birth and mortality. A usual conceptual analysis of migration terms it as a tool which helps to minimise regional, socio-

economic and cultural disparities but what it fails to take into account is the sudden shock that a community faces during and after migration. The same thing is witnessed among most of the internal migrants of India where the issue of identity crisis rises high in case of marginalised and indigenous communities. Little attention is however, being paid to migration policy in India. The cases that have been discussed in the previous sections pose some basic questions- whether India has a migration policy and whether India needs a migration policy?

Conclusion

The study areas showed an urgent need of taking into consideration the problems faced by the local communities while addressing the policies-both enactment and implementation. It has often been seen that the Government bodies and the corporate houses fail to take into account the necessities of the local communities while making developmental plans. Here comes the idea of Public Private Partnership (PPP). The present paper aims to propose and put forward PPP as a recommendation tool to address the inequalities and rights deprivation of the inhabitants of the two study areas. Incorporating the critical features of the PPP can come handy in meeting the twin goals of people's participation and nurturing the ecology in a sustainable way. The most important feature of PPP is meeting the challenge of sustainable development through partnership works. The Indian Sundarbans and the Santal villages of Purulia, both exhibits lack of access to the available resource base, low rate of awareness build-up, declining policy infrastructure to meet the climate challenges and absence of local community's participation in the development processes. The United Nations has always emphasised the need of PPP as it takes into its ambit access to capital, transfer of risk and encouraging innovation techniques. The Sundarbans, being a vulnerable ecosystem, poses serious threat to the climate watchdogs to promote and formulate immediate measures to arrest the steady loss of land and embankment failures. The gradual decline in agricultural land forces the people to migrate in search of a stable livelihood. The same situation is with the Santals of Purulia, who are facing the problem of access, use and customary rights of the forest resources, since the Forest officials fail to implement the policies at hand. The obvious result is migration- permanent or seasonal. The PPP can exhibit a coherent policy with strong enabling institutions to look into the matters of rights deprivation and policy implementation. It is imperative to mention that lack of financial stability in the original area of inhabitation gives way to immense pressure on the existing dwindling resource base and food insecurity. This is evident in the study areas where the loss of productive land and increasing infertility threw the population into utter poverty and malnourishment. The PPP can bring forward a legal framework that is simpler and better with mutual risk sharing and support. Moreover, transparency in the partner section and putting people first can eventually achieve sustainable development. PPP also takes into account the accessibility of the disadvantaged section with the core values and principles directed towards fairness and improved infrastructure. It always stays in contact with the Government body and identifies the correct projects to get started. Another most important aspect is the skill development and training programme. It has often been seen that in fear of stringent and complicated paper work the backward communities think hard before availing any Government policy. But the PPP has the option of putting up units to make the laws knowable and secure along with helping the

local people understand the paper work through simple modes. An example may be cited here that almost nil population in the studied villages of Purulia knows about the Forest Rights Act, 2006, put apart the complications in filling up the application forms. To conclude it can be said that PPP is an acceptable method in the two areas under consideration since it defines the public interest in consultation with the public.

Acknowledgements

The field study on Sundarbans was carried out by the financial support provided by the UGC. The research work on the Santals of Purulia was a doctoral work done by the financial support of UGC. Moreover, sincere thanks to the local communities to participate in the research process voluntarily by providing the necessary information.

Notes

1. The field study on Sundarbans was carried out by the financial support provided by the UGC-MRP (F.No. 5- 414/2012-HRP).

2. The research work on the Santals of Purulia was a doctoral work done by the financial support of UGC.

References

Hazra, S., Samant, K., Mukhopadhyay, A., & Akhand, A. (2010). Temporal change detection (2001–2008) study of Sundarban (Report). School of Oceanographic Studies, Jadavpur University, Kolkata, India.

Office of the Registrar General and Censor Commissioner. (2001). India.

Patil, N.A. (2016). Sustainability of Indian PPP procurement process: Development of strategies for enhancement. Emerald insight publishing House. India.

"PM eases land transfer to speed up PPP projects". (2012). The Hindu, National news articles, August 3.

Raju, S. (2011). A successful Indian model. Survey of Indian Industry. The Hindu. Planning Commission of India. (2013). India.

Roy, C., & Guha, I. (2017). Economics of climate change in the Sundarbanas. Global Business Review, 18(2), 494–509.

Sagar Panchayat Samiti. (2012). Sundarbans. India.

Sen, A. (2004). *Dezvoltarea ca libertate*, (Bucharest: Economicã, 2004), 18.

United Nations Development Programme. (2018), Undp.org.

Weblinks

Indian Journal of Psychiatry. https://www.google.com/search?q=map+of+indian+sundarbans&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwih5evKpZ7cAhUI3o8KHWXJDqQQ_AUICygC&biw=1366&bih=654#imgrc=_.

State Forest Report West Bengal 2006-2007.(2007). Forest Survey of India (Ministry of Environment and Forest).Government of India. www.westbengalforest.gov.in/...pdf/state_forest_report_06_07.pdf. Retrieved on 20/05/2012.

The World Bank. SDGs and PPPs: What's the connection? http://blogs.worldbank.org/ppps/sdgs-and-ppps-whats-connection. Retrieved on 14-09-2018.

The quint. (2005). Rising sea levels cause migration in Sunderbans. Retrieved from https://www.thequint.com/news/india/rising-sea-levels-cause-migration-in-sunderbans. Retrieved on 03/07/2018.

West Bengal Maps. Maps of India. www.mapsofindia.com/maps/westbengal/. Retrieved on 01/05/2012.

Role of Empathy in preventing suicidal tendency among youth

Mousumi Roy
Student, Department of Philosophy, University of Calcutta
mousumi.roy107@gmail.com

Abstract

Apparently speaking to end one's life voluntarily is termed as suicide. It is both a public and mental health problem and is a leading cause of death, especially among youth. In India the number of suicide cases recorded per year is increasing at an alarming rate. Two factors that contribute to the decision of youth to commit suicide are having a primary mood disorder and substance abuse. In the Indian culture, the family unit has both positive and negative impact on suicide. The family serves as a protective factor that provides a strong support for the individual, but alternately creates an inseparable individual when seeking mental health care, which often complicates the situation. Considering the high suicide rates in youth, the importance of providing Psycho-Education and promoting social integration in immigrants are various ways by which suicides in Indian youth can be avoided. The present paper is an attempt to highlight the role of empathy to prevent suicidal tendency among youth. The paper also tries to discuss how we can generate empathetic attitude among youths and thus save their life.

Key Words: Suicidal tendency, empathy, Psycho-education

Suicide is nothing but killing himself/herself willingly with some definite motivation. We can read various incidents of suicide from newspaper every day. Usually, the people in the age group of eighteen to forty commit suicide. Every day, at least 1000 people commit suicide in this world. The number of people who commit suicide in the developed countries is thrice in number than those in the underdeveloped countries. But, presently, the tendency of suicide is much more among the younger generation. And it is a matter of great surprise that the incidents of suicide in India are increasing exponentially every day. There are various reasons behind suicide; it may be social, political, economical, moral or due to mental imbalance etc. But in my present treatise, I shall mainly focus on the reasons of decadence in the value system of the family and on moral degradation and shall make an endeavor to find out its solutions.

What is suicide?

We understand that murder is something which tempts one to kill the life of another person which is obviously unjust and wrongful. 'Don't kill any one'- this ethical rule does prevail in every society. And according to that rule, murder is punishable in accordance with the law of the state and at the same time, it is condemnable as per the applied policy of the society. But we can cite examples of

different kinds of murders where it is not possible to punish the murderer. Even there are cases where according to the applied policy of the society, it becomes disputable whether that act of murder is really condemnable or not. And suicide is such a murder where the murderer and the murdered are one and the same person. If any person ends his life for a particular reason then it is generally called 'Suicide'. This type of murderer cannot be punished according to the law of the state. A person can break down thoroughly due to intense pain from causes like demise of someone very close to him and may take the drastic decision of suicide. At that time, he chooses suicide as the gateway to come out of all his sufferings from life.

But, suicide is not always the result of a conscious decision. Therefore, the desire of a person to commit suicide sometimes becomes a compulsion. Here, death is not his/her choice but working in such a situation is tantamount to death. When a person goes for example, hunger strike till death with some purpose, it can be termed as 'Suicide'. Likewise, when an extremist kills himself by detonating a bomb attached to his own body for achieving some political reason, it can also be termed as 'Suicide'. During communal riot, if someone sacrifices his own life to save the life of a person of a different religion, it can also be called 'suicide'. Therefore, suicide is not always a matter of choice though the death caused out of the circumstances cannot be defined other than suicide. So, suicide can occur in different circumstances, for different objectives, and in different manners. But what is common to all the cases of suicide is annihilation of one's earthly body. But from the standpoint of the fulfillment of one's objective, 'Suicide' is a means to reach his goal. The objective of the desired suicide is to free oneself from his agonies and miseries of life, dejection etc.

The History of suicide

In the history of mankind the act of suicide is somewhere hailed with praise while in other places, it is condemned. For example, it has been condemned in the religions of Islam, Christianity and Jewism. On the contrary; it has been praised in Hindu religion. 'Satidaha' was one such example in Hinduism, where suicide was praised. The 'Sati' system was a custom in Hindu religion where the widows sacrificed themselves on the funeral pyre along with their dead husbands.In ancient Greece, the prisoners were allowed to commit suicide if they prayed for it.But at the end of the Roman Empire, legislation was made in this regard because it was observed that the bonded laborers committed suicide *en masse* which resulted in the wastage of their masters' wealth. The Japanese system of 'Sepku' which was nothing other than an alternative name of suicide did prevail for long in their society. That system helped people to escape from utter disgrace and awkward situations. That system was abolished in 1868. In ancient times, the Buddhist monks and Sannyasins used to commit suicide to protest against various social injustices.

From the medieval period, various laws were enacted to eradicate suicide from the society. After the French revolution in 1789, the prisoners were debarred from the rights to commit suicide. In the European Countries that law came into force in England in the year 1961. Now-a-days it is legally punishable in different States of the U.S.A to motivate someone to commit suicide. Similar

kind of law is done in India. Inspite of introducing such laws, the number of incidents of suicide is not reduced all over the World.

However, in the present age, our attitude towards suicide has changed and though we still consider it as a negative bend of mind, yet, under circumstances, we accept those cases with much more sympathy. Nowadays, the tendency for suicide in a person is examined scientifically and the particular person who is hooked with that tendency gets opportunities so that he can change himself and live a peaceful life. But there are families which still continue to have negative feeling regarding suicide. It proves that suicide is still condemnable in our society.

Family life and suicide

There could be various reasons behind suicides but the most important among all reasons is family affair. A child gradually grows up in his family. And as a result of that his/her family standing shapes his psychological frame. A child can grow naturally when his relationship with his parents is cordial being provided with the right kind of education. And for that reason, it is said that a healthy family is the root of a healthy baby. We have to admit that the increasing socio-economic pressure and various types of strain and tension have made our family lives quite frustrated and rudderless. But a few years ago, our joint families took the responsibilities of the children and the values were inculcated by the elders in the family. There was always a scope for conversation which helped them to cope with their mental agonies. With the withering of the joint families, the nuclear structure of the family is unable to provide that kind of support and there is always a sense of insecurity among the kids. And if both of the parents suffer from depression, the child becomes the victim of depression.

The children are greatly influenced by the behavioral pattern of his/her parents. If the mother is a victim of psychical disorder, the child becomes susceptible to it. The outward expression of dissension among the parents could hamper the mental growth of a child in the most negative way. The children remain insecure in families where the mother is constantly abused by the male members. If the child grows up in such an atmosphere, he would not be able to express his anger, distress, and pain to someone outside the family and those negative feelings will be directed towards his own self.If he has a sensitive nature,then he could end up his own life with a means of suicidal type.

Generally, in adolescent years various types of accumulated emotions create problems in the formation of personality among the teenagers. The teenagers become restless in finding the ways to express those emotions and if they are unable to express their emotions to their parents, they may feel insecure and restless and loneliness engulfs their existence. The family is the most secure place for the teenagers. They choose the path of suicide as the escape route when they get disconnected from their families and become totally helpless. It is certain that if there is no person in the family to help those teenagers in their hours of crisis, they become totally helpless and gradually the situation becomes very grave. So, it is quite clear that the upbringing of the children should be made in the proper way to build sanity among them otherwise it could be the prime

reason for their killing themselves. A sapling needs proper care, earth, light, water, and the appropriate atmosphere to grow and to become a beautiful tree. Likewise, a beautiful mind is to be nurtured and cared for by the family members.

They should be given the proper education to gain an insight into the Indian culture and tradition. Patience, generosity, humility, bravery, kindness, cooperation, sympathy, empathy etc are the good qualities which help in building an ideal character in a person. The present society is heading towards decadence due to lack of those qualities amongst us. And for that reason our children think that they have a bleak future and this inevitably leads them to commit suicide. Our inability to give them the proper education has driven them to such a tragic end. The impact of an ideal character as a role model is very much essential in building relationships among the people. In past such characters were available within the joint family system. Today's rat race in the society does not acknowledge the guidance of anybody. There is always a time constraint. We are not in a position to listen to anybody with due importance. And as a consequence, the teenager have been thrown into a world of solitude. In the present-day family structure, in most of the families, there is only one brother and sister and the gender bias in the society has divided them psychologically. Despite being educated, the unemployment problem has affected their lives quite considerably. And therefore, it can be said the reason for suicide is beyond society, family and nation but it is in our failure to build the ideal characters of our children.

Remedy

Suicide is a social crime. And to solve that problem, a three-pronged strategy has been suggested. Those are:

i) The feelings of loneliness should be removed.

ii) Social isolation is to be avoided; therefore, relationship with others is of primary importance.

iii) Psychiatric help is a must where needed.

Though to combat with the problem of suicide, the above three steps have been suggested, I feel empathy in the society is quite capable of combating the problem of the tendency for suicide since there is hardly any interaction between the individuals in the society. We are much more interested in ourselves and are self-centered. We have lost the essence of togetherness amongst us and as a result of that, we are no longer responsible towards others. So, the feeling of togetherness among the members of the society is very important. If we can inculcate this habit among us then naturally we shall be morally inclined to feel the difficulties of others and will be more responsible in our dealings with others. And the responsibility will make relationships closer amongst us in the society. The mutual relationship could only be possible if we all could have the virtues like respect, love, friendship, solidarity etc. In our religious scriptures too, everybody is being taught about the power of love. In the Buddhist philosophy, the thoughts of 'Pancasila' and 'Brahma-bihara'[1] are nothing but the universal friendship of the people of the world. What is 'Brahma-bihara'? It is a combination of thoughts which is comprised of i) Everybody should be happy ii) No one should have any enemy.

iii) Everybody should practice non-violence, IV) everybody should live as an embodiment of his soul. V) No one should be deprived of his rightful property. And according to Buddhist philosophy this thought should be imbibed in one's mind and that way one can feel his presence amongst others and that way one could achieve the attainment of 'Brahma-bihara'. In 'Brahma-bihara' thoughts of Buddhist philosophy, lie the basics of a good life like understanding others and to encourage others to realize life appropriately. Again in Jain philosophy too, the cleansing of mind has been mentioned. They prescribed the methods of non-violence, truthfulness, *asteyai.e*., non-stealing, *brahmacharya* or celibacy *and aparigraha* or non-possessiveness, through the practice of which one can cleanse his character. With the virtues, obtained by the process, one can do well for the entire world. So, from that perspective, it is observed, that the primary goal of a person should be to obtain grace and with its empowerment, he would engage himself for the wellness of other people and would be able to realize the other person quite rightly. If we can love others, we can also feel our responsibility to others. Therefore, it has become very important today to acquire goodness to build one's own character. This is not anything new. It has been mentioned in our ancient tradition. Nowadays, it has become very important to review those teachings again.

Feeling alienated from the society is an important reason for committing suicide. And in that case, empathy is an important factor in human values which bridges up in between among people. Empathy could pave the path for understanding each other. This attitude is not tantamount to sympathy because, through sympathy, we can understand other people completely. We are sympathetic to many people and even feel sorrow for their sorrow. But we could not understand his mentality properly. Empathy is something greater than sympathy. In Western philosophy, David Hume nicely explained empathy in the following manner…

According to Hume: "…the idea (sympathy) is presently converted into an impression, and acquires such a degree of force and vivacity, as to become the very passion itself, and produce an equal emotion, as any original affection."[2]

If we analyze the definition given by of Hume, it can be said that the emotion of person 'A' will influence person 'B' and at that time the emotional feeling of the person 'A' will clearly make a disjointed image of that feeling in person 'B'. That image gets changed in accordance with the present emotion in the mind of person 'A'. When the person 'B' is influenced by the emotion of person 'A', the emotions of both the persons ostensibly seem to be of the same nature. The following things can be observed from the definition of Hume.

i) The demonstration of one person's emotion can influence others.

ii) That influenced emotion very clearly and disjointedly makes an image on the other person.

iii) That image of emotion creates similar emotion in the mind of that person.

iv) And as a result of that, the same emotion is created in the mind of the other person.

The simple explanation of those philosophical definitions is that empathy is something which places one's self on the same mental platform of other person. It is to place one's self in the same mental situation of another person and observe his mental condition. It is like making a clone of other person's mental sorrow, agonies or joy in one's mind and to feel like that of the other one. Let us consider that my friend is in much grief due to his son's demise and myself in empathy, will feel the same grief as that of my friend by placing myself into the same mental frame of my friend. My feelings for my friend's grief will be called empathy, but the grief of my friend for his son's demise will be termed as congeniality. According to Hume, we are a social creature and for that reason, our life evolves in accordance with the mutual relationship with the other members of our society. As a social creature, we all have happiness, grief and the feelings of agonies. It is not that due to our identical form of interests, we feel happiness in other people's happiness and grief in other people's grief in the society. From that standpoint, we are quite conscious about the nature of happiness and sorrow and our morality helps us to understand the nature of both happiness and sorrow. Hume opined that our ability to conceptualize about sorrow and happiness are imbibed in our nature. Therefore, the person having the sense of happiness and sorrow can also identify the sorrow and happiness in other people's mind and can know about those emotions. So, it is the propensity of mankind to make a relationship with other through those emotions. And for that reason, the sorrow and happiness of others also create sorrow and happiness in us. The sense of empathy always crosses the boundary of the individuality of a person. And due to our narrow interest, we should not hold such type of attitude for some person, in accordance with our personal likewise and disliking.

And because of that, it is necessary to bring a change in our attitude. The solidarity of the parents in a family can be the only solution to the problems faced by their children. It is only through empathy that the parents can truly understand their children and help them overcome any kind of mental trauma. Today's students are the future citizens of our country.It is imperative that we, as elders understand them and help them in overcoming their fears and prepare them for their future.Showing solidarity with them will help us to unite with them and would surely help us in determining and solving their problems.

BIBLIOGRAPHY

1. Arthur Schopenhauer, (1995), *On the Basis of Morality*, trans, E, J, F Payne, Providence, R. I, Berghahn Books.
2. Batson, C, D, Sager, K, Garst, E, Kang, M,Rubchinsky, K & Dawson, K, (1997), "Is empathy-induced helping due to self-other merging?" *Journal of Personality and Social Psychology,* 73.
3. Blair, R (1995), "A cognitive developmental approach to morality: investigating the psychopath", *Cognition* 57.

4. Bonar, J, (1926), "The Theory of Moral Sentiments, "by Adam Smith,1759", *Journal of Philosophical studies*, Vol-1, No 3 (July),Cambridge University Press.

5. Carse, Alisa, L, (2003), "The Moral Contours of Empathy", *Ethical Theory and Moral Practice*, Vol, 8, No 1/2.

6. Choudhury, Sukomol, (2014), *Goutom Buddher Dhormo O Darsana*, Mahabodhi Book Agency, Kolkata

7. Damasio, R, A, (1994), *Descartes', error, Emotion, reason, and the human brain*, New York: Avon Books.

8. Goldman, Alvin, I, (1993), *Philosophical Applications of Cognitive Science*, West view Press.

9. Halpern, J, (2001), *From Detached Concern to Empathy*, Oxford: Oxford University Press.

10. Harris, James, A, (2009), "A Complete Chain of Reasoning: Hume's Project in *A Treatise of Human Nature*," Books One and Two, Vol. 109, Wiley.

11. Hume, David, (2007)*, A Treatise of Human Nature*, ed. David Fate Norton and Mary Norton, Oxford: Clarendon Press.

12. Levenson M and Neuringer C. (1971), 'Problem-solving behaviour in suicidal adolescents', *Journal of consulting and Clinical Psychology*, 37; 433-436

13. Mayer, P, Ziaian T. (2002), 'Suicide, gender and variations in India. Are women in India society protected from suicide?', *Crises*; 23; 98-103

14. Oxley, Julianna, C, (2011), *The Moral Dimensions of Empathy*, *Limits and Applications in Ethical Theory and Practice,* Palgrave Macmillan

15. Prinz, J, 2011, "Is empathy necessary for morality?" In *Empathy: Philosophical and Psychological Perspectives,*ed, P. Goldie and A, Coplan, Oxford: Oxford University press.

16. Snow, Nancy, E, (2002), "Empathy", *American Philosophical Quarterly*, Vol-37, No-1 (January), University of Illinois Press.

Mindfulness: A new approach towards wellness

Neerajana Ghosh
Faculty , The Neotia University
neerajanaghosh@gmail.com

Abstract

With ever changing demands, life brings a number of challenges and with it several physical and psychological disorders. Clinical psychology has developed a number of therapeutic approaches based on mindfulness for management of several psychological conditions .Mindfulness is a psychological process of bringing one's attention and awareness to experiences that are occurring in the present moment and accepting it without judgment. This technique is being scientifically studied by researchers now and has proved significantly effective in stress reduction. Mindfulness is derived from *sati*, an element of Buddhist traditions and based on Zen, *Vipassanâ*, and Tibetan meditation techniques. Now the principles are extensively studied and works of Thích Nh¥t H¡nh (1926), Herbert Benson (1935), Jon Kabat-Zinn (1944), and Richard J. Davidson (1951) among others have included it in mainstream psychotherapy, especially cognitive behavior therapy to deal with irrational thoughts, cognitive errors, self-defeating and mal adaptive thoughts and behaviour. Mindfulness practice has been employed to reduce symptoms of depression, anxiety, treatment of drug addiction. Several clinical studies have documented the benefits of mindfulness-based techniques in adults and children alike. Studies have consistently demonstrated a positive correlation between psychological health and trait mindfulness. The practice of mindfulness appears to provide therapeutic benefits to individuals with psychiatric disorders especially with anxiety disorders and depression, including to those with psychosis. Studies also indicate that rumination and worry contribute to the onset of a variety of mental disorders, and that mindfulness-based interventions significantly reduce both rumination and worry. Further, the practice of mindfulness may be a preventive strategy to halt the development of mental-health problems. This new wave has proven itself to be promising yet extensive research is needed which will definitely open new gates towards understanding different approaches towards wellness.

Keywords : mindfulness, Zen, *Vipassanâ*, anxiety disorders, mental-health problems

Introduction

Let us take a moment and stop whatever we are doing right now, at this very moment and focus on our breath. Now ask yourself, can you keep your mind still? Sounds very simple, right? Chances are if you are like most people, it is going to be challenging to keep the mind still for very long. Usually most people find it hard to calm the mind for a few seconds and with all varied distracting stimuli around us, the task becomes even harder. This however, according to researchers is the cause of major psychological stress.

So how can one learn to be more centered, calmer, and less stressed? Over the past few decades, psychologists, researchers, physicians and mental health professionals have turned to *Mindfulness*, a practice with ancient and time tested method to give promising results. Mindfulness gave a new scope and school of psychotherapy which focuses on the principles of mindfulness in the management of psychological disorders.

What Is Mindfulness?

"Mindfulness means paying attention in a particular way; on purpose, in the present moment, and nonjudgmentally." -Dr. Jon Kabat-Zinn (1991)

Words of Jon Kabat-Zinn captures the essence of mindfulness perfectly. It is a way of being rather than an activity in and of itself. In this essence, almost all and any activity can be carried out with mindful awareness. It is being present, here and now. And for the very reason it is the perfect answer for stress related problems. The mind is riddled with thoughts related to both past and future, the main reasons for worries and stress, and mindful approach provides a solution to the problem.

According to Naik, Harris and Forthun, (2013) it is originally associated with Buddhist philosophy and Vipassana practices, the term "mindfulness" comes from the Sanskrit word "Sm[ti," which literally translates to "that which is remembered" (Williams, Leumann, &Cappeller, 2004). From this, we can understand mindfulness as remembering to pay attention to our present moment experience (Shapiro & Carlson, 2009; Black, 2011).

Essential features of mindfulness:

According to Naik, Harris and Forthun (2013), Mindful awareness has three key features:

• **Purpose** – Intentionally and purposefully directing attention rather than letting it wander. Being present and consciously aware

• **Presence** – Mindfulness involves being fully engaged with and attentive to the present moment. Thoughts about the past and future that arise are recognized simply as thoughts occurring.

• **Acceptance** – Mindfulness also involves being nonjudgmental toward what arises at the moment, be it sensation or thoughts. This means that sensations,emotions and thoughts are not judged by the individual as good or bad, pleasant or unpleasant. They are simply noticed as what is "happening," and observed until they eventually pass.

Benefits of Mindfulness:

Benefits of Mindfulness is briefly mentioned below:

Psychological Benefits

- Increased awareness and improved concentration
- Significant reduction in stress, anxiety, and negative emotions

- Increased control over ruminative thinking (a major cause and symptoms of depression and anxiety)
- Increased psychological flexibility
- Improvement in memory, especially working memory
- Improvement in emotional regulation and decreased emotional reactivity
- Increased capacity for intentional behaviors, decrease in self-harming behaviours
- Increased empathy and compassion
- Awareness of one's own and others' emotions

Physiological Benefits

- Improved immune system functioning
- Increased neural integration,memory consolidation and increase in brain density in areas especially involving positive emotions, long-term planning and self-regulation.
- Low blood pressure
- Lowered levels of blood cortisol (a major stress hormone)
- Improved resistance towards stress-related illnesses eg.heart disease, irritable bowel syndrome.

Other benefits involving:

- Increased self-insight and self-acceptance
- Increased acceptance of others
- Increased self-discipline

History Of Mindfulness:

The history of mindfulness can be traced back throughout religions and the practice of mindfulness has been found all over the world. The term Mindfulness is rather new but the practice has its origins in ancient meditation practices especially in Hinduism, Daoism, Buddhist philosophy, Zen meditation and Vipassana that makes it at least more than 3000 years old. Mindfulness is derived from *sati*, an element of Buddhist traditions and based on Zen, *Vipassanâ*, and Tibetan meditation techniques.Now the principles are extensively studied and works of Jon Kabat-Zinn, Richard J. Davidson, Herbert Benson and ThíchNh¥tH¡nh among others have included it in mainstream psychotherapy, especially cognitive behavior therapy (CBT) to deal with cognitive errors, irrational thoughts, maladaptive thoughts and self-defeating behavior. Jon Kabat-Zinn is considered the founder of modern day Mindfulness, he also founded the Stress Reduction Clinic at the University of Massachusetts Medical School in the late 1970's. Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) techniques have since then helped thousands of individuals with conditions like stress related diseases, anxiety, heart diseases, chronic pain, depression, psoriosis, anxiety related disorders, personality disorders etc.

Mark Williams, John Teasdale and ZIndel Seagal in 1990s, have further developed Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) to help individuals suffering from clinical depression. Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT), a combination of Cognitive therapy with mindfulness has proven beneficial in treating various sub-clinical and clinical psychological disorders. Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) is approved clinically in the United Kingdom by the National Institute for Clinical Excellence (NICE) as one of the "treatment of choice" for recurrent depression.Centre for Mindfulness Research and Practice (2015) studied the effectiveness of mindfulness practices and found it effective on cognition, restlessness and emotion.

Interests of psychologists grew as more and more research findings started to prove the benefits of Mindfulness based therapies. Stress Reduction Clinic provided evidence of the role of meditation on emotion regulation. Interest gradually escalated to help clients gain metacognitive awareness i.e., the awareness of thought processes.

Efficacy:

With ever changing demands, life brings a number of challenges and with it several physical and psychological disorders. Clinical psychology has developed a number of therapeutic approaches based on mindfulness for management of several psychological conditions.

Mindfulness is a psychological process of bringing one's attention and awareness to experiences that are occurring in the present moment and accepting it without judgment. This technique is being scientifically studied by researchers now and has proved significantly effective in stress reduction. Clinical studies have documented benefits of mindfulness based techniques in children and adults with anxiety, depression and substance abuse disorders. Positive correlation has been consistently demonstrated between psychological health and trait mindfulness.

Studies also indicate that rumination and worry contribute to the onset of a variety of mental disorders, and that mindfulness-based interventions significantly reduce both rumination and worry. Further, the practice of mindfulness may be a preventive strategy to halt the development of mental-health problems.

This new wave has proven itself to be promising yet extensive research is needed which will definitely open new gates towards understanding different approaches towards wellness.

Evidence for the efficacy of mindfulness-based interventions during pregnancy is also emerging (Dimidjian and Goodman 2009; Duncan and Bardacke 2009; Vieten and Astin 2008).

Qualitative research on mindfulness based interventions and into participants' experience and processes of change give recurring themes revolving around living in the moment, shared group experiences and adopting and accepting attitude (Mason and Hargreave,2001).

Dunn, Hanieh, Roberts and Powrie (2012) studied the effects of mindfulness based practices on women in their perinatal period. They analysed significant decrease in distress and well-being. They explored the effects of 8-week mindfulness based cognitive therapy on a group of pregnant

women. Participants reported a significant decline in measures of stress, anxiety and depression. These improvements were observed which continued to the postnatal period. Increases in mindfulness and self-compassion scores were also observed over time. Themes identified from interviews describing the experience of participants were: 'stop and think', 'prior experience or expectations', 'embracing the present','acceptance' and 'shared experience'. Dunn, Hanieh, Roberts and Powrie (2012) concluded that mindfulness based cognitive therapy can benefit childbirth preparation classes.

According to Allen, Bromley, Kuyken& Sonnenberg (2009), Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) is a promising approach to help people who suffer recurrent depression and to prevent prevent depressive relapse. Twenty individuals who had previously participated in Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) classes for recurrent depression within a primary care setting were interviewed 12 months after their treatment. The primary aim of the interview was to focuson participants' reflections on what they found meaningful, helpful and difficult about MBCT as a relapse prevention program. Later, Thematic analysis was used by researchers to identify the key elements and patterns in participants' accounts. Researchers extracted four overarching themes: control, acceptance, relationships and struggle. Here acceptance plays an important role in clinical improvement. There is considerable interest among professionals and clinical researchersregardingMBCT and an emerging evidence base suggests that MBCT has the potential to help a large number of people step out of a pattern of recurring depression (Baer, 2003; Coelho, Canter and Ernst, 2007).

Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) was also developed with the intention of providing a cost-effective training program that will primarily help people with psychological disorders especially with anxiety and recurrent depression to learn skills that prevent depressive relapse (Segal, Williams and Teasdale, 2002). Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) has proven its efficacy in ameliorating distress in people suffering chronic disease (Baer, 2003; Kabat-Zinn, 1990) and cognitive behavioural therapy for acute depression (Beck, Rush, Shaw and Emery, 1979) and has demonstrated efficacy in preventing depressive relapse (e.g. Hollon et al., 2005).

MBCBT for depression is based on theoretical and empirical work demonstrating that depressive relapse is associated with the reinstatement of automatic modes of thinking, feeling and behaving that are counter-productive in contributing to and maintaining depressive relapse and recurrence (e.g. self-critical thinking and avoidance) (Lau, Segal and Williams, 2004). While MBCT is informed by a cognitive model of depressive relapse and includes several key cognitive and behavioural elements, its primary teaching vehicle is experiential learning through mindfulness practice. Outcome of research to date suggests that compared with usual care, MBCT plus usual care halves the rates of relapse over a 60 week follow-up period among people who have experienced three or more previous episodes of major depression (Ma and Teasdale, 2004).

Kuyken et al., 2008 in MBCT trial study has shown MBCT to be equivalent to the current treatment of choice, namely maintenance antidepressants, in terms of depressive relapse, and perhaps superior in terms of improving quality of life and residual depressive symptoms (Kuyken et al., 2008). Kuyken et al., (2001) in their study concluded that patients who were given MBCT as treatment

relapsed 47% compared to 60% of patients who were in the continuation with anti-depressant medication.

Themes like acceptance and control were particularly dominant in participants' accounts and were often explicitly described as being linked to improved well-being. MBCT is described as increasing the capacity to step out of negative self-evaluative thinking, and thereby increase acceptance of depression-related thoughts and feelings (Segal et al., 2002). Participants described a sense of being understood, being able to let go of pretences and identifying with other people who suffer depression. This enabled them to become aware of, express and accept thoughts and feelings, including difficult experiences. The transformative power of acceptance has been articulated in Buddhist psychology (Brach, 2003), social psychology (Neff, 2003) and clinical psychology (Hayes, Follette and Linehan, 2004).

Buddhist scholars (e.g. Feldman, 2005), clinical psychologists and researchers of contemporary mindfulness approaches in healthcare (Kabat-Zinn, 1990; Kabat-Zinn and Kabat-Zinn, 1998) have long argued that mindfulness enhances people's ability to be responsive in relationships with others and enhance their ability for self-compassion. Only very recently has empirical data emerged that mindfulness approaches that focus on different aspects of interpersonal functioning enhance the functioning in a variety of relationships (Carson, Carson, Gil and Baucom, 2004; Singh et al., 2006, 2007).

Being Mindful…

Learning "how" to be mindful is only the first step. Mindfulness practice revolves around "learning" how to be mindful and maintain a mindful awareness. It is familiarizing with the process of remembering to get back to the stimulus or focus of attention at the same time having a non-judgemental stance. According Jon Kabat-Zinn and TichNhat Hanh, almost any activity can be turned into a mindfulness practice. Any activity can be easily turned into a mindfulness practice if it involves the direct involvement of one of the five senses, an "anchor" and returning to the anchor as the basic components (Naik, Harris and Forthun, 2013):

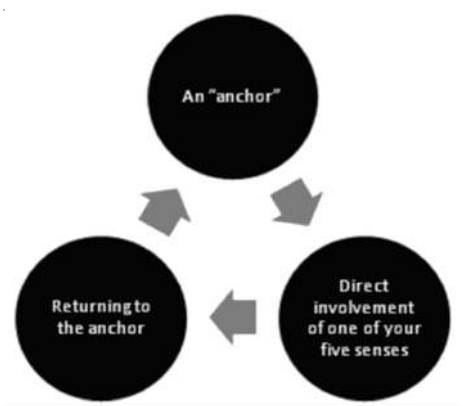

Fig. 1 Components of Mindfulness

1. **Direct involvement of one of your five senses** – Focusing on any one of the senses grounds oneself to the present moment and provides an opportunity to separate sensory experiences from the related thoughts. This gives the individual an opportunity to isolate the two and observe them as separate entities.

2. **An "anchor"** – An "anchor" serves as the focus or object of attention during mindfulness practice. For example, in Mindful-breathing practice, when one is focusing on the breath,i.e.,inhalation and exhalation, while maintaining a continuous awareness of the physical sensation of breath entering and leaving the body, breath becomes the "anchor" of attention. The challenge of mindfulness practice is staying in the present and not getting lost in past memories or future worries or being tangled in automatic thoughts that the mind creates. Having an anchor aids in not getting lost and returning to the anchor when the mind wanders.

3. **Returning to the anchor** – According to Naik, Harris and Forthun (2013) this is where the power of mindfulness practice comes from. While practicing mindfulness or practicing any task requiring attention, the attention shifts or in simple terms, the mind gets distracted. It is essential to understand that it is natural to be distracted. So the moment one identifies distraction, one reminds oneself and gently refocuses the attention to the anchor.

With continued practice the mind begins to settle into calmness and focus can be maintained for longer periods of time.

While at first, one might only notice drifting from the anchor, eventually practitioners will start to notice distractions (such as thoughts or sensations) as they arise in the psyche. Instead of focusing on them, attention is again shifted to the anchor, remembering to notice them and let the thoughts or sensations pass. A helpful metaphor is to look at these thoughts or sensations as passing clouds in the sky or waves in the ocean, to observe them and let them pass without being attached or involved with them.

To assess current state and therapy effect, researchers and psychotherapists use scales similar to Table 1. (Appendix) Mindfulness Assessment Scale adapted from the Five Facets of Mindfulness Questionnaire (Baer, Smith, Hopkins, Krietemeyer, & Toney, 2006) to assess mindfulness/awareness of individuals in clinical and non-clinical settings.

Future directions:

Research on Mindfulness has opened new avenues towards psychotherapy and management of disorders. Contemporary clinicians and theorists now are starting to prefer acceptance and mindfulness-based interventions like Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Dialectical Behaviour Therapy (DBT), Mindfulness Based Stress Reduction Therapy (MBSR) to especially treat anxiety disorders and personality disorders over Behaviour therapy (BT) or Cognitive Behaviour Therapy (CBT). Findings also indicate positive treatment effect of mindfulness-based therapy on mood disorder, behavioural issues etc. with decrease in recurrence rates.

Since the last decade research on mindfulness has increased yet the specific processes underlying MBCT's therapeutic effectiveness still remain unclear. This gives an opportunity for more research especially in the broader areas of (a) assessing and defining mindfulness, (b) applying the principles of mindfulness to clinical practice and research, and (c) expanding the paradigm.

Reference:

- Allen, M., Bromley, A., Kuyken, W., & Sonnenberg, S. J. (2009). Participants' experiences of mindfulness-based cognitive therapy:"it changed me in just about every way possible". Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 37(4), 413-430.
- Baer, R. A. (2003). Mindfulness training as a clinical intervention: a conceptual and empirical review. Clinical Psychology-Science and Practice, 10, 125–143.
- Baer, R. A., Smith, G.T., Hopkins, J., Krietemeyer, J., & Toney, L. (2006). Using self-report assessment methods to explore facets of mindfulness. Assessment, 13, 27–45.
- Beck, A. T., Rush, A. J., Shaw, B. F. and Emery, G. (1979). Cognitive Therapy of Depression. New York: Guilford Press.
- Black, D. S. (2010). A 40-year publishing history of mindfulness. Mindfulness Research Monthly, 1(5). Retrieved fromhttp://www.mindfulexperience
- Brach, T. (2003). Radical Acceptance: embracing your life with the heart of a Buddha. New York: Bantam.
- Carson, J.W., Carson, K. M., Gil, K. M. and Baucom, D. H. (2004). Mindfulness-based relationship enhancement. Behavior Therapy, 35, 471–494.
- Coelho, H. F., Canter, P. H. and Ernst, E. (2007). Mindfulness-based cognitive therapy: evaluating current evidence and informing future research. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 75,1000–1005.
- Dimidjian S, Goodman S (2009) Nonpharmacologic intervention and prevention strategies for depression during pregnancy and the postpartum. Clin ObstetGynecol 54:498–515. doi:10.1097/ GRF.0b013e3181b52da6
- Duncan LG, Bardacke N (2009) Mindfulness-based childbirth and parenting education: promoting family mindfulness during the perinatal period. J Child Fam Stud. doi:10.1007/ s10826-009-9313-7
- Dunn, C., Hanieh, E., Roberts, R., & Powrie, R. (2012). Mindful pregnancy and childbirth: effects of a mindfulness-based intervention on women's psychological distress and well-being in the perinatal period. Archives of women's mental health, 15(2), 139-143.
- Feldman, C. (2005). Compassion: listening to the cries of the world. Berkeley, CA: Rodmell Press.
- Hayes, S. C., Follette, V. M. and Linehan, M. M. (2004). Mindfulness and Acceptance. New York: Guilford.

- Hollon, S. D., DeRubeis, R. J., Shelton, R. C., Amsterdam, J. D., Salomon, R. M., O'Reardon, J. P., Lovett, M., Young, P. R., Haman, K.L., Freeman, B. B. and Gallop, R. (2005). Prevention of relapse following cognitive therapy vs medications in moderate to severe depression. Archives of General Psychiatry, 62, 417–422.
- Kabat-Zinn, J. (1990). Full Catastrophe Living: how to cope with stress, pain and illness using mindfulness meditation. New York: Delacorte.
- Kabat-Zinn, J. (1991). Full catastrophe living: Using the wisdom of your body and mind to face stress, pain, and illness. New York: Delacorte
- Kabat-Zinn, M. and Kabat-Zinn, J. (1998). Everyday Blessing: the inner work of mindful parenting. New York: Hyperion Books.
- Kuyken, W., Byford, S., Taylor, R. S., Watkins, E., Holden, E., White, K., Barrett, B., Byng,R., Evans, A., Mullan, E. and Teasdale, J. D. (2008). Mindfulness-based cognitive therapy to prevent relapse in recurrent depression. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 76, 966–978.
- Lau, M. A., Segal, Z. V. and Williams, J. M. (2004). Teasdale's differential activation hypothesis: implications for mechanisms of depressive relapse and suicidal behaviour. Behaviour Research and Therapy, 42, 1001–1017.
- Ma, S. H. and Teasdale, J. D. (2004). Mindfulness-based cognitive therapy for depression: replication and exploration of differential relapse prevention effects. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 72, 31–40.
- Mason O, Hargreaves I (2001) A qualitative study of mindfulness-based cognitive therapy for depression. Br J Med Psychol 74:197–212
- Naik, Parth& Harris, Victor &Forthun, Larry. (2013). Mindfulness: An Introduction.
- Neff, K.D. (2003). Self-compassion: an alternative conceptualization of a healthy attitude toward oneself. Self and Identity, 2, 85–101.
- Segal, Z. V.,Williams, J. M. G. and Teasdale, J. D. (2002). Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Depression: a new approach to preventing relapse. New York: Guilford Press.
- Shapiro, S. L. & Carlson, L. E. (2009). The art and science of mindfulness: Integrating mindfulness into psychology and the helping professions. Washington, DC: APA
- Singh, N. N., Lancioni, G. E., Winton, A. S. W., Curtis, W. J., Wahler, R. G., Sabaawi, M., Singh, J. and McAleavey, K. (2006). Mindful staff increase learning and reduce aggression in adults with developmental disabilities. Research in Developmental Disabilities, 27, 545–558.
- Singh, N. N., Lancioni, G. E., Winton, A. S. W., Singh, J., Curtis, W. J., Wahler, R. G. and McAleavey, K. M. (2007). Mindful parenting decreases aggression and increases social behavior in children with developmental disabilities. Behavior Modification, 31, 749–771.
- Vieten C, Astin J (2008) Effects of a mindfulness-based intervention during pregnancy on post-natal stress and mood: results of a pilot study. Arch WomensMent Health 11:67–74

- Williams, M., Leumann, E., &Cappeller, C. (2004). Etymologically and philologically arranged with special reference to cognate Indo-European languages. New Delhi: BharatiyaGranth Niketan.

Useful sources:

https://www.stillmind.com.au/mindfulnessworksheets.htm

Appendix

TABLE 1: ACCESS HOW MINDFUL YOU ARE

Score EACH DAY AND ITEMS ON A SCALE OF 1 TO 10

Mindful Behaviors	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	TOTAL
I am able to observe my thoughts and feelings without getting lost in them.								
I am aware of my body and physical sensations throughout the day.								
I can easily find words to describe my feelings.								
I can easily describe different sensations that I am feeling.								
I notice when my mind is wandering, andreturn it to the present.								
I am aware of the thoughts and emotions influencing my actions and behaviors.								
I can accept unpleasant experiences without judging them.								
I can be aware of my thoughts and emotions without judging them to be good or bad.								
I can notice my thoughts and emotions without having to react to them.								
I can pause before reacting in difficult or stressful situations.								
*Adapted from the Five Facets of Mindfulness Questionnaire (Baer, Smith, Hopkins, Krietemeyer, & Toney, 2006)								

WOMEN IN THE 21ST CENTURY: INDIAN CONTEXT

Priyanka Malakar
Guest Lecturer, Dept.of Political Science
Maharaja Manindra Chandra College,Kolkata
priyamam93@gmail.com

Abstract:

To promote a democratic state, it is very important to give women the same status as men in all spheres of society. Although in ancient India, the social status of women were at par with men, with the advent of modern age women progressively lost their social status. Women have been victimized by poor quality social practices like- satidaha pratha, devadasi pratha, ballo bibaho etc.

In post-independence period, some important steps were taken in the third chapter of Indian constitution (article-14,15,16) & the fourth chapter (article-39, 42) to bring forward the social status of women in India. In addition to the above mentioned laws, the Indian government has also adopted some significant plans like the "*Indira Mahila yojana*," "*Pradhan Mantri Matritva Vandana yojana"*, "*Beti Bachao Beti Padhao yojana"* etc.

Despite these efforts of the Indian government , women still fail to get equal status as men in society. According to the 2001 and 2011census data, women lag far behind than men in the sphere of education, health, employment, political context, gender equality etc. In the political context, the number of women parliamentarians in India has hardly crossed the 14 percent mark in the seventeenth Loksabha elections, conducted more than sixty five years after independence.

This paper is try to illustrate the present socio-economic –political position of women in the current centenary.

Keywords: social status, education, gender equality, employment.

INTRODUCTION

> "It is impossible to think about the welfare of the world unless the condition of women is improved. It is impossible for a bird to fly on only one wing"- Swami Vivekananda

The equal status of women in society is the precondition for promoting sustainable development and above all to build a democratic and humanistic society. Respect for women is a necessary trait of a rising nation. It appropriately applies to the women in ancient India, when they were not a meek, shy and weak creature but were bold, free and strong, as is a hallmark of an advanced society. In the pre Aryan period, average Indian women continued to lead a happy and contended life. In later years, as Aryans changed from a pastoral livelihood to being agriculturists, they became conscious of preserving the purity of their race which in turn made them the victim to growing

social evils. Positions of the women in Indian society were deteriorated further by the laws of Manu. The situation improved a little as a result of the advent of Islam because it granted a much stronger legal position. Europeans and Christian missionaries in particular ushered India to an entirely new phase of women emancipation, and gave birth to a powerful reformist movement led by Raja Ram Mohan Roy (1772 - 1833), justice Mahadev Govind Ranade(1842 - 1901) and Swami Dayanand Saraswati (1824 - 1883).They all agreed upon the view that only women education is the solution to the problems of Indian women.

- Since independence, there have been dramatic changes in the legal, political, education and social status of women. Article 14 of the constitution of India ensures 'Equality before the law' and Article 15 'Prohibits any discrimination'. It is notable to specify here the provision made in Article 15(3), which empowers the state to make 'any special provision for women and children'. Article 16(1) guarantees 'equality of opportunity for all citizen in matters relating to employment or appointment to any office under the state' and Article 16 (2) forbids discrimination 'in respect of any employment of the office under the state.' based on the grounds only of 'religion, race, caste, sex, decent, place of birth, residence or any one of them'. The directive principles of state policy, which concerns women directly, have a special bearing on their status. These are
- Art. 39 (a) (right to an adequate means of livelihood for men and women equally)
- Art.39 (d) (equal pay for equal work for both men and women)
- Art.39 (e) (Protection of the health and strength of workers -men, women and children from abuse and entry into avocations unsuited to their age and strength) and
- Art.-42 (just and humane conditions of work and maternity relief)

However the fact remains that Indian women continue to be discriminated in every sphere of life which is reflected in the condition of their health, education, employment and life in society. The first systematic report on 'women toward equality' made in the year 1974, is a serious challenge to government for its commitment to equality. It shows that status of women has not improved but in fact, declined since Independence. The bold indication towards the discrimination against women is the dissimilar sex ratio. The sex ratio has been declining through the last 100 years. The all age sex ratio has declined from 972 females for every 1000 males in 1901 to 940 in 2011. Jean Dreze and Amartya Sen (1996) have termed the low sex ratio in India as "missing women".

Table-1
Sex ratio in India, 1901-2011

Source: Census in India 2011

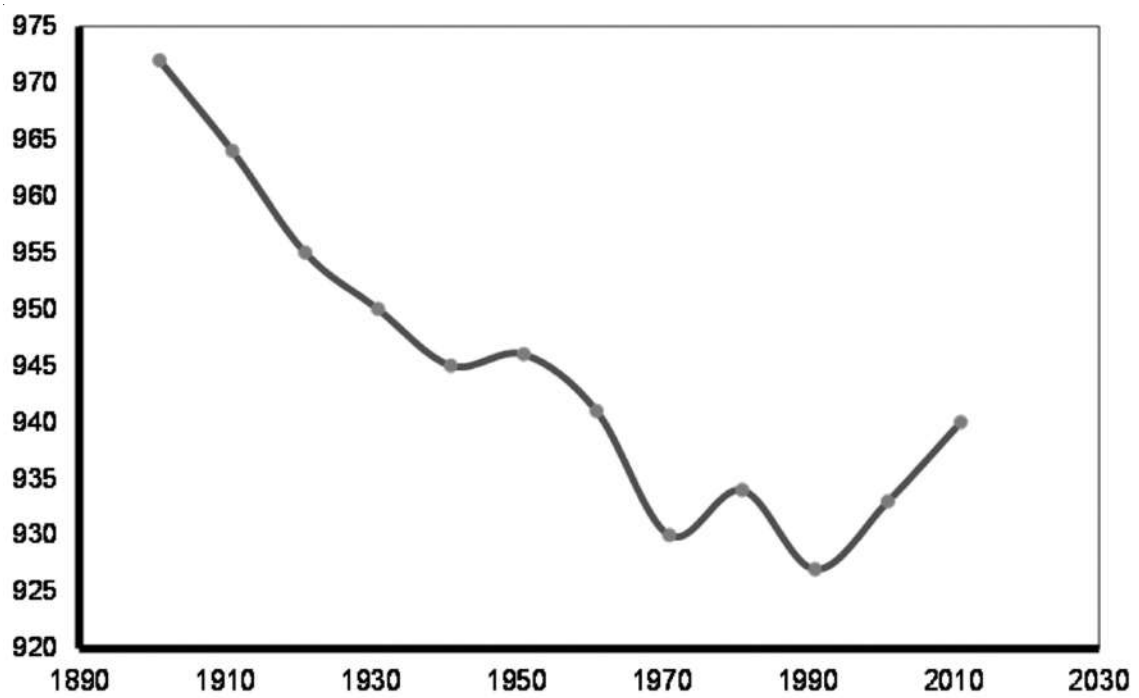

Table 1 gives the trends in sex ratio in the population for the past hundred and ten years.

The state Haryana has the lowest rate of sex ratio in India and the figure shows the number of 877 of females to that 1000 males it is alarming to note that sex ratio of the 0-6 age group female child has dropped shortly from 927 in 2001 to 919 in 2011.

Another serious issue for Indian women is the prevailing violence against women. In fact in certain societies, wife beating is still considered to be as normal as a husband's right. Violence against women and girls (VAW) is a direct consequence of gender inequality. Estimate by the World Health Organization(WHO) indicate that about 35% of women and girls worldwide have experienced physical and sexual violence from a intimate partner violence or non-partner ,in their life time. According to the Crime Record Bureau, domestic violence against women is only increasing year by year. Crime Record Bureau reports the number of torture to be 41, 318 in 1998 which increased to 58,319 in the year 2005. It also mentions 12, 218 incidents in nineteen Metropolitan cities in 2016**.** Moreover it could be reasonably assumed that the actual number of incidents might be higher than the official records as most incidents of violence women are left unreported.

EDUCATION

Although, in the sphere of education, the Government of India has expressed its deep commitment towards education for all, the rate of female literacy is not up to the mark. Immediately after Independence only 27.16 percent of men and 8.86 percent of women were literate as per 1951 census record. Through, the overall literacy rate has increased but the female literacy rate lag far behind than men. In 1981 census Report, the literacy gap between men and women were 26.62 percent. The 2001 census Record shows the literacy rate of women to be 53.67 percent while 75.26 percent in case of men.[15] In 2011 Census report shows that the gap between men and women literacy rate has marginally decreased. The literacy rate of men was 82.14 percent while for women it was 65.46 percent. According to the Global Gender Gap report 2018, India ranked 108th out of 149 countries and in education attainment ranked 114th. So, it could be said that in India there is a huge gender gap in all spheres of life as compared to other western countries. Average percentage in literacy reveal a wide variation from one state to the other; for example while 86.75 percent of women in Mizoram are literate, only 33.12 percent women in Bihar can read and write.

This low level of literacy among women not only has a negative impact on women's lives but also on their family lives and on the society as a whole. The low level of literacy is also has an impact on sex ratio. According the census Report 2011 the main cause behind the decline of the sex ration in India is inadequate Education

In order to focus on girls' and women's literacy and educational programmes, Government has taken certain schemes like the Mahila Samikhya, to empower rural women and motivate them to educate themselves. The District Planning education programme is also focused on enrollment of girls in school. In many cases, parents view the investment on daughters education was a simply waste of money because, the daughter will ultimately live with her in laws, and they would not be directly benefited from the daughter's education. So in order to increase the female illiteracy rate and girls dropping out of school attention must also be provided to enlighten the parents.

EMPLOYMENT

In place of work, women spend more hours than men but working women are invisible to most of the population. The hours which they spend for maintaining the household and domestic work for their families are not counted because it is obligatory for them.

Presently, the contribution of women to business as entrepreneurs is praise worthy. Women are generally concentrated in SME(Small and Medium sizes Enterprises)s and it comes up to major share of employment and growth potential with around 224 million women, globally, operating business. Research reveals that companies having female membership and multiplicity surpass the others. Business which are managed by women are major contributor in world economy and their number is on the rise. A Research conducted on female entrepreneurship Index by Washington-based Global entrepreneurship and Development Institute (GEDI) in 2015 ranks India at 70thamong 77 countries and at 68thamong 137 countries in 2018**.** According to the Sixth Economic census released by Ministry of Statistics and Programme Implementation, women constitute around 14

percent of the total entrepreneurship. Out of the establishments this operated by women entrepreneurs, 34. 3 percent is based on agriculture activities.

Women's unequal access to education, restrict their ability to learn those set of skills that require minimum functional level of literacy. Lack of mobility, low literacy levels & also the traditional gender attitude prevent women from acquiring modern skills, knowledge which eventually transform women into a unskilled work force.

POLITICAL ROLE

The political role of women as a subject for research started to be acknowledged across the world after 1975 with the declaration of woman's year by the United Nations Organization. After the mid seventies the committee on the status of women in India (CSWI) in its report of 1976, for the first time, systematically considered the demand for greater representation of women in the political institutions. In 1988, the National perspective plan for women also suggested that 30 percent of seats be reserved for women at all the political institutions. Following these reports the Government of India passed the 73rd amendment of the Constitution followed by 74th amendment (enacted by the parliament in 1992 and ratified by all state in April, 1993) act, which is a major initiative towards inclusive democracy. Women, dalits and tribals have got opportunities to participate in governance. It provided the entry point for women and as well as a empowering instrument for the women. The amendment has provided reservation of not less than one- third of the elected officers in local government for women.

But it is unfortunate to note that for all those national, state positions and also for those political parties, where reservation is absent, participation and representation of women have been automatically low. From the first election in 1952 to the 17th Lok Sabha election held in 2019, women participation has increased from 4 percent to merely 14 percent representation of the total. In fact the global picture of women's representation in the developed countries is also no better, and as per the report of the Women in National parliament 2018, women represent only 23.5 percent in United State of America,10.0 percent in Japan at the lower house of the national parliament.

Although in India, the status of women in political empowerment is comparatively higher other than many western countries. India is ranked 19thout of 149 countries in political empowerment of women. Three major political parties of India are headed by women leaders. India had a strong and independent woman Prime Minister for seventeen years (1966- 1975) & (1977- 1984). India had a woman president and the speaker of Lok Sabha (the lower house of the Parliament) has been also woman on two occasions. A very powerful movement of reservation for women in parliament and legislature is active in India. In spite of all these positive factors, India ranks 108th at the bottom of the list in Gender Development.

DEVELOPMENT OF WOMEN THROUGH GOVERNMENTAL INITIATIVE

In the post independence era, the Indian women were given equal status with men by the Indian

constitution and various provisions have been made to protect the interests of the female population. Right from the days of first five year plan (1951- 1956), adequate services were included to promote the welfare scheme of women so that they can play their legitimate role in the family and the community. In 1976, a Women's Welfare and Development Bureau was set up under the Ministry of social welfare to initiate necessary policies, programmes and measures for women. In 1982, a woman's employment programme introduced with the assistance from Norwegian Development Agency (NORDA). In 31st January 1992 the National Commission for Women was constituted which work as a friend, a counsellor and educator for the Indian women.

In order to coordinate and integrate the components from all sectorial programmes and facilitate their convergence to empower women, India Mahila Yojana (IMY) was launched as a strategy on August 20, 1995. It proposed to bring out a mechanism by which there could be a systematic coordination and a meaningful integration of various programmes of different sectors to meet women's needs and to ensure that women's interests are taken care of and provided for under cash scheme.

In continuation of the Ninth plan (1997-2002) made two significant changes in conceptual strategy for women and in Tenth five year plan (2002- 2007) constituted three working group for focusing on social empowerment of women and other economic empowerment of women.

The current census (2011) data has revealed a declining trend in child sex ratio (CSR) between 0-6 years with an all-time low of 919.(Ref 8) The issue of declining CSR is a major indicators of women disempowerment as it begins before birth. For the prevention of this complex issue, India government has been launched Beti Bachao, Beti padhao Yojana (save the daughter, educate the daughter) in 22 January, 2015. It was the joint initiative of the ministry of women and child development (MOWCD), The Ministry of Health and Family Welfare (MOHFW), and the ministry of Human Resource Development (MOHRD). Under this scheme, the main focus on female and male sex ratio and major steps are being taken toward the prevention of gender discrimination.

Despite these above mentioned government initiatives, the present day women are still far behind. In India women's right and values continue to be killed by the society in the name of dowry system, sexual harassment, Female infanticide, rape and illegal trafficking. So, it is hard to believe that women are equally justified in this so called society.

CONCLUSION

In conclusion, it can be said that there is need to strengthen the power of women and make policy changes ranging from increasing awareness, propagation through media, improving quality of education, promoting family friendly policies, providing working conditions, helping parents to maintain work life balance. Women are in no way behind man, the need is only to except this truth. If all females from every region-specific culture have equal opportunity, only then can this nation progress. After all, Pandit Jawaharlal had famously said "to awaken the people, it is the women who must be awakened , once she is on the move, the family moves, the village moves, the nation moves".

REFERENCES

Singh, Hemlata & Singh, Rajkumar, 2016, 'Challenges of Contemporary India: Polity, Justice, Education, Empowerment & judiciary' (p.-157-162), Delhi, Kalpaz Publication.

Towards-Equality-1974-Part1.Pdf, (p.-1-3)

Towards-Equality-1974-Part2.Pdf, (p.-357)

http://censusindia.gov.in/Census-And-You/gender-composition.aspx

Majumdar, P.K, 2017,'India's Demography: Changing Demographic Scenario in India' (p.-65-81), Jaipur, Rawat Publications

http://www.census2011.co.in/sexratio.php

Beti-bachao-beti-padhao-campaign-24072014.pdf, Achieved from, http://web.archive.org/web/20141105190442/http://wed.nic.in

http://www.hdr.undp.org/en/content/violence-against-women-cause-and-consequence-inequality

TABLE-27-INCIDENCE OF CRIMES COMMITTED AGAINST WOMEN DURING 1998.pdf, Accessed from, http://ncrb,gov.in/statepublications/CII/CII1998/Tables.htm

Table5.2.pdf, Accessed from, http://ncrb.gov.in/StatePublications/CII/CII2005/Tables.htm

Crime in India-2016 complete PDF 291117.pdf, Achieved from, http://ncrb.gov.in/

Final-PPT-2011-chapter6.pdf,(p.-102), Accessed from, http://censusindia.gov.in/

WEF_GGGR_2018.pdf, Accessed from, http://www.weforum.org/reports/the_global_gender_gap_report_2018

Final_PPT_2011_chapter6.pdf, (p.-116) Accessed from, http://censusindia.gov.in/

Jain, Dr.Akansha, 'Women Entrepreneurship and Human Rights' , In Swati Chakraboty & Dr. Nanjunda(eds.),2016, Multidisciplinary Handbook of SOCIAL EXCLUSION AND HUMAN RIGHTS,(p.-167-183), New Delhi, AAYU PUBLICATION

https://thegedi.org/global-entrepreneurship-and-development-index/

5_Highlights_6ecRep.pdf, Accessed from, http://www.mospi.gov.in/all-india-report-sixth-economic-census

Ragupathy, V. , 'engendering Democracy at the Grassroots: Challenges and Opportunities'. In V.Rgupathy & Vasundara Mohan(eds.),2013, Secularism and Pluralistic Democracy in India ,(p.-235-256), New Delhi, CONCEPT PUBLISHING COMPANY PVT.LTD

http://archive.ipu.org/wmn-e/classif-htm

Girl Children's multidimensional experience in Sports in India: Inequality cascading into Crisis

Dr. Saheli Chowdhury
Assistant Professor Dept of Sociology,Belda College, Paschim Medinipur
chowdhurysaheli@yahoo.in

Abstract

Sports like education is integral component for a child's apposite development. The present study explores various forms of intersectional discrimination experienced by girl children in India within the institution of sport and how it puts childhood for girl children in a structural crisis. Intersectionality during the last three decades emerged as a primary analytical tool in sociological discourses which questions the ideology that construe inequality as an inevitable consequence of one's social position, taking into account not gender alone, but also other sources of identity like race, class, sexuality, religion, age, ability, nationality. Though a meager amount of literature exists examining varied factors that promote or inhibit girl children's participation in sporting activities, Annette Lareau (2003) noted that children's access to and participation in structured sports are highly influenced by the union of their class location, family environment, school curriculum, gender, and parenting style. In fact, burgeoning researches in North American and European societies espousing intersectional approach within sociology of childhood has brought to the fore the diverse lived experiences of children belonging to different strata of the society and how inequality escalates caging childhood in a real crisis especially for girl children. Conversely in India, research on the interrelationship of childhood and sports, more specifically the intersectional complexities influencing girl children's participation in sporting activities has not been sufficiently examined. This paper hence illustrates by drawing real life examples from Indian context how the communion of diverse social identities like class location, religion, gender and political identity situate girl children in multiple hierarchies i.e. expose them to structural intersectional discrimination, which controls and manipulate their opportunities to participate in organized sporting events, creating a denial of childhood for these children. Additionally, this paper also focuses on how the complex alliance of social characteristics facilitates discriminatory practices by reproducing their subordinate status and fabricates unequal prospects for these girl children.

Key Words: Crisis, Sports, Intersectionality, Structural and Political Intersectionality

Introduction

"Children have the right to rest and leisure, to engage in sport and play and recreational activities appropriate to the age of the child and to participate freely in cultural life and the arts[1]"

- CRC, 1989

Experts on child well-being have long suggested that sport and play form an integral part of healthy childhood development, allowing children to gain the information, personal and social skills, and support necessary to effectively navigate key life transitions (https://www.unicef.org/rightsite/364_592.htm). The Convention on the Rights of the Child (CRC) in the United Nations General Assembly (1989) recognized the importance of sports necessary for the holistic development of children by upholding their rights to education, health, personal growth, protection and their right to play regardless of their identity, gender, origin or status (https://www.unicef.org/rightsite/364_592.htm). It further acknowledged that sport itself is by no means neutral when it comes to the involvement, safety and welfare of girl children. Research on sport and children rights reveal that sports/physical activities can be used as vehicle of empowering girl children, enhancing their physical and mental health. Consequently, Article 31 of the Convention on the Rights of the Child (CRC) recognizes that sport increases self-esteem among adolescent girls and provides opportunities for the advancement of girls in the face of gender-related barriers[2]. Interestingly, sport studies scholars have placed a generous amount of emphasis on studying gender and sports, sport media, elite amateur, college, professional athletes and sport organizations, whereas children and sports are rarely discussed and studied by sport sociologists globally (Messner, 2014:102). Furthermore, the intersectional dimension i.e. the interdependence of (girl) children's sports involvement and other social variables (like their gender, class, sexuality, religion, disability) has remained an unexposed area for sociological analysis.

Therefore, this article aims to approach the issue of girl children's experience within the arena of sports which is amplified through their multiple social identities that situates their childhood experience in crisis. This paper hence illustrates by drawing real life examples from Indian context how the communion of diverse social identities like class location, religion, gender and political identity situate girl children in multiple hierarchies i.e. expose them to structural and political intersectional discrimination, which controls and manipulate their opportunities to participate in organized sporting events and reap benefits of engaging in sporting activities.

Methodological and Theoretical Background

The present exploratory study employs Feminist Qualitative Content Analysis to analyze the intersectional experiences of children in the world of sports. Significant real-life events faced by children/child athletes have been given in the study to support the notion of intersectional identities and incidents. Two leading English Newspapers titled '**Times of India**' and '**The Hindu**' has been examined and an in-depth feminist qualitative analysis of the newspaper content has been done to reveal the silenced issue of interlocking experiences. Content Analysis separately can be understood as the systematic study of texts and other cultural products or non-living data forms. While by adding a feminist lens to the method of content analysis transforms the method into a unique technique of inquiry, which questions and unearths hidden meanings of material and symbolic cultures that would otherwise be unexplored. Patricia Lina Leavy in her article 'The Feminist Practice of Content Analysis' (2000) points out that feminists employ content analysis from a deconstructionist perspective in which the text is analyzed not only to interpret what is in it but also

what is missing or silenced. Therefore, the goal of Feminist Qualitative Content Analysis is this present study is to deconstruct the text (Newspaper articles) and reveal its inner meaning, or the contradictions of latent and manifested connotations concealed within it to unearth the hidden intersectional experiences of girl children/child athletes in India. Gender, class, religion and political identity have been taken as social categories of identity that intersect to amplify their existence.

Intersectional approach (Crenshaw 1989) is a theoretical perspective which questions the ideology that construe inequality as an inevitable consequence of one's social position in the society, taking into account not gender alone, but also other sources of identity like race, class, sexuality, religion, age, disability, nationality. Accordingly, 'Intersectionality' developed as a new transformative paradigm within sociological scholarship that aims to expand its theoretical prospect and lead to new proliferation of researches in diverse arena including sports sociology & provide opportunity to study nuanced lived experiences of individuals including children from multiple standpoints. However, in India, the interrelationship of childhood & sports, more specifically the intersectional complexities influencing girl children's participation in sporting activities has remained an uncharted territory within its sociological discourse. Consequently, Indian sociological scholarship has failed to unearth and document the already existing hidden crisis of its girl children, escalated by their intersecting identities in relation to their experiences within the domain of sports.

Girl children's experience in sports through the Intersectional Lens

Girl children in India who are structurally located in contrasting stratas of the society experience unequal reality, life chances compared to their privileged counterparts. Though the outcome of Intersectional collision doesn't bear similar consequence for all girl children, the problem of exclusion and gendering within mainstream sports remain universal. Therefore, I would like to approach the issue of Intersectional inequalities by discussing how the location of girl children/child athletes at the intersection of class, gender, religion, and political identity create a multifarious trap of gendering and marginalization which aggravate their existing inferiority.

In the year of 2015, 15th March one of India's leading newspaper 'The Times of India' brought to us a shocking story of religious fundamentalism, which was: "Muslim clerics' fatwa forces cancellation of women's soccer match"

"Organizers had to cancel a women's football match and national-level players who had come from various places across the country had to return as fundamentalists allegedly issued a fatwa to stop a women's football match at Harishchandrapur, Malda on Saturday. Progressive Youth Club of Chandipur village area had organized the football match as a part of their golden jubilee celebrations as well as to promote football among young girls and boys & especially encourage girls to engage in sports. The women's football match was to be played between Kolkata-XI and North Bengal-XI, followed by another match between under 14 girls football team (Kolkata). Local Imam Maqsud Alam and other Muslim clerics claimed that "Islam does not permit women to wear short body-hugging clothes and play in public, nor does it allow us to watch women playing in the field wearing short dresses".

They further claimed that such display of women running & playing would negatively influence others in the village and set a bad example for future generation."

Tess Kay and Ruth Jeanes (2008:131) in their article *'Women, Sport and Gender Inequity'* underscored three rationales that have been given for opposing women's participation in sports –

- *The medical rationale* - that women are physiologically unsuited to sporting activity.
- *The aesthetic rationale* - that women engaging in sports are an unattractive spectacle.
- *The social rationale* - that the activities and behaviour associated with sports is contrary to women's 'real femininity'.

Sport is an ideal arena for displaying gender ideology, control and power. Sports feminists are explicitly engaged with the manifestation of power and patriarchal rationale often through the analyses of sports that have been traditionally defined as "men's sports" and have prohibited women from active participation. Similarly, children especially girl children from a tender age are proscribed "socially appropriate behaviour" through various disciplinary practices, like preventing them from engaging in 'masculine sports' or rationalizing the preventive measures either through the medical, aesthetic and social rationale. However, in India, gender has been considered as a separate and solitary rationale for explaining girls/ women's limited participation, discrimination and exclusion in sports (Singh 1990, Prakash 1990, Singh 2004, Rao 2010 Asitha M. 2012). Whereas factors like class, age, disability, religion and even marital status which in association with gender heighten such prejudice has not yet been taken into consideration for qualitative research. Joan Acker (2006) acknowledged that gender as a category is not alone the source of oppression, but it is complicated by class location and other differences. In other words, Kimberle Crenshaw (1991) states that individuals (specifically women) are victims of 'Structural Intersectionality' i.e. the position of any individual especially women at the intersection of class, gender, religion and other identities shape their life chances which in turn fabricate an unequal reality for them. Similarly, girl children in India who are structurally located in contrasting strata of the society experience unequal reality, life chances compared to their female/male counterparts, which makes them victims of structural intersectionality or structural intersectional crisis. Like for instance in the case above these emerging sportspersons have been restricted in their public display of athletic skills not alone due to their gender, but because of the amalgamation of their gender, religious affiliation as well their class location. To cite another example, Sania Mirza is an established and celebrated Tennis player in India, who represents women athletes and shares similar religious background i.e. Islam. What differentiates her experience from the football players in Malda district is the class location ,economic and social resources Sania Mirza possess to support her career in sports as well as retaliate against all odds. Therefore, these girl children are structurally located in different strata in relation to the male athletes belonging to similar or different religious affiliation (due to their gender) as well as in relation to privileged women athletes (due to their class, economic background). Other significant incidents across the globe reflect similar situations like on April 23rd 2015 the Herald Sun reported that **'Girls Lose Virginity By Running': Australian School Stops Female**

Students From Taking Part In Sporting Event- Omar Hallak, the principal of the Islamic school Al-Taqwa in Victoria, allegedly believes that girls may lose their virginity with excessive running[3]. Therefore, cultural and religious backgrounds acts as agents of social control that redefine abilities for girl children, confining them within the normative gender role, thus reconstructing 'sports' from self determined activity to socially structured and socially determined activity preventing them from a tender age to engage in any sporting activities. Consequently, girl children in India experience exclusion, oppression within the realm of sports where they find themselves at the intersection of innumerable identities that manipulate their life experiences- i.e. from the choice of sports to maintaining a successful career in sports.

In this incident girl children who intends to pursue football or any form of sports are structurally located in differential position compared to

Enthused by the remarkable triumph Poonam, the vice-captain of the team narrated her experience about her journey, she said:

"Prior to the tournament we were asked to collect our birth certificates from the gram panchayat office for applying for passport. The officers asked money from us and laughed at us. They ridiculed us of playing football. Later when we went to request them to hasten up the process, they slapped us and even made us sweep floors".

Sports feminists espousing intersectional theory opine that not alone gender but also the class locations of women athletes together operate as the basis for 'social closure' by denying them access to opportunities, rewards or positive life chances. Furthermore, the patriarchal ideology along with other mechanisms of 'social control' like force and violence creates traditional and political boundaries for women athletes, preventing them from pursuing sports in future as well as reaping benefits of playing sports. It either tries to manipulate the consciousness of powerless individuals from the very start of human sense through the process of socialization or else they use the mechanism of force or violence to coerce conformity. The above cited incident informs us how the Panchayat officers applied both ideological as well as violence apparatus of social control for

preventing them from participating in the tournament. Whereas the same officers would never have behaved in a similar manner if they were asked to do the same for children belonging to economically affluent and socially privileged section like that of Sachin Tendulkar or Saurav Ganguly. Therefore, the social & political location of these (girl) children acted as a mechanism of political intersectional disempowerment (Crenshaw, 1991:1251) that, children with a tribal identity & with a poor class background experience. In this context the concept of Political Intersectionality highlights the fact that these tribal girl children are situated within three subordinated groups i.e. their specific TRIBAL, CLASS identity & GENDERED experience. For instance, sports irrespective of political identity, class position, religious identity is considered as a natural domain for boys/men. Consequently, male tends to determine the strategies of development through sports. Therefore, Tribal girl children do not experience intersectional disempowerment like tribal male children nor do their experiences coincide with those tribal girl children belonging to privileged class. The combined effect of social (gender), Political (Tribal) economic (class) positions of these girl children intensify their inferior position compared to their male counterparts as well as to their female counterparts who belong to can avail opportunities to pursue their dreams.

Thus, it is evident from the real life examples that not alone gender, but also the religious affiliation, political (tribal community) identity and class locations intersect to mutually contribute to the divergent experiences of children, especially girl children in sports which further situates them in an disadvantaged position and reducing them to victims of repression that prohibit their future development and emancipation.

Conclusion

It is clear by now that Intersectional approach aims to address those individuals who are found to be situated in different social locations across the globe. Feminists advocating intersectionality seek to provide voice and vision to those (especially women) who are trapped within the interlocking structures of inequality. Nonetheless, sport and physical activity have not yet been used on a large scale as a strategy to unearth children's experience round the globe. Sports and Physical activity were specifically recognized as a 'Human Right' in 1978 by UNESCO, supported by The Convention on The Rights of the Child in 1989, to provide equal opportunity for young individuals irrespective of their gender, religion, race and class to freely participate in any sporting activities in the form of leisure, recreation and play appropriate to the age. However, Indian sociological discourse is yet to acknowledge the crisis of childhood in general and specifically address issues on girl children's unequal experiences within the domain of sports. Besides, having established itself as a strong theoretical orientation in Europe and North America, intersectional technique is yet to be explored and embraced within childhood studies by Indian Sociological scholarship to address the valuable and veiled issues related to children. Historically and cross-culturally, children have always been victims of oppression whose everyday life experiences are silenced and agency denied. Likewise, in India children, especially girl children have always been considered unfit for any athletic activity compared to their male counterparts by the dominant patriarchal knowledge. Ideological control tends to have an important and significant impact on the lives of those who are powerless (girl

children in this study) or do not possess adequate resources, agencies to challenge the prevailing knowledge. In a patriarchal society where 'dance' is considered as a gender appropriate form of physical activity for women over sports, girl children pursuing sports are considered as deviants. Besides class positions of girl children, their economic condition as well as their political identity, play a vital role in determining their future in sports. Their contrasting structural and political location compared to other privileged children deprives them of basic human rights. The above cited real life incidents not only reveal the appalling condition of the girl children within the arena of sports in India but affirms the reality of intersecting identities of these children who belong to different class backgrounds, with different religious affiliation along with their gender. Hence there is an urgent need of adopt the intersectional methodology by the mainstream Indian sociological knowledge to theoretically portray and academically establish the hidden, multifaceted real-life experiences of children. How the complex alliance of social characteristics along with the legal and political institutions facilitates discriminatory practices by reproducing the subordinate status and fabricates unequal prospects for these children.

References

1. Acker, Joan. (2006). "Inequality Regimes: Gender, Class and Race in Organizations", *Gender & Society*, 20(4): 441-464.
2. Acker, Joan. (2006). *Class Questions: Feminist Answers.* U.S.A: Rowman and Littlefield Publishers.
3. *Butler, Judith. (1990). Gender Trouble: Feminism and the subversion of Identity. New York/London: Routledge.*
4. *Butler, Judith. (1993). Bodies that matter: On the discursive limits of sex. New York/ London: Routledge.*
5. Lareau, Annette. (2003). *Unequal Childhoods: Class, Race, and Family Life.* California: University of California Press.
1. Crenshaw, Kimberle. (1989). "Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics", *University of Chicago Legal Form*, 1989 (1):139-167.
2. Crenshaw, Kimberle. (1995). "Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Colour", *Stanford Law Review,* 43 (6): 1241-1299.
3. Crenshaw, Kimberle. (2008). Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Colour. in Alison Bailey and Chris Cuomo (eds.). The Feminist Philosophy Reader (pp- 279-309). New York: McGraw Hill.
4. Kay, Tess, Ruth, Jeanes. (2008). "Women, Sport and Gender In equity". In Barrie Houlihan (ed.). *Sport and Society: A Student introduction* (pp.130-154). London: Sage Publisher.

5. M, Ashitha. (2012). Women and Sports: Gender Politics in Contemporary Kerala, 2nd International Conference in Social Science and Humanity, IPEDR Volume 3, Singapore: IACSIT Press.

6. Leavy, L,Patricia. (2000). Feminist Content Analysis and Representative Characters, *The Qualitative Report,* 5(1):1-16.

7. Prakash, Padma. (1990). Women and Sports: Extending Limits to Physical Expression, *Economic and Political Weekly*, 25(17): 19- 20.

8. Singh, Bhupinder. (2004). *Sports Sociology: An Indian Perspective*. New Delhi: Friends Publishers.

9. Singh, M.K. (1990). *Indian Women and Sports*. New Delhi: Rawat Publications.

10. Rao, Nalluri, Srinivasa. (2010). "Constraints of Indian Women Participation in Games and Sports", *British Journal of Sports Medicine,* 44: 62-63.

Sites Visited

a) https://www.unicef.org/crc/index_73875.html- (accessed on 01.05.2019)

b) https://www.unicef.org/rightsite/364_592.htm - (accessed on 10.05.2019)

c) http://www.heraldsun.com.au/news/victoria/girls-banned-from-running-at-islamic-school-to-protect-virginity/news-story/fb5b66f275844631d7faad7ac952a74c - (accessed on 12.05.2019)

(Endnotes)

[1]https://www.unicef.org/crc/index_73875.html

[2] https://www.unicef.org/sports/23619_23624.html

[3] http://www.heraldsun.com.au/news/victoria/girls-banned-from-running-at-islamic-school-to-protect-virginity/news-story/fb5b66f275844631d7faad7ac952a74c

Human Development Index – Indian States Compared

Dr. Srabani Jha
Associate Professor of Economics
Basanti Devi College
srabani.ghosh3@gmail.com

Abstract

Income per capita is not the sole indicator of development of a nation. Health and education achievements matter. Human Development Index (HDI) is a composite index focusing on three basic dimensions of human development, the ability to lead a long and healthy life measured by life expectancy at birth, the ability to acquire knowledge measured by mean years of schooling and expected years of schooling and the ability to acquire a decent standard of living measured by Gross National Income per capita. The index lies between 0 and 1. If any country is to achieve the HDI score of 1, it is required to have a life expectancy of 85, 15 years of schooling, 18 years of expected schooling, and per capita income of $75,000 (according to 2011 purchasing power parity), India has a modest score of 0.640 in 2018 and ranks 130 out of 189 countries. The present paper concentrates on human development achievements of major Indian states in some selected years of the period 1990 – 2017. Life expectancy, literacy, education standard and income data are compared.

Key words: Human Development Index (HDI), Health , Education, Income, Life Expectancy

Introduction

Since 1990, UNDP (United Nations Development Programme) attempted to analyse the comparative status of socio economic development systematically and comprehensively in its annual series of Human Development Reports by releasing data on HDI. The highest score on HDI is 1. Nations with a score from 0.8 to1 are considered to be nations with very high human development. The next group of countries with score of at least 0.7 but less than 0.8 are classified as having high human development. Countries with score of less than 0.7 but at or higher than 0.55 have medium human development. Finally there are nations with a low human development which have a score below 0.55. Norway is always in the first position with very high human development. At present, Norway has 0.953 score. Switzerland is in second position with score0.944. Australia is in third position with score 0.939(HDI by country2019, World Population Review28/8\19). Nation India has medium human development. Indian states are not evenly developed. Reduction of regional imbalances has been one of the primary objectives of the Indian planning process. This suggests that the strategy for improving various dimensions of human development by increasing government expenditure on social services would be more effective than relying on per capita income for automatic improvement in human development goals.

Literature Survey

Michael P. Todaro and Stephen C. Smith *in their book* ***Economic Development*** have mentioned that HDI has made a major contribution to improving general understanding of what constitutes development. By combining social and economic data, the HDI allows nations to focus their economic and social policies more directly on areas in need of improvement.

A.P. Thirlwall in his book ***Growth and Development*** has mentioned that though positively related, an increase in per capita income may not be a sufficient condition for an increase in individual welfare.

Sudhir Anand and Amartya.K Sen (1994) in their article ***HDI: Methodology and Measurement*** emphasized that human beings are real end of all activities and development must be centered on enhancing their achievements, freedoms and capabilities.

Gustav Ranis *(2004)* ***Human Development and Economic Growth*** Working Paper, Economic Growth Centre, Yale University commented on the interrelations between Human Development and Economic Growth.

Rajarshi Majumder (2006) in his article ***Human Development in India: Regional Pattern and Policy Issues*** observed substantial inter regional disparity in human development. He suggested greater role of the state in providing social infrastructure especially to the marginalized groups.

Purusottam Nayak (2009) in his article ***Human Development: Concept and Measurement*** Growth and Human Development in North-East India, Nayak P, ed Oxford University Press provides an account of various changes in the methods of measurement brought out by UNDP, the Planning Commission, Government of India and the individual researchers at different points of time since 1990.

Akbar Khodabakshi (2011) in his paper ***Relationship between GDP and Human Development Indices in India*** concluded that per capita Gross domestic Product index in the Indian economy has had good growth but the impact on other indicators of human development index is very low and ineffective..

Madhusudan Ghosh (2011) in his article ***Regional Disparities in Education, Health and Human Development in India,*** Indian Journal of Human Development evaluates the relative performance of 15 major Indian states on the issues of education, health and human development. It examines the regional disparities in human development and their association with per capita income and per capita social sector expenditure.

Satyaki Roy (2012) in his paper ***Regional Disparities in Growth and Human Development in India*** Working Paper, Institute for studies in Industrial Development argues that performance in terms of various dimensions increases with income but at a declining trend. It implies that per capita income at higher levels becomes less important in generating gains in terms of basic human development indices.

A. Dhar Misra and Rahul Chowdhury (2014) in their paper ***A comparative Study of Human Development Index of Selected Indian States,*** National Monthly Referred Journal

Of Research in Commerce and Management tried to find out the trend of human development of Indian states and to suggest measures for improving human development.

Data Source and Methodology

This paper is based purely on the secondary data extracted and collected from various sources and official websites. Besides (UNDP)'s official website https://globaldatalab.org was used for finding out sub national Human Development Index and its components.

HDI is calculated by taking the geometric mean of the health index, the income and education indexes. An attempt has been made in this paper to find correlation coefficient between HDI and its components. Health index is calculated by using a minimum value of 20 years of life expectancy and a maximum value of 85 years. If the life expectancy at birth is X years, then $HI = \frac{X-20}{85-20}$ will be the corresponding Health Index. The education component of HDI is measured by two indicators-

- mean years of schooling for adults aged 25 years and older
- expected years of schooling.

The two indicators are first normalized using a minimum value of 0 and a maximum value of 15 for mean years of schooling and18 for expected years of schooling. If mean years of schooling for a country is X years and expected years of schooling is Y years, then Education Index will be $= (\frac{X}{15} + \frac{Y}{18}) \times 1/2$

The income component ismeasured using the natural logarithm of Gross National Income per capita adjusted by purchasing power parity (PPP). If the GNI per capita of a particular country is$ X, then the income index for HDI will be

$$= (\log X - log100)/(\log 7500 - log100)$$

$100 is considered as minimum income and $75000 is considered as maximum income.

HDI of India and Major Indian states:

Data presented in Table I show HDI values of India and 17 major Indian states for different years from 1990. Kerala always turned out to be the best achiever as it always ranked first among all other Indian states. Bihar scored the lowest value in all the years. Overall HD has improved over the years. Besides Kerala, Himachal Pradesh and Punjab also achieved high human development score i.e. > 0.7.

Table I: HDI of Major Indian States in some selected years of the period 1990-2017

	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2017
India	0.428	0.460	0.493	0.535	0.581	0.627	0.639
Andhra Pradesh	0.420	0.445	0.473	0.526	0.579	0.629	0.643
Assam	0.406	0.433	0.483	0.528	0.568	0.598	0.607
Bihar	0.375	0.404	0.432	0.468	0.515	0.556	0.568
Gujarat	0.466	0.493	0.524	0.570	0.606	0.651	0.665
Haryana	0.462	0.502	0.544	0.587	0.634	0.686	0.700
Himachal Pradesh	0.475	0.525	0.583	0.640	0.667	0.703	0.715
J & K	0.489	0.508	0.523	0.584	0.640	0.673	0.679
Karnataka	0.440	0.475	0.513	0.562	0.605	0.659	0.675
Kerala	0.540	0.564	0.592	0.674	0.715	0.757	0.770
Madhya Pradesh	0.403	0.430	0.456	0.498	0.538	0.584	0.598
Maharashtra	0.490	0.521	0.552	0.599	0.643	0.680	0.689
Odisha	0.395	0.426	0.453	0.491	0.536	0.585	0.599
Punjab	0.492	0.532	0.574	0.611	0.657	0.702	0.715
Rajasthan	0.399	0.431	0.465	0.507	0.548	0.605	0.621
Tamil Nadu	0.466	0.500	0.537	0.595	0.646	0.689	0.699
Uttar Pradesh	0.394	0.426	0.458	0.501	0.535	0.576	0.590
West Bengal	0.437	0.469	0.501	0.535	0.573	0.620	0.633

Source: UNDP reports, https://globaldatalab.org

Components of HDI

Health Index

The long and healthy life dimensions uses life expectancy at birth as its indicator defined as "the number of years of a new born infant could expect to live if prevailing pattern of age specific mortality rate at the time of birth were to stay the same throughout the child's life". (UNDP 2010)

The life expectancy index is calculated using a minimum value of 20 years and a maximum value of 85 years. The minimum level of 20 years is the life expectancy needed for a society to survive

i.e, for reproduction.. The maximum value is fixed at 85 years as that can be interpreted as an aspirational goal for societies (UNDP 2014).

Table 2: Expectation of Life at birth in India in some selected years

Year	Total	Male	Female
1991	59.4	59.0	59.7
1995	61.1	60.0	61.8
2000	62.9	61.9	64.0
2005	65.0	63.7	66.5
2010	67.0	65.4	68.8
2015	68.3	66.9	70.0
2017	68.8	67.4	70.3

Source: Sample Registration System, Registrar General, Government of India

Though consistently improved, India's life expectancy is still lower than the global average of 70 years for males and 74 years for females in 2018.

Life expectancy improved around the world due to vaccination, safer work places, control of infectious diseases, safer and healthier foods, reduced infant mortality, family planning etc. Women normally have a biological advantage that allows them to live longer but in several places still today the status and life conditions of women almost nullify this benefit.

Table 3: Expectation of life at birth by Sex of Major Indian States

	2006 – 2010			2011 – 2015		
	Total	**Male**	**Female**	**Total**	**Male**	**Female**
India	66.1	64.6	67.7	68.30	66.9	70.0
Andhra Pradesh	65.8	63.5	68.2	69.00	67.1	71.2
Assam	61.9	61.0	63.2	64.70	63.5	66.2
Bihar	65.8	65.5	66.2	68.40	68.5	68.3
Gujarat	66.8	64.9	69.0	69.10	66.9	71.6
Haryana	67.0	67.0	69.5	69.10	66.9	71.9
Himachal Pradesh	70.0	67.7	72.4	72.00	69.1	75.2
J & K	70.1	69.2	71.1	73.20	71.2	76.1

Karnataka	67.2	64.9	69.7	69.00	67.2	70.9
Kerala	74.2	71.5	76.9	75.20	72.2	78.2
Madhya Pradesh	62.4	61.1	63.8	64.80	63.2	66.5
Maharashtra	69.9	67.9	71.9	72.00	70.3	73.9
Odisha	63.0	62.2	63.9	66.90	65.6	68.3
Punjab	69.3	67.4	71.6	72.10	70.3	74.2
Rajasthan	66.5	64.7	68.3	67.90	65.7	70.4
Tamil Nadu	68.9	67.1	70.9	71.00	69.1	73.0
Uttar Pradesh	62.7	61.8	63.7	64.50	63.4	65.6
West Bengal	69.0	67.4	71.0	70.50	69.4	71.8

Source: Sample Registration System, Registrar General, Government of India.

Total life expectancy at birth increased in 2011 – 15 as compared to 2006-10. Kerala recorded the highest life expectancy at birth while Assam recorded the lowest life expectancy at birth in both the periods. Life expectancy increased for all the states in 2011 – 15 as compared to 2006-10. Female life expectancy is highest in Kerala followed by J & K and Himachal Pradesh. Female life expectancy is lowest in Assam.

Calculation of Health Index (HI) 2017

For India

$$HI = \frac{69.04-20}{85-20} = \frac{49.04}{65} = 0.754$$

Table 4 represents data on Health index of India and 17 major Indian states. Again Kerala is the best achiever, followed by Tamil Nadu and Maharashtra in 2017. Kerala has long history of organized healthcare, easy accessibility and coverage of medical care facilities at low cost.[1] High level of education especially among women and greater consciousness have played a key role in the attainment of good health standards in the state.

Table 4 :- Health Index of India and Major Indian States in some selected years in the period 1990-2017

	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2017
India	0.583	0.622	0.655	0.686	0.717	0.743	0.751
Andhra Pradesh	0.617	0.649	0.671	0.698	0.726	0.749	0.757
Assam	0.551	0.618	0.685	0.677	0.702	0.731	0.738

Bihar	0.560	0.602	0.640	0.665	0.697	0.729	0.737
Gujarat	0.605	0.642	0.672	0.702	0.732	0.760	0.768
Haryana	0.600	0.648	0.695	0.734	0.757	0.772	0.777
Himachal Pradesh	0.637	0.695	0.751	0.772	0.777	0.775	0.778
J & K	0.666	0.686	0.698	0.743	0.766	0.778	0.783
Karnataka	0.608	0.649	0.686	0.720	0.757	0.788	0.797
Kerala	0.722	0.765	0.802	0.823	0.838	0.846	0.849
Madhya Pradesh	0.551	0.577	0.597	0.646	0.683	0.712	0.720
Maharashtra	0.652	0.685	0.711	0.746	0.772	0.792	0.798
Odisha	0.558	0.598	0.634	0.669	0.703	0.734	0.742
Punjab	0.665	0.692	0.711	0.745	0.766	0.780	0.786
Rajasthan	0.600	0.615	0.623	0.669	0.708	0.740	0.749
Tamil Nadu	0.618	0.671	0.723	0.763	0.788	0.803	0.809
Uttar Pradesh	0.531	0.572	0.611	0.643	0.669	0.689	0.697
West Bengal	0.600	0.654	0.704	0.725	0.752	0.775	0.783

Source: UNDP reports, https://globaldatalab.org

Correlation between HDI & Health Index of India in some selected index of India in some selected years of the period. 1990 – 2017

Year	HDI(X)	Health Index(Y)
1990	0.428	0.583
1995	0.460	0.622
2000	0.493	0.655
2005	0.536	0.686
2010	0.581	0.717
2015	0.627	0.743
2017	0.639	0.751

Source: UNDP reports

It is found that correlation coefficient between HDI and Health Index is 0.9914 indicating strong positive correlation between them.

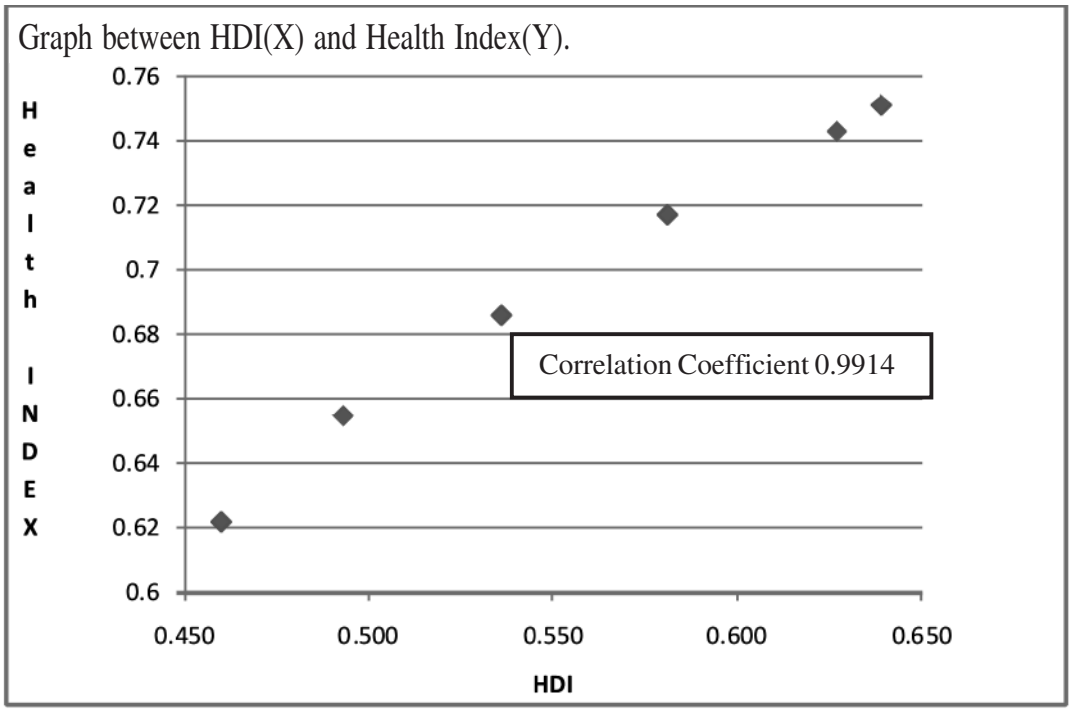

Literacy and Education Index

Illiterate people cannot live a descent life. They are less knowledgeable about hygiene and nutritional practices. Literacy skills allow women to more successfully access health care systems and thereby facilitate gains in their own health and child health.

It is shocking that still India has 74 percent literacy rate. Female literacy rate is only 65.5 percent according to 2011 causes.

Table 5: State wise Literacy Rate in 2001 and 2011 (17 major states)

	Female	Male	Total	Female	Male	Total
India	53.7	75.3	64.8	65.5	82.1	74.0
Andhra Pradesh	50.4	70.3	60.5	59.1	74.9	67.0
Assam	54.6	71.3	63.3	66.3	77.8	72.2
Bihar	33.1	59.7	47.0	51.5	71.2	61.8
Gujarat	58.6	80.5	70.0	69.7	85.8	78.0
Haryana	45.7	78.5	67.9	65.9	84.1	75.6
Himachal Pradesh	67.4	85.4	76.5	75.9	89.5	82.8

J & K	43.0	66.6	55.5	56.4	76.8	67.2
Karnataka	56.9	76.1	66.6	68.1	82.5	75.4
Kerala	87.9	94.2	90.9	92.1	96.1	94.0
Madhya Pradesh	50.3	76.1	63.7	59.2	78.7	69.3
Maharashtra	67.0	86.0	76.9	75.9	88.4	82.3
Odisha	50.5	75.4	63.1	64.0	81.6	72.9
Punjab	63.4	75.2	69.7	70.7	80.4	75.8
Rajasthan	43.9	75.7	60.4	52.1	79.2	66.1
Tamil Nadu	64.4	82.4	73.5	73.4	86.8	80.1
Uttar Pradesh	42.2	68.8	56.3	57.2	77.3	67.7
West Bengal	59.6	77.0	68.6	70.5	81.7	76.3

Source: Office of Registrar General, India

Kerala achieved the highest literacy rate in both the periods. Female literacy is also highest in Kerala followed by Maharashtra and Himachal Pradesh according to 2011 Census. Bihar recorded the lowest literacy rate.

Table 6: Comparison of Literacy and HDI in major Indian states

	Literacy	**HDI**
India	74.0	0.639
Andhra Pradesh	67.0	0.643
Assam	72.2	0.607
Bihar	61.8	0.568
Gujarat	78.0	0.665
Haryana	75.6	0.700
Himachal Pradesh	82.8	0.715
J & K	67.2	0.679
Karnataka	75.4	0.675
Kerala	94.0	0.770
Madhya Pradesh	69.3	0.598
Maharashtra	82.3	0.689
Odisha	72.9	0.599
Punjab	75.8	0.715
Rajasthan	66.1	0.621
Tamil Nadu	80.1	0.699

Uttar Pradesh	67.7	0.590
West Bengal	76.3	0.633

Source: Sample Registration System, https://globaldatalab.org

Data reveal that there is a positive relationship between literacy rate and HDI. States having high literacy rate score better in human development also.

Education Index (EDI)

The education component of HDI is measured by two indicators : mean years of schooling for adults aged 25 years and older i.e. "Average number of years of education received by people aged 25 and older in their life time based on education attainment levels of population converted into years of schooling based on theoretical duration of each level of education attended" (UNDP 2010) and expected years of schooling i.e. "Number of years of schooling that a child of school entrance age can expect to receive if prevailing pattern of age-specific enrolment rates were to stay the same throughout the child's life"(UNDP 2010).

The two indicators are first normalized using a minimum value of 0 and maximum value of 15 for mean years of schooling and 18 for expected years of schooling.

In 2017, Mean Years of schooling for India = 6.4 years (UNDP)

Expected years of schooling for India = 12.3 years (UNDP)

$$EI = \frac{\frac{6.4}{15} + \frac{12.3}{18}}{2} = \frac{0.4267 + 0.6833}{2} = 1.1100 / 2 = 0.555$$

Table 7: Education Index of Major Indian States in selected years of the period (1990-2017)

	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2017
India	0.311	0.344	0.377	0.429	0.480	0.543	0.555
Andhra Pradesh	0.286	0.307	0.330	0.396	0.452	0.521	0.536
Assam	0.317	0.350	0.386	0.462	0.496	0.533	0.541
Bihar	0.248	0.277	0.306	0.346	0.411	0.469	0.481
Gujarat	0.346	0.366	0.392	0.449	0.480	0.541	0.555
Haryana	0.353	0.387	0.418	0.464	0.522	0.596	0.608
Himachal Pradesh	0.383	0.429	0.479	0.559	0.582	0.636	0.648
J & K	0.381	0.390	0.387	0.467	0.542	0.584	0.584
Karnataka	0.320	0.354	0.390	0.453	0.483	0.562	0.585
Kerala	0.454	0.489	0.524	0.603	0.648	0.710	0.722

Madhya Pradesh	0.281	0.311	0.343	0.397	0.436	0.493	0.508
Maharashtra	0.373	0.407	0.438	0.503	0.554	0.606	0.612
Odisha	0.294	0.327	0.351	0.389	0.434	0.503	0.517
Punjab	0.353	0.399	0.443	0.478	0.542	0.609	0.621
Rajasthan	0.253	0.289	0.330	0.376	0.422	0.486	0.503
Tamil Nadu	0.372	0.400	0.427	0.508	0.548	0.613	0.625
Uttar Pradesh	0.282	0.317	0.352	0.404	0.448	0.503	0.516
West Bengal	0.328	0.355	0.381	0.427	0.468	0.533	0.545

Source: UNDP reports, https: //globaldatalab.org

Table 8: Mean Years of schooling of Adults Aged 25+ in Major Indian states in selected years of the period (1990 – 2017)

	1991	1995	2000	2005	2010	2015	2017
India	4.02	4.38	4.81	5.14	5.65	6.28	6.56
Andhra Pradesh	3.49	3.66	3.91	4.25	4.81	5.48	5.76
Assam	4.11	4.40	4.83	5.46	6.28	6.27	6.03
Bihar	3.47	3.60	3.76	3.92	4.07	4.48	4.71
Gujarat	4.48	4.93	5.43	5.65	6.06	6.62	6.88
Haryana	4.19	4.70	5.27	5.64	6.20	7.15	7.62
Himachal Pradesh	4.10	4.94	5.94	6.73	6.96	7.70	8.17
J & K	4.96	4.72	4.65	5.44	6.30	6.72	6.76
Karnataka	4.03	4.56	5.15	5.43	5.76	6.53	6.95
Kerala	6.36	6.87	7.46	7.91	8.59	9.38	9.71
Madhya Pradesh	3.32	3.65	4.03	4.30	4.68	5.38	5.73
Maharashtra	4.82	5.25	5.83	6.48	7.10	7.53	7.49
Odisha	3.24	3.68	4.17	4.44	4.94	5.46	5.65
Punjab	4.25	4.97	5.76	6.03	6.82	7.47	7.67
Rajasthan	2.80	3.25	3.76	3.93	4.35	5.19	5.65
Tamil Nadu	4.71	5.00	5.39	5.90	6.46	7.33	7.75
Uttar Pradesh	3.57	3.89	4.27	4.56	4.99	5.78	6.18
West Bengal	4.60	4.68	4.81	5.02	5.35	5.85	6.09

Source: https: //globaldatalab.org

Table 9: Expected years of schooling of Children Aged 6 in Major Indian States in some selected years of the period (1990 -2017):

	1991	1995	2000	2005	2010	2015	2017
India	5.77	7.16	8.62	8.94	11.50	11.50	10.80
Andhra Pradesh	5.55	6.75	8.12	8.94	11.80	12.00	11.20
Assam	5.97	7.34	8.85	9.56	10.80	10.90	10.60
Bihar	4.33	5.68	7.07	7.36	10.60	11.20	10.40
Gujarat	6.63	7.44	8.38	9.00	10.80	10.90	10.40
Haryana	6.96	8.35	9.73	9.73	12.40	12.30	11.30
Himachal Pradesh	7.77	9.53	11.40	11.70	13.60	12.90	11.80
J & K	7.46	8.36	9.36	9.89	13.20	12.50	11.00
Karnataka	6.00	7.27	8.69	9.39	11.00	11.80	11.50
Kerala	8.27	9.61	11.10	11.60	12.50	13.30	12.30
Madhya Pradesh	5.36	6.71	8.18	8.75	11.00	11.00	10.30
Maharashtra	6.98	8.37	9.78	9.92	12.50	12.20	11.10
Odisha	5.94	7.25	8.53	8.41	10.50	11.00	10.60
Punjab	6.86	8.50	10.10	9.70	12.30	12.30	11.40
Rajasthan	4.94	6.50	8.13	8.44	10.60	11.10	10.70
Tamil Nadu	7.15	8.38	9.82	10.80	13.10	12.70	11.70
Uttar Pradesh	5.18	6.74	8.36	8.69	11.10	10.90	10.10
West Bengal	5.79	7.13	8.51	8.72	11.10	11.40	10.90

Source: https://globaldatalab.org

Data reveal that Kerala has the highest education index among 17 major Indian states.

The state has near total literacy, free and universal primary education, low dropout rate at the school level, easy access to educational institutions, gender equality in access etc.[1]

English education in Kerala had been promoted long ago during British rule by Christian missionaries who were keen on providing education to all sections of society and on strengthening of women without any kind of discrimination.

Bihar has the lowest value of education index. The state has an inadequate educational infrastructure creating a huge mismatch between demand and supply. This has forced students to migrate to other states even for graduation level college education. The state of school education is far from satisfactory. It is reported that 37.8% of Bihar's teachers could not be found during unannounced visits to schools, the most teacher absence rate in India and one of the worst in the world.[2]

Results from 2017 indicate that over 60% of students in Bihar failed their class 12 board examination. This was attributed to a corrupt and collapsing education system in the state.[3]

Correlation between HDI and Education Index of India in some selected years of the period (1990-2017):

		Education Index
Year	**HDI(x)**	**(Y)**
1990	0.428	0.311
1995	0.460	0.344
2000	0.493	0.377
2005	0.535	0.429
2010	0.581	0.48
2015	0.627	0.543
2017	0.639	0.555

Source: UNDP reports

It is found that correlation coefficient between HDI and Education Index is 0.9990 indicating a strong positive correlation between them.

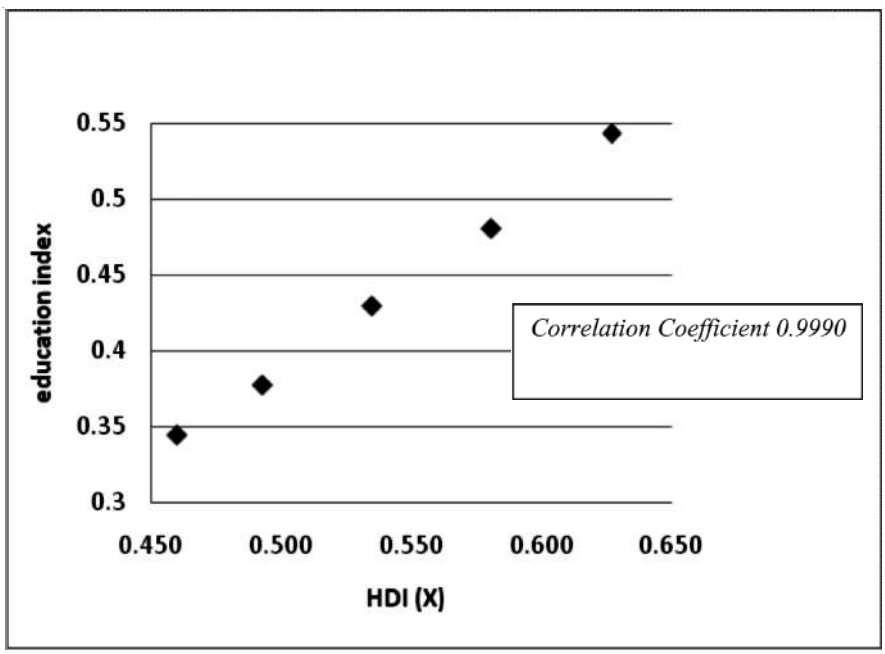

Graph between HDI(X) and Education Index(Y).

Income Index:

The income component is measured using the natural logarithm of Gross National Income per capita adjusted by purchasing power parity (PPP). For this component, the minimum value is PPP $100, this low value is justified by the considerable amount of unmeasured subsistence and nonmarket production in economics close to the minimum (UNDP 2010). The maximum value is fixed at $75,000 since there is virtually no gain in human development and well being from annual income beyond that amount (UNDP 2010).

Calculation of Income Index of Human Development Index

If the GNI per capita for citizens of a particular country is $X,

$$\frac{logX - log100}{log75000 - log100} = \frac{\log(6353) - 2}{\log(75000) - 2} = \frac{3.8029 - 2}{4.87506 - 2} = \frac{1.8029}{2.87506} = 0.627$$

Table 10: Income Index of Major Indian States in some selected years of period 1990 – 2017:

	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2017
India	0.431	0.454	0.484	0.521	0.570	0.610	0.627
Andhra Pradesh	0.420	0.443	0.477	0.527	0.591	0.637	0.654
Assam	0.383	0.401	0.427	0.470	0.527	0.550	0.560
Bihar	0.380	0.394	0.412	0.445	0.477	0.504	0.518
Gujarat	0.484	0.510	0.545	0.589	0.632	0.672	0.690
Haryana	0.466	0.504	0.555	0.595	0.645	0.703	0.725
Himachal Pradesh	0.440	0.486	0.552	0.608	0.655	0.705	0.726
J & K	0.460	0.489	0.531	0.575	0.632	0.671	0.686
Karnataka	0.439	0.467	0.506	0.545	0.607	0.647	0.661
Kerala	0.480	0.479	0.493	0.616	0.672	0.721	0.744
Madhya Pradesh	0.423	0.442	0.464	0.483	0.523	0.566	0.584
Maharashtra	0.483	0.508	0.541	0.574	0.621	0.654	0.670
Odisha	0.375	0.394	0.418	0.454	0.504	0.543	0.559
Punjab	0.506	0.545	0.599	0.639	0.683	0.729	0.750
Rajasthan	0.419	0.450	0.489	0.517	0.564	0.615	0.635
Tamil Nadu	0.440	0.466	0.503	0.543	0.623	0.664	0.676
Uttar Pradesh	0.408	0.425	0.448	0.484	0.512	0.552	0.572
West Bengal	0.424	0.443	0.467	0.496	0.534	0.576	0.595

Source: https://globaldatalab.org

Sub national income index values were estimated on the basis of household wealth. To measure household wealth, the International Wealth Index (IWI) was used an indicator of household's standard of living based on asset ownership, household quality and access to public services – reported Global data lab.

Data reveal that Income Index steadily improved for each state in the period 1990-2017. Punjab, Kerala, Haryana, Himachal Pradesh achieve high income index, i.e more than 0.7. The economic progress of these states is higher than national average. Bihar has the lowest value.

Bihar has the lowest GDP (Gross Domestic Product) per capita in India. The state has huge income disparity or uneven wealth distribution. Upper caste people own vast amount of agricultural land. The state has the problem of mass level youth unemployment and lack of opportunity for the skilled people. Freight equalization scheme,[4] poor political vision, under investment in the key sectors of agriculture, infrastructure are known to be responsible behind poor economic growth of Bihar.

Other low per capita income states have various reasons for poor economic development. Rapid growth of population creating problems of unemployment, poverty and inequality of income, low growth rate of industrialization, unremunerative agriculture, corruption, natural disasters such as floods etc. are some of the reasons responsible.

Advanced state like Punjab has rich and productive agricultural land. The state is known as the bread basket of India and led to first green revolution in the country. Haryana is one of the leading states in terms of industrial production and second largest contributor of food grains to India's central pool. Kerala's economic progress also is much higher than national average. This has increased internal migration to Kerala for low end jobs as Keralites have migrated to Gulf countries in search of better paying jobs. They regularly remit money income which drive Kerala's economy. Besides, the state's land reforms, social upliftment of entire communities implemented by various Governments helped.

Correlation between HDI(x) and Income (Y) of India in some selected years of the period 1990 and 2017.

Year	**HDI(x)**	**Income Index(Y)**
1990	0.428	0.431
1995	0.460	0.454
2000	0.493	0.484
2005	0.535	0.521
2010	0.581	9.57
2015	0.627	0.61
2017	0.639	0.627

Source: UNDP reports

It is found that correlation coefficient between HDI(X) and Income Index(Y) is 0.9986 indicating a strong positive correlation between them.

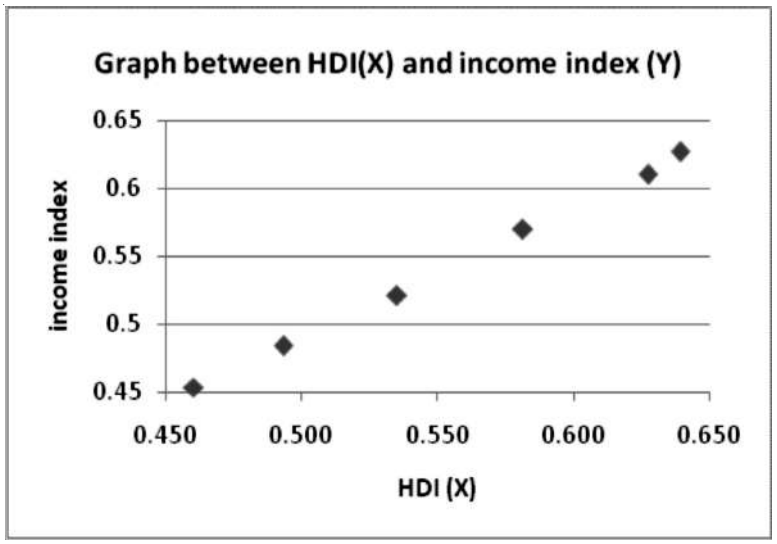

X

Calculation of HDI: The HDI is calculated by taking the geometric mean of the life expectancy at birth, the income and the education indexes.

HDI 2017 = (Health Index x Education Index x Income index)$^{1/3}$

= (0.751 x 0.555 x 0.627)$^{1/3}$

= (0.261336735) $^{1/3}$

= 0.639

Conclusion:

The human development experience over the last few decades reveals outstanding lessons. High level of human development can be achieved at moderate income levels as long as Governments with the goal of maximizing welfare of the masses put people at the centre of all policies. This is the experience of Kerala having highest level of expectation of life, highest level of literacy among its males and females as compared to other states in India. Kerala is followed by Punjab and Himachal Pradesh in HDI though high income state Punjab is behind Himachal Pradesh in Education Index, mean years of schooling etc. States like Bihar, Uttar Pradesh are still suffering from low income development and very low social development. Reduction of regional disparities is a distant dream. The nation India with medium HDI suffers loss (26.8%) due to inequality adjusted Human Development index score 2017 becomes only 0.468. India's rank also declined by 1.[6]

1) The Health Care System in Kerala – its Past Accomplishments and New Challenges., Koji Nabae. http://www.niph.go.jp

2) What is wrong with Kerala's health care system, K.K George and N. Ajith Kumar, Centre for Socio-economic and Environment Studies, Working Paper No.3

3) Combating India's truant teachers, Basu, Kaushik, BBC Archived from the Original on February 15,2009, retrieved January 3, 2010.

4) School education in Bihar has collapsed, Amarnath Tewari The Hindu (2017-5-31)

5) Freight equalization policy:- The policy meant that a factory could be set up anywhere in India and the transportation of minerals would be subsidized by the Central Government. The policy hurt the economic prospects of the mineral rich states like Bihar, West Bengal, Madhya Pradesh and Odisha since it weakened the incentives for private capital to establish production facilities in these areas. World Bank (4th November 2008), World Development Report, 2009

6) Inequality adjusted Human Development Index of UNDP combines a country's average achievements in health, education and income with how these achievements are distributed among country's population by 'discounting' each dimension's average value according to level of inequality.

Other References

1. Training Material for Producing National Human Development Reports by UNDP
2. Sachhidananda Mukherjee, Debashis Chakraborty,Satradru Sikdar **Three Decades of Human Development across Indian States: Inclusive Growth or Perpetual Disparity**
   Working Paper June 2014. National Institute of Public Finance and Policy. New Delhi.
3. A Dhar Misra and Rahul Chowdhury **A Comparative Study of Human Development Index of Selected Indian States** National Monthly Referred Journal of Research in Commerce and Management February 2014.
4. Satyaki Roy **Regional Disparities in Growth and Human Development in India.**

   Working Paper May,2012. Institute for Studies in Industrial Development.
5. Madhusudan Ghosh **Regional Disparities in Education, Health and Human Development in India.** Indian Journal of Human Development,2011

A Tribute to Professor Indu Bhusan Chatterjee : Biochemist par excellence

1930-2019

He was a small man bent a little with age, white sparse hairs on the top of his head , wrinkled hands giving indication of a once upon time beautiful fingers. Perhaps that of a painter or of a pianist may be?

He was a scientist. He remained so, actively and consciously, till the last day of his life. At an age nearing ninety when most of the achievers would be content to rest on their "laurels", if not fighting debilitating waves of dementia swirling around them, he regularly went and worked in his lab. He was not a man to rest on his laurels. Not that he had not amassed enough laurels; he was the elected fellow of the prestigious Indian National Science Academy (INSA) in the year 1996 because of his extensive research on vitamin C and its contribution in combating oxidative stress in animal cells. He held commercially lucrative patents for the invention of an effective cigarette filter and donated the royalty to department of Biochemistry (Calcutta University). For over thirty three years he taught and mentored hundreds of students in the Biochemistry department of Calcutta University. After his retirement he remained as an emeritus Scientist in the newly opened department of Biotechnology, which came into existence largely due to his own efforts, He went on working in his laboratory there till his death on 11th February 2019. He worked with a smile on his lips and a twinkle in his eyes. To him working was the only way to live and he enjoyed living.

If I am ever depressed and feel out of tune with life, I think I shall go back to my memories of meeting that old man in his laboratory. I was sitting quietly beside his table and he was hammering industriously on his keyboard, peering up in a short sighted way now and then at the computer screen assessing whatever he wrote there. Then he noticed me and turned around with the most benign smile on his face. Though perhaps I intruded upon a very tricky piece of composition he was not irritated. He said he liked to gossip and embarked into a journey down the memory lane with me a casual guest. He shared with me personal anecdotes of famous scientists which he collected during his long career, stories of his adventure with life, more importantly his aspirations

about his recent project, with all the innocence of a young child. He did not hesitate to tell me how his work was so interesting and how he had hit upon something that would change the face of the world., Perhaps my facial expression gave some indication that I was taking everything with a pinch of salt, so the clever fellow fluently shifted gears and went into the details, juggling with biochemical names, formulae and concepts with practised ease . He told me that cigarette smoke (CS) contained about 4000 compounds: 3000 in the gas phase and 1000 in the tar phase. Most of the disease producing chemicals were present in the tar phase that contains many aromatic compounds, specially one of the semiquinone, p-benzosemiquinone p-BSQ. It is not present in the tobacco but is produced as a by product of burning tobacco. He scribbled on a notepad to show me how p-BSQ was being transformed into p benzoquinone (pBQ) through enzymatic cycles in the lungs where it was being inhaled, a lot which went above my head. He had unearthed evidence to show how pBQ is a causative factor for most chronic obstructive pulmonary deseases (COPD). I was introduced to the mysteries of cigarette smoke and how it can prove fatal to animal cells which were not equipped with anti -oxidative Vitamin C just in a informal chat like that. I was impressed beyond words. Yet, there was no arrogance in his manner of speaking, his enthusiasm was genuine, it touched me to such an extent that I wanted to do science myself.

He told me that when he was a very young fellow, just pursuing his final years of masters, it was required of him to do an original piece of research work. The time allotted was just a couple of months. He hit upon a novel way of synthesizing indole, a very

important organic compound. While he was doing his literature study he came across reference of a publication somewhat related to what he wanted to do. The only problem was that the work was done by a German group published in a German journal written in German language. After much researching he found out that, copies of the journal was available with the legendary Professor S.N Bose of the physics faculty. He was just a second year M.Sc student that too of Chemistry. Still one day he was going to become a legend himself and perhaps that unquenchable thirst of pushing the envelope made him push the swing door and go inside. Prof Bose had red rimmed bulging round eyes and a baritone voice to match it. He looked up and roared " Ke tui, ki chas?(Who are you? What do you want?). This was enough to send lesser souls scampering away in terror. However the 2nd year M.Sc student conquered his fear and blurted out his problem. The professor heard him patiently. Then he said "Forget it, the piece of work which you want to do has already been done twenty years ago in Germany". For young student of a different stream , who had barged into his office without any introduction he got up from his seat ,dug out that ancient copy from his archives and translated that piece of work then and there , showing him all the relevant equations. Professor S.N Bose who was a physicist by profession knew exactly when a new chemical compound was synthesized and how it was done.

After relating me this story he went back to his computer screen and began typing in a few equations himself. I continued sitting beside him lost in my thoughts till I realized that I have overstayed my welcome. As I rose up to take his leave he swivelled back at me and smiled "Never be discouraged by your background, if you want to do research, do it. It is as simple as that"

Just as a chance encounter with a photon changes the trajectory of an electron, this piece of sympathetic advice resonated inside soul of ordinary chemistry teacher and prompted her to pursue her passion for science. Professor Indu Bhusan Chatterjee was that rare source of inspiration who knew how to kindle flames even in apparently incombustible substances. May his soul rest in eternal peace!

Sumana Chatterjee
Department of Chemistry
Basanti Devi College